علامہ اقبال

(مجموعہ مقالات)

4

(بنگالی)

আল্লামা
ইকবাল

আল্লামা ইকবাল

নভেম্বর '৯২

সম্পাদনা কমিটি

ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন [চেয়ারম্যান]

অধ্যাপক শাহেদ আলী

এস. মুজিবউল্লাহ

প্রিন্সিপাল কে. এ. রহমান

এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

সৈয়দ তোসারফ আলী

আবদুল ওয়াহিদ

মূল্য ঃ ৫০ টাকা
২ ডলার

প্রকাশনায়
আল্লামা ইকবাল সংসদ
১০৯, নাজিম উদ্দীন রোড, ঢাকা।
ফোন ঃ ৪০৬৫১২

Allama Iqbal

Printed at Masro printing & Packaging Ltd. and Published by
Abdul Wahid, from 109, Nazimuddin Road, Dhaka.
Phone : 406512
price : Taka 50
US $ 2

IQBAL ACAD... Library 30988 LAHORE

সূচী

পৃষ্ঠা

প্রবন্ধ

১. মহাকবি ইকবালের কাব্যধারায় যবুর-ই-আযম ৯-১৩
❑ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ
২. ইকবালকে প্রয়োজন কেন ❑ ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ১৪-১৭
৩. কাব্য, অনুবাদ ও পাঠক ❑ শাহেদ আলী ১৮-২০
৪. ইকবালের দৃষ্টিতে মুসলিমদের বিজ্ঞান মনস্কতা ২১-২৩
❑ মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী
৫. আল্লামা ইকবালের পরামর্শ ❑ এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ ২৪-২৮
৬. আল্লামা ইকবালের কথা যেভাবে মনে পড়ে ❑ শেখ দরবার আলম ২৯-৫১
৭. ইকবাল ঃ বিচক্ষণ পরামর্শদাতা ও পথ-প্রদর্শক ৫২-৬৪
❑ সৈয়দ তোসারফ আলী
৮. নবমূল্যায়নে ইকবাল ❑ ফাহমিদ-উর-রহমান ৬৫-৮৪
৯. ইকবালের কাব্য-দর্শন ও আমাদের জাতীয় মানস ৮৫-৮৭
❑ মোঃ মোরশেদ আলী

অনুবাদে ইকবাল

১. ইকবালের দশটি কবিতা ❑ আবদুল মান্নান তালিব অনূদিত ৮৮-৯২

অনুবাদ প্রবন্ধ

১. কাদিয়ানী মতবাদ সম্পর্কে ইকবাল-নেহরু পত্রালাপ ৯৩-১০০
❑ আবু খালিদ অনূদিত
২. ইকবালের ঐতিহাসিক লাহোর ভাষণের উপর যৎকিঞ্চিৎ ১০১-১০৪
❑ মোহাম্মদ রুহুল আমীন
৩. ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ইকবালের ভাষণ ❑ ছালেহ আহমাদ ১০৫

সেমিনার প্রবন্ধ

১. ইকবালের শিক্ষা দর্শন ❑ ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ১০৬-১১৪
২. রাসূলুল্লাহর (সঃ) আদর্শ ও কল্যাণ রাষ্ট্র ❑ মুহিউদ্দীন খান ১১৫-১১৯

পৃষ্ঠা

ব্যক্তিত্ব

৩. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ঃ সাহিত্য ও সমাজ দর্শন ১২০–১৩১
❑ শরীফুল মুজাহিদ

ভাষণ

৪. ইকবালের দর্শন পাশ্চাত্য সভ্যতার ওপর চরম আঘাত ১৩২–১৩৯
❑ মাহমুদ বায়্যাত

An Address

১. Speech of His Excellency Anwar Kemal, High Commissioner for Islamic Republic of Pakistin. 140-141

English Articles

২. Allama Iqbal and Sufism 142-158
Dr. Abu Sayeed Nuruddin

৩. Islam and Modern World 159-204
Advocate Mujibur Rahman

রিপোর্ট

১. স্পেনের কর্ডোভায় আন্তর্জাতিক ইকবাল মহাসম্মেলন ২০৫–২০৯
❑ আনোয়ারুল হক

২. 'রাসূলুল্লাহর (সঃ) আদর্শ ও কল্যাণ রাষ্ট্র' শীর্ষক সেমিনার ২১০–২১২
❑ মোজ্জাম্মেলুল হক

৩. 'ইকবালের শিক্ষা দর্শন' শীর্ষক সেমিনার ❑ হাসান মাহমুদ ২১৩–২১৫

৪. 'সমকালীন বিশ্ব ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ব' শীর্ষক সেমিনার ২১৬
❑ কামরুল ইসলাম হুমায়ুন

যাঁদের লেখা ছাপা হয়েছে

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ঃ বর্ষীয়ান দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, লেখক ও বুদ্ধিজীবী

ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ঃ সাবেক ভাইস চান্সেলর, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শাহেদ আলী ঃ বিশিষ্ট কথাশিল্পী, সভাপতি বাংলাদেশ–পাকিস্তান ভ্রাতৃ–মৈত্রী সমিতি

আবদুল মান্নান তালিব ঃ গবেষক, অনুবাদক, ইসলামী চিন্তাবিদ

ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ঃ অধ্যাপক উর্দু ও ফার্সী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুহিউদ্দীন খানঃ সম্পাদক, মাসিক মদীনা

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীঃ সিনিয়র সহকারী সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা

প্রফেসর এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ ঃ অর্থনীতি বিভাগ, রাজবাড়ি সরকারী কলেজ

শেখ দরবার আলম ঃ নজরুল গবেষক, বিভাগীয় সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব

সৈয়দ তোসারফ আলী ঃ সহ–সভাপতি, আল্লামা ইকবাল সংসদ

ফাহমিদ–উর–রহমান ঃ প্রভাষক, এনাটমী শেরে–ই–বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, বরিশাল

এ. কে.এম. মাহবুবুর রহমান ঃ পরিচালক, আলফাতিহা গবেষণা পরিষদ

মোহাম্মদ মোরশেদ আলী ঃ কবি, লেখক, সমালোচক

আবু খালিদ ঃ লেখক, অনুবাদক, সমালোচক

মোহাম্মদ রুহুল আমীন ঃ কবি, লেখক, সমালোচক, সমাজসেবী

শরীফুল মুজাহিদ ঃ গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আনোয়ারুল হক ঃ গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোজ্জাম্মেলুল হক ঃ যুগ্ম সম্পাদক, আল্লামা ইকবাল সংসদ

ছালেহ আহমাদ ঃ দফতর সম্পাদক, আল্লামা ইকবাল সংসদ

হাসান মাহমুদ ঃ কলামিস্ট, গল্পকার, ঔপন্যাসিক

কামরুল ইসলাম হুমায়ুন ঃ প্রচার সম্পাদক, আল্লামা ইকবাল সংসদ

Mujibur Rahman : Senior Advocate, Bangladesh Supreme Courte

Dr. Abu Sayeed Nuruddin : Iqbal Specialist

Anwar Kemal : High Commissioner of the Islamic Republic of Pakistan, Dhaka

Mahmud Bayat : Ambassador of the Islamic Republic of Iran, Dhaka

আমাদের কথা

১৮৭৭ সালে মহাকবি ডঃ আল্লামা স্যার মুহাম্মদ ইকবালের জন্ম। সময়টি ছিলো ইতিহাসের চরম ক্রান্তিলগ্ন। তখন তাঁর বয়স ২২ বছর। ইকবাল সিয়ালকোটে লেখাপড়া শেষ করেন। চলে আসেন লাহোরে। তিনি হতাশাদীর্ণ মিল্লাত, অশান্ত প্রেক্ষাপটের করুণ পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করেন। তদানীন্তন বিশ্ব-পরিস্থিতিতে অনভূতিপ্রবণ আর সব তরুণের ন্যায় তিনিও হতাশ হয়ে পড়েন। মুসলিম জগতের শোচনীয় অধঃপতন সম্পর্কেও সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন তিনি।

ঐতিহাসিক সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, তুর্কী সাম্রাজ্য তখন নামে মাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ছিলো। পূর্ব ইউরোপ থেকে ইসলাম ক্রমে নির্বাসিত হচ্ছিলো। দক্ষিণ রাশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলো একে একে গ্রাস করছিলো রুশ সম্রাট। চীনের মুসলমানরাও স্বীয় রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারিয়ে হয়ে পড়েছিলেন নিরাশ। মিসর করায়ত্ত করেছিল বৃটিশ। ফ্রান্স ছিলো মরক্কো দখল করার ফন্দিতে। ইরান মুমূর্ষু অবস্থায় দিন গুজরান করছিলো। ওলন্দাজদের উৎপীড়নে ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানরাও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছিলো না। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব তথা সর্বভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ্যেও নেমে এসেছিল চরম দুর্দিন।

এমনি পরাজয় ও নিঃসহায় অবস্থার মধ্যে তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের আশা–ভরসার উৎস ছিলো ওসমানিয়া (অটোমান) সাম্রাজ্য। একমাত্র তুর্কী জাতিই তখন সংকুচিত পরিসরে নিজেদের স্বাধীনতা কিছুটা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিল। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লোলুপদৃষ্টি যে সেখানেও পড়েনি তা নয়। মুসলমানদের এ শেষ সম্বল–স্বাধীন রাষ্ট্রটুকুও গ্রাস করার লক্ষ্যে তারা থাবা উত্তোলন করে। বৃটিশ শক্তি তুর্কীদের বিরুদ্ধে গ্রীকদের লেলিয়ে দেয়। উপমহাদেশের মুসলমান মাত্রেই বৃটিশ রাজের উপর বিরূপ ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

মুসলিম মিল্লাতের এ দুরবস্থা ইকবালকে প্রচন্ডভাবে ব্যথিত ও বিচলিত করে তোলে। ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত ইকবাল উচ্চ শিক্ষার জন্যে ইউরোপে কাটান। প্রাচ্য–প্রতীচ্যের শিক্ষা–দীক্ষা, কৃষ্টি–কালচার আত্মস্থ করেন তিনি। চাক্ষুষ নিরীক্ষণ করেন পাশ্চাত্যের উৎকট সভ্যতা। উচ্চ শিক্ষা শেষে ফিরে আসেন দেশে। প্রেক্ষাপটের করুণ দৃশ্য দেখে তিনি পরিষ্কার এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ঐক্য ও সংহতি ব্যতীত মুসলমানদের আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচার আশু কোন পথ নেই। কারণ, ১৯১০–১১ সালেই সংঘটিত বলকান রণক্ষেত্র থেকে মুসলমানরা বিতাড়িত হচ্ছিলো। ইরান তখন

মরণাপন্ন। ত্রিপোলী মুসলিম শোণিতে রঞ্জিত। ইকবালকে যে ইসলামী আযাদ রাষ্ট্রের স্বপ্ন কুরে কুরে খাচ্ছিলো–সে ইসলামী খেলাফতের প্রদীপ চিরতরে নির্বাপিত হয়ে যাবার অবস্থায় উপনীত। বস্তুত ইসলামের রাষ্ট্রক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বও নির্মূল হবার উপক্রম। অশান্ত এ পরিবেশ–পরিস্থিতির মধ্যেই ইকবাল মুসলিম মিল্লাতকে 'শেকোয়া–জওয়াবে শেকোয়া'র ন্যায় আবেদন কুশল, ইতিহাস–ঐতিহ্য মন্ডিত, অনিন্দ্যসুন্দর কাব্য উপহার দেন। হতাশাদীর্ণ মুসলিম জাতিকে তিনি একজন নকীব ও দ্রষ্টার ন্যায় সঠিক পথনির্দেশ দিয়ে নিয়ে আসেন মানযিলে মাকসুদের দিকে। এ জন্যে তিনি কোন সফল রাজনীতিকের রাজনৈতিক মারপ্যাঁচ বা কোন ঝানু কূটনীতিকের কূটকৌশল অবলম্বন করেননি। কারণ, আল্লামা ইকবালের ছিল গভীর পড়াশোনা, অন্তর্দৃষ্টি, দূরদর্শিতা এবং অভিজ্ঞতা। এসব কিছুর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর মনীষা। তিনি তাঁর মসিতে পদ্য ও গদ্যের মাধ্যমে যে সওগাত জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করেন তা গতানুগতিকতার গন্ডি ডিঙ্গিয়ে জাতিকে দিয়েছে সঠিক পথনির্দেশ। ইকবালের কাব্য সার্বিকভাবে সমাদৃত হবার মূল কারণ দার্শনিকতায়, শব্দ সঙ্গীতে, চিন্তার মৌলিকতায়, অনুভূতির গভীরতায়, উপমার চমৎকারিত্যে, কাহিনী সৃষ্টির নিপুণতায় এবং ঐতিহ্যের প্রয়োগ কৌশলে তাঁর গোটা কাব্য সম্ভার এক অনবদ্য সৃষ্টি।

একবিংশ শতাব্দী বিদায়ের প্রান্তে। বিংশ শতাব্দী দিচ্ছে উঁকি। বিশ্ব পরিস্থিতি আজ চরম অশান্ত। ইকবাল আমাদের মাঝে নেই। তাঁর অমর কর্ম আমাদের আজো আন্দোলিত করছে, করবেও চিরদিন। ইকবালের জীবনদর্শন ও রাজনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে এ সংখ্যাটি ইকবাল প্রেমিকদের হাতে আমরা তুলে দিতে সমর্থ হচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি, মুসলিম বিশ্বের দিক–নির্দেশনায় ইকবালের দর্শন দরকার। কুরআন, হাদীস, ইতিহাস–ঐতিহ্যে ভরপুর ইকবালের কাব্য-দর্শন বিশ্ব মুসলিমকে আজো সঠিক পথের দিশা দেবার ক্ষমতা রাখে।

আল্লামা ইকবাল জুন '৯১ সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধটি ছিলো মূলত অনূদিত। আহমদ নাদিম কাসেমীর ইংরেজী লেখাটির অনুবাদ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবদুল গফুর। ইকবালের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে লেখাটি নাম ঠিকানা ছাড়াই স্মরণিকা আকারে প্রকাশিত হয়। এ ব্যাপারে তখনো তথ্য উদঘাটিত হয়নি কোন্ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্মরণিকাটি প্রকাশ করেছিল। তবে, ১৯৭৭ সালে পাকিস্তান দূতাবাস প্রফেসর সাহেবকে দিয়ে লেখাটি অনুবাদ করিয়েছিলো বলে তিনি জানিয়েছেন। তখন তিনি সেখানে অনুবাদক পদে কর্মরত ছিলেন।

মহাকবি ইকবালের কাব্যধারায় যবুর-ই-আযম

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

এ দুনিয়ার মনীষার সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায় তাতে বিবর্তনের একটা ধারা বর্তমান। দর্শনের ক্ষেত্রে যারা গবেষণা করে তাদের নিজস্ব মতবাদ প্রকাশ করেছেন, তাদের চিন্তার মধ্যে যেমন বিবর্তনের ধারা রয়েছে– তেমনি কাব্যের সৃষ্টিতেও একটি ধারা বর্তমান। দার্শনিকরা বা কবিগণ সে সম্বন্ধে সম্যক অবগত না হতেও পারেন। তারা মানবজীবন সম্বন্ধে বা আদি সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়ে, অথবা আবেশে বিভোর হয়ে রচনা করে চলেন, তবে পরবর্তী কালে তাদের গুণগ্রাহী পাঠক সমাজে বা সমঝদার মহলে তাদের গবেষণা লব্ধ ফল বা সৃষ্টিজাত বিষয়গুলোতে সে ধারা সহজেই আবিষ্কৃত হয়।

মহাকবি ইকবালের রচনাতে বর্তমানকালে বিবর্তনের চারটে স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম স্তরে তিনি 'মাখজানে' যে সব কবিতা লিখতেন সেগুলোকে তার কাব্য সাধনার প্রথম স্তর বলা যায়। এ পর্যায়েই তার 'হিমালা', 'নালায়ে ইয়াতীম', 'রাবি কিনারে', 'নয়া শিওয়ালা' প্রভৃতি কবিতা প্রকাশিত হয়। এ যুগের সর্বত্রই পুরাতন নীতির বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ প্রকাশিত হয়েছে এবং নতুন সৃষ্টির উল্লাসের আনন্দ দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় যুগে (১৯০৫–১৯০৮) ইকবাল জ্ঞান আহরণের জন্য ইউরোপে বাস করেন। এ পর্যায়ে তাত্ত্বিকতার দিকেই তার প্রবণতা দেখা দেয়। তিনি ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ ছেড়ে তার সংস্কৃতিতে যা কিছু উত্তম–তাই গ্রহণ করার জন্য প্রাচ্য দেশবাসীকে আহবান করেছেন। এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে রয়েছে–'হাকিকাতে না–তামাম', 'পায়ামে ইশক' ইত্যাদি।

তার রচনার তৃতীয় যুগে (১৯০৮–১৯২৪) তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এ যুগেই ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে 'তারানাই–মিল্লী', 'শেকোয়া', 'জওয়াবে শেকোয়া', 'আস্‌রার–ই–খূদী' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিতা তিনি রচনা করেন। চতুর্থ যুগে (১৯২৪–১৯৩৮) তিনি ফারসী ভাষায় তার জীবনের গভীর উপলব্ধি–ফল প্রকাশ করেন। এ যুগেই তিনি 'পায়ামে মাশরিক' বা প্রাচ্যের বাণী রচনা করেন এবং তা ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। এ কাব্য জার্মান দার্শনিক কবি গ্যাটের Oest Westieliche Diuan.–এর উত্তর দান প্রসঙ্গে রচিত। দেশ–বিদেশে এ কাব্যের বিশেষ আলোচনা হয়েছিল এবং সর্বত্রই তা বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। এ যুগে তার ভাব বিহঙ্গ উর্ধ্ব থেকে উর্ধ্বতর লোকে উত্তীর্ণ হয়ে নানা অঙ্গন–ধামে আরোহণ করেছিল। এ যুগেই 'যবুর–ই–আযম', 'জাভিদ নামা', 'মুসাফির', 'বাল–ই–জিব্রীল', 'পস চে বাইয়াদ কর্দ', 'যরবে কলীম', 'আরমুগানে হিজায' প্রভৃতি কাব্য তিনি রচনা করেছেন। জাভিদ নামাতে তিনি ইতালীর কবি দান্তের অনুসরণ করে তার রচিত Divinia Comedia-এর আদর্শে

ফারসী ভাষায় তার ভাব ব্যক্ত করেছেন। এতে এ বিশ্বের রাজনীতির বিভিন্ন সূত্র; জগতের ও জীবনের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা করেছেন। এ পর্যায়ের যবুর-ই-আযমের মধ্যে তার দার্শনিক মতবাদ চমৎকার রূপলাভ করেছে। এ জন্য এ কাব্যখানাকে ইকবাল দর্শনের এক শ্রেষ্ঠ রূপায়ণ বলা যায়।

তার মধ্যে তার পূর্ববর্তী পর্যায়ের কোন কোন তত্ত্বের পুনরুক্তি থাকলেও তাতে তার জীবন-দর্শনের অভিব্যক্তিই বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। এ হিসাবে এ কাব্যখানার একটা বিশেষত্ব রয়েছে। এতে ইকবাল-দর্শনের যে তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে-তা তার জীবনের সে আদি দর্শনের নানাভাবই অভিনব রূপেই প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণভাবে দর্শনের মধ্যে প্রাথমিক প্রশ্ন হচ্ছে এ দুনিয়ার আদিসত্তার স্বরূপ কি? এবং সে প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই অপর প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে মানব-জীবনের উৎপত্তি কোথা থেকে? তারও আসল রূপ কি? ইকবালের নিকট থেকে এসব বিবিধ প্রশ্নের কোন বুদ্ধি-জাত উত্তর লাভ সম্ভবপর নয়। কারণ তিনি বুদ্ধি-ভিত্তিক দর্শনের দ্বারা এ সকল উত্তর লাভ করেননি। তা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে স্বজ্ঞা বা intuition-এর মাধ্যমে। এ স্বজ্ঞারই এক উন্নত পর্যায়ে আল্লাহর রাসূল (সঃ) কুরআন-উল-কারীমের সূরাগুলো লাভ করেছিলেন। সে স্বজ্ঞারই ফল তিনি মানব সাধারণের নিকট প্রচার করেছেন এবং তা এক পুরুষ থেকে অপর পুরুষে গৃহীত হচ্ছে ঈমানের মাধ্যমে। এ ঈমানকে ইকবাল গ্রহণ করেছেন উপলব্ধি রূপে। শুধু মাত্র কালিমা উচ্চারণ করেই মানুষ মর্দে মুমিন হয় না। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে তার সমগ্র সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। এ উপলব্ধির ফলেই মানুষ মর্দে মুমিন হয়। তখন তার পক্ষে একমাত্র আদর্শ হচ্ছে আল্লাহর গুণাবলীকে তার জীবনে রূপায়িত করে, ইনসান-ই-কামিল হয়ে এ দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ। এ জন্য আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন গবেষণা না করে তাকে স্বজ্ঞালব্ধ এক অনুভূতির ফল বলেই গ্রহণ করতে হবে। এ অনুভূতিকে মহামতি তলস্তয়ও সকল ধর্মের উৎপত্তির মূল কারণ বলে গণ্য করেছেন।

ইকবালের কাছে তাই দর্শনের মূল লক্ষ্য সে, আল্লাহ কিভাবে এ দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন বা কিভাবে তাঁর গুণাবলী এ দুনিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। এ দুনিয়ায় মানুষের প্রকৃত স্থান কোথায়? এবং মানুষের কর্তব্য কি? যবুর-ই-আযমের মধ্যে ইকবাল এ সকল প্রশ্ন উথাপন করে সেগুলোর উত্তরও দিয়েছেন।

আল্লাহ্র এ সৃষ্টির মধ্যে মানুষই যে সকল সৃষ্টির সেরা-তা তিনি উপলব্ধি করেই বলছেন, মানুষের ধূলি একদা ফেরেশতার আলোকের চেয়ে উজ্জ্বল হবে।

জানি আমাদের ভাগ্যের পথে ধরা

তারকাদীপ্ত আকাশের রূপ লাভ। (১)

যে মানুষকে হাদীস-ই-কুদসীতে বলা হয়েছে আশরাফ-উল-মাখলুকাত, সে মানুষই যে একদা ফেরেশতাদের চেয়ে উন্নততর স্থান লাভ করবে-সে সম্বন্ধে কবি ছিলেন নিশ্চিত। সে মানুষের জন্ম হয়েছে আল্লাহর প্রেম থেকে। আল্লাহ ছিলেন একাকী। তাঁর হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হলে তিনি মাশুকের সৃষ্টি করলেন। কারণ প্রেমাস্পদ ব্যতীত এ দুনিয়ায় প্রেমিক থাকতে পারে না। তাই ইকবাল বলছেন-

চলেছিলো বিশ্বজুড়ে সন্ধান প্রেমের

অবশেষে জন্ম আদমের।

পানি থেকে, থেকে মৃত্তিকার-

প্রকাশ তাহার

চন্দ্রসূর্য সুদূরের তারকার দল

প্রতিষ্ঠায় লাগেনি কৌশল,

জীবনের হাটে তাই ক্রয়ের ইচ্ছায়

একটি হৃদয় দিলো আদমের ধূলি কণিকায় (২)

চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করে আল্লাহ তাদের ছেড়ে দিয়েছেন তাদের নিজস্ব কক্ষের মধ্যে। তাদের সঙ্গে তাঁর প্রেমের কোন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা হয়নি। তিনি প্রেমের আবেগে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন বলেই মানুষের সঙ্গে তার রয়েছে এক অপূর্ব সম্বন্ধ। কারণ এ মানুষকেই তো তিনি ইনসান-ই-কামিল করে এ দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

এ জীবনের আসল রূপ এবং তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে চিরন্তন প্রশ্ন মানুষের জীবনে দেখা দেয় তার মীমাংসাকল্পে তিনি বলেছেন-

কি এ জীবন? একটি মুক্তো-

হইবে শুধু তোমার ঝিনুক দিলে।

ছড়িয়ে দেবে শিখার বুকে

নয়তো যাবে হাওয়ার সঙ্গে মিলে। (৩)

যে প্রেম থেকে মানব জীবনের উৎপত্তি -সে প্রেমের আধার হলো মানুষের হৃদয় বা দিল। সে দিলকে ঝিনুকের মত মনে করো না। সে দিলকে প্রসারিত করে এ বিশ্ব চরাচরের সর্বত্রই

তোমার প্রেমকে ছড়িয়ে দাও। এ ধরার বন্ধনও চিরন্তন নয়। একে অস্বীকার করে তোমার প্রেমের মাধ্যমে তুমি সর্বত্র ব্যাপ্ত হও–

ছিন্ন ধরার প্রভাব ছেড়ে

তীব্রগতি ছোটাই ভালবাসা

চাঁদের উজল খানি

স্বচ্ছ আকাশ বক্ষে ছুঁড়ে আসা (৪)

এ প্রসঙ্গে তাই তিনি দর্শন শাস্ত্রের মূল লক্ষ্যের সম্বন্ধেও বলেছেন–

দর্শনেরই শিক্ষা হবে

কেবলমাত্র দীপ্ত জোসের বলে

চিন্তাধারার ক্ষুর–শানানো

ধরার বুকে নিপুণ কৌশলে। (৫)

ইকবাল যে ঈমানকে প্রাধান্য দেন, সে ঈমান সম্বন্ধে তিনি বলছেন–

জীবন্ত এই আত্মাখানির

ঈমানটুকু বাজে স্বপ্ন নয়

ছড়ানো এই ধূলা দিয়েই

নকশা গড়া অধিক শক্তিময় (৬)

এই ঈমানের শক্তিতে বলবান হলেই মানুষের পক্ষে এ ধুলির ধরণীতে অসাধ্য সাধন করা সম্ভবপর।

ইকবালের কাছে এ আত্মা জীবন্ত। তবে এ দুনিয়া ধূলি দিয়েই যে তাকে নতুন সৃষ্টি করতে হবে–সে এ ধূলির মধ্যে নিজেকে বন্দী করবে না। এ পৃথিবী এখন জরাজীর্ণ, একে ভেঙে ফেলেই নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করতে হবে–

জরাজীর্ণ এ পৃথিবী ভেঙে ফেলে দাও–

তারপর তুমি তারে আবার বানাও।

লা ইলাহা নিয়ে ব্যস্ত ছিল যে দিল

কোন দিন ইল্লা তার হয়নি হাসিল (৭)

যে কালিমার বলে মানুষ মর্দে মুমিন হয়, সে কালিমার আরম্ভ হয় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ থেকে, তার প্রথমেই রয়েছে কোন ইলাহ নেই। তার পরে রয়েছে–আল্লাহ ব্যতীত। মর্দে মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে তার মানস থেকে অন্য যত রকমের আল্লাহর পরিপন্থী বুৎ বা Idol রয়েছে–তাকে পরিষ্কার করে তাদেরই স্থানে একমাত্র সে আল্লাহর স্থান স্বীকার করা–একমাত্র তাঁকেই একমাত্র সার্বভৌম শক্তি বলে স্বীকৃতি ও তাঁর সত্তার উপলব্ধি। মানুষ সে বুৎ বা Idol-গুলো তাড়িয়ে দিয়ে এ দুনিয়ার আরও নানা বিষয়বস্তুর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে–এ জন্য কালিমার বাকী অংশটুকু–আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সার্বভৌম নেই–এটুকু মন-প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করতে ইতস্তত করে। এ জন্যই তার জীবনে সত্যিকার জ্ঞান লাভ হয় না। এ জন্য ইকবাল মানব জীবনের পক্ষে প্রধান প্রতিবন্ধক–এ পৃথিবীকে ভেঙে ফেলে দেবার জন্য মানব জাতিকে আহবান করছেন।

একথা সত্য যে, যবুর-ই-আযমের মধ্যে ইকবালের রাজনৈতিক বৈপ্লবিক চিন্তার ফলও প্রকাশ পেয়েছে। যে ইনকিলাব শব্দ নিয়ে আজকাল আমাদের এ দেশে এত শ্লোগান শোনা যায়, সে ইনকিলাব শব্দটি ইকবালের মুখ থেকেই প্রথম বেরিয়েছিল। তবে এ পর্যায়ে এ যবুর-ই-আযমেই ইকবাল তার দার্শনিক মতবাদের একটা পরিষ্কার রূপ দিয়েছেন। এ জন্য ইকবাল সাহিত্যে তা এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তার মানসের বিবর্তনের মধ্যে এ পুস্তিকাখানা তাই একটা শ্রেষ্ঠ স্থান পাওয়ার যোগ্য। (৮)

প্রমাণপঞ্জী

১. ইকবালের যবুর-ই-আযম, আব্দুর রশীদ খান অনূদিত। প্রকাশক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৩ বাং, এপ্রিল ১৯৮৭–পৃঃ ১।

২. ঐ –পৃঃ দুই।

৩. ঐ–পৃঃ তিন।

৪. ঐ–পৃঃ তিন।

৫. ঐ–পৃঃ তিন।

৬. ঐ–পৃঃ তিন।

৭. ঐ–পৃঃ তিন।

৮. ঐ যবুর-ই-আযমের পূর্বোক্ত প্রকাশ দ্রষ্টব্য।

ইকবালকে প্রয়োজন কেন

ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন

১৯৯১ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি স্পেনের কর্ডোবা শহরে ইকবাল সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন পাকিস্তান এবং স্পেন সরকারের সহযোগিতায় আয়োজিত হয়। এ সম্বন্ধে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে প্যারিসের ইসলাম এবং পাশ্চাত্য জগৎ (Islam et Occident) নামক একটি সংস্থা। এর সভাপতি ডঃ ফ্রান্সিস লার্মা ১৯৯০ সালের শেষদিকে পাকিস্তান এসেছিলেন। তাঁর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে পাকিস্তান সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলনে যোগ দিতে সম্মত হন। সম্মেলনের যে কর্মসূচী প্রচারিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, বিশ্ববিখ্যাত বহু পন্ডিত এতে অংশগ্রহণ করবেন। এদের শীর্ষে রয়েছেন জার্মানীর ডঃ আন মারী শিমেল (Dr Anne-Marie Schimmel)। ইনি বহুকাল ধরে ইকবাল চর্চা করছেন। কয়েকবার বাংলাদেশেও এসেছেন। সুফীবাদে বিশ্বাস করেন। শুধু ইকবাল নয়, ইরানের বিখ্যাত সুফীদের রচনার সংগেও তিনি পরিচিত।

যাক এসব কথা। বিশ্বে ইকবাল সম্বন্ধে কৌতূহল এ–ই নতুন নয়। ইকবালই এ উপমহাদেশের একমাত্র কবি, যার কাব্য একাধিক ব্যক্তি ইংরেজীতে তরজমা করেছেন। জার্মান, ফরাসী, ইতালীয় এবং স্প্যানিশ ভাষায়ও অনুবাদ বেরিয়েছে বলে শুনেছি। ইকবালের প্রতি এই যে অনুরাগ, সেটা শুধু তাঁর কাব্যের নিছক সাহিত্যিক মূল্যের জন্য নয়। একথা সত্য যে, তিনি খুব উঁচু দরের কবি ছিলেন। উর্দূ সাহিত্যে তিন–চারজন কবির নাম উল্লেখ করলেও ইকবালের নাম উচ্চারণ করতে হয়। আরও মজার কথা ইকবাল দাগ, মীর বা গালিবের মত রোমান্টিক কবি ছিলেন না। নর–নারীর প্রেম সম্পর্কে বিশেষ কিছু তিনি লেখেননি এবং প্রথম জীবনে দেশপ্রেম সম্পর্কে যে দু'একটি কবিতা লিখেছিলেন শেষদিকে এ সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণ পরিহার করে অন্য এক জগতের পরিচয় তিনি তুলে ধরেছেন। তবুও তার প্রতি দুনিয়া জুড়ে এই শ্রদ্ধা নিবেদনের কারণ কি?

একথা সত্য, ইকবাল একদিকে যেমন কবি অন্যদিকে তিনি দার্শনিক এবং সেটা সাধারণ অর্থে নয়। আমরা এ দেশে যিনি কোন প্রবন্ধ লেখেন তাকে চিন্তাবিদ বলতে অভ্যস্ত এবং প্রবন্ধকার, ঔপন্যাসিক ও কবির দর্শন চিন্তা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন, দর্শন শাস্ত্র সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞ তারা এই সংজ্ঞা মেনে নেবেন না। কারণ, দর্শন বিশ্ব রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান উপার্জনের একটি নির্দিষ্ট উপায় বা পন্থা–যার মধ্যে ভাবাবেগের প্রশ্রয় থাকে না।

প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে প্রথম দর্শনের উন্মেষ ঘটে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন প্লেটো এবং তার শিষ্য অ্যারিস্টটল। কিন্তু এ দু'জনের মধ্যে নিছক তাত্ত্বিক হিসেবে অ্যারিস্টটলের

স্থান প্লেটোর উপরে। প্লেটো ছিলেন মূলত কবি এবং তার দর্শনের মধ্যে কাব্যের ছায়াপাত লক্ষণীয়। অ্যারিষ্টটল সেদিক থেকে নিরস, কিন্তু তা হলেও মধ্যযুগে অ্যারিষ্টটলের প্রভাব প্লেটোকে ছাড়িয়ে যায়। মুসলমান দার্শনিকরা আফলাতুন (Plato) এবং আরস্ত (Aristotle)-এ দু'জনের সংগেই পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা যে নতুন দর্শন সৃষ্টি করেন তার মধ্যে আরস্তর প্রভাব বেশী। ঠিক তেমনি মধ্যযুগের খ্রীষ্টান দার্শনিকেরা অ্যারিষ্টটলের চিন্তাধারার সংগে খ্রীষ্টান ধর্মের সমন্বয় ঘটিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, খ্রীষ্টান ধর্ম দর্শনসম্মত।

ইকবালকে আমরা পেয়েছি দুইরূপে। একদিকে তিনি কবি, যদিও তার কাব্যই ছিল তার দর্শনের বাহন, অন্যদিকে তিনি নিছক দার্শনিক। দর্শন শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর রচনা লিখিত হয়েছে ইংরেজী ভাষায়। প্রথম জীবনে যখন তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন তখন Persian Metaphysics বা পারস্যের দর্শন সম্বন্ধে একটি সন্দর্ভ লিখেছিলেন।

তার পরিণত বয়সের চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে ৬টি বক্তৃতায়। এই বক্তৃতা সংগ্রহের নাম 'ইসলামে ধর্ম চিন্তার পুনর্গঠন। (Reconstruction of Religious Thought in Islam) এই বক্তৃতাগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, দর্শনের ভাষা ব্যবহার করে এবং দার্শনিক চিন্তাধারার আলোকে তিনি ইসলামের মর্মবাণী ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। এর মধ্যে ভাবাবেগের প্রশ্রয় নেই এবং যে মানসের প্রতিফলন এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়– তিনি পাশ্চাত্য ধর্ম ও দর্শন–চিন্তার সংগে গভীরভাবে পরিচিত। বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে, ইসলামের চিন্তাধারা এবং গ্রীক চিন্তাধারার মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান বর্তমান। এই কারণে অন্ধভাবে পাশ্চাত্যের অনুকরণের বিরুদ্ধে তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। যে ব্যবধানের উল্লেখ করলাম তার মূল ইসলামের এই বিশ্বাস যে, জ্ঞানের একটি উৎস ওহী বা রিভিলেশন বা ঐশিক অনুপ্রেরণা অর্থাৎ মানুষের জ্ঞানের অতিরিক্ত একটা জগৎ আছে যার সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে হলে নির্ভর করতে হয় ওহীর উপর, তার বিকল্প নেই এবং সেটাকে বাদ দিয়ে কোন নীতি ব্যবস্থা নির্মাণ করা সম্ভব নয়। মানুষ যদি শুধু নিজের যুক্তির উপর নির্ভর করে তার নৈতিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, সে এমন এক পর্যায়ে এসে পৌছায় যখন অনেক প্রশ্নের উত্তরই আর পাওয়া যায় না। একথা যে গ্রীক বা আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিকদের অজ্ঞাত তা নয়। কিন্তু তারা রিভিলেশনের কথা স্পষ্টভাবে ইসলামের মত স্বীকার করেননি। প্লেটো লিখেছেন যে, সমস্ত বস্তুর আদিরূপ বা কর্ম মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। যেমন– আমরা কুকুর, বিড়াল বলতে বা গাছ বলতে বিভিন্ন কুকুর, বিড়াল বা গাছের কথা ভাবি, কিন্তু একটি বিশেষ কুকুর বা বিড়ালকে দেখামাত্র তাকে শিয়াল বা বাঘ বলে চিৎকার করে উঠি না। গাছও বিভিন্ন রকমের। একটার সংগে আর একটার মিল মোটেই নেই। কিন্তু উদ্ভিদকে কেউ প্রাণী বলে না। যেমন– প্রাণীকে কেউ উদ্ভিদ বলে না। তাই প্লেটো বিশ্বাস করতেন যে, সমস্ত বস্তুরই একটি আদিরূপ বা Archetype আছে যা অনন্তকাল থেকে নির্দিষ্ট। আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে

যিনি সর্ববিখ্যাত সেই কান্টও স্বীকার করেছেন কোন বস্তুর মূল পরিচয় সর্বদাই আমাদের জ্ঞানাতীত থাকবে। কিন্তু এরা কেউ ওহীর কথা বলেননি।

মধ্যযুগে খ্রীষ্টানদের মধ্যে যে দর্শন গড়ে ওঠে তার প্রধান কথা ছিল যে, যীশু একাধারে মানুষ এবং দেবতা, এই বিশ্বাসকে টমাস অ্যাকুটইনাস অ্যারিষ্টটলের চিন্তাধারার আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। ইকবাল যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, সোজাসুজিভাবে ওহীর প্রয়োজন স্বীকৃত হয়নি বলেই খ্রীষ্টানদের অবতারবাদে বিশ্বাস করতে হয়েছে।

তাদের কাছে দৃষ্টিগ্রাহ্য বিশ্ববহির্ভূত জ্ঞানের উৎস ওহী নয়, যীশু নামক অবতার। এখানেও শুধু মানবিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করা হয়। কিন্তু সেটা এমন উপায়ে যা যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

খ্রীষ্টান অবতারবাদের সংগে হিন্দু অবতারবাদের তফাৎ শুধু এইটুকু যে, God একবারমাত্র মানবরূপ গ্রহণ করে পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং এই আগমনের হেতু প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) আল্লাহর হুকুম অমান্য করে যে পাপ করেন সে পাপের ফল থেকে মানব সমাজকে উদ্ধার করা। হিন্দুরা বিশ্বাস করে যাদের ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন এরকম একজন অবতার ছিলেন ভগবৎগীতার শ্রীকৃষ্ণ। আরও অবতার এসেছেন এবং ভবিষ্যতেও তাদের আবির্ভাব ঘটবে। অন্যদিকে মুসলমানরা বিশ্বাস করে আল্লাহর ওহী নাযিল হয়েছে রাসূলদের মারফৎ এবং এই প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদের (সঃ) মধ্যে– এ জন্য তাঁকে খাতেমুন নাবিয়্যীন বলা হয়।

ইকবাল এই তত্ত্বের এমন একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা আর কারো রচনায় আমার চোখে পড়েনি। তিনি বলেছেন যে, সভ্যতার প্রারম্ভিব যুগে যখন মানুষের অনেক সম্ভাবনা অনুন্মেষিত থাকে তখন এমন পথপ্রদর্শনের প্রয়োজন যিনি আল্লাহর বাণী মানুষকে পৌঁছে দেবেন। সেখানে আদেশ হচ্ছে যে, এই বাণী বা কালাম নিঃসংকোচে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, সভ্যতার মূলে যে সমস্ত মৌলিক নীতি থাকা প্রয়োজন, যেগুলি বাদ দিলে সভ্যতার ভিত ভেঙ্গে পড়বে সেই নীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছিল রাসূলদের উদ্দেশ্যে। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) যে বাণী এনেছিলেন তার মধ্যে মানুষকে ভবিষ্যতে যুক্তি এবং চিন্তা ব্যবহার করে ভবিষ্যতে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ আছে।

ইকবাল মনে করতেন এটা সভ্যতার এক পর্যায়ে থেকে আর এক পর্যায়ে উত্তরণের একটা নির্দেশ। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে ইজতিহাদের কথা উল্লেখ আছে। ইজতিহাদ অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর কালামের মর্মমাণী থেকে মানুষ সরে যাবে। কিন্তু ইকবাল তার বক্তৃতায় বলেছেন যে, ইজতিহাদ প্রয়োগ করার অর্থ কোরআন এবং হাদীসের আলোকে নতুন সমস্যাবলীর সমাধান আবিষ্কার করা। যুক্তি প্রয়োগ করার এই যে ক্ষমতা, এটা আল্লাহরই একটা দান বা নেয়ামত। এটাকে অবহেলা করার অর্থ সমাজে জড়তার সঞ্চার করা।

ইকবাল বিশেষ করে তৎকালীন মুসলিম সমাজের জড়তার বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে গেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, গত পাঁচ শতাব্দী ধরে মুসলমানের মধ্যে যে বিপর্যয়, হতাশা এবং অনগ্রসরতা– তার প্রধান কারণ চিন্তার জড়তা। অথচ এককালে মুসলমানরাই দর্শন এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছিলেন অগ্রগামী। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা মুসলমানদের দান গ্রহণ করেই গড়ে উঠেছে। আমরা যারা প্রকাশ্যতঃ কোরআন–হাদীসের অনুসারী তারা এমন এক জীবনধারা অবলম্বন করেছি যা ইসলামের মর্মবাণীর বিরোধী। ইকবালের যে খুদিতত্ত্ব সে তার ইজতিহাদের উপর আস্থারই প্রতিফলন। এ জন্য অনেক মুসলমান পাঠকও তাকে প্রথম প্রথম ভুল বুঝতেন। অনেকের হয়ত জানা আছে যে, তার শেকোয়া যখন প্রকাশিত হয় কেউ কেউ তাকে কাফিরের ফতোয়া দিয়েছিলেন। যে কারণে ইকবাল ইজতিহাদের উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করতেন, ঠিক অনুরূপ কারণেই তিনি মুসলিম সূফীদের ওয়াহদাতুল ওজুদ বা সর্বেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি নিজেও সুফী ছিলেন, কিন্তু তার সূফীবাদের ভিত হল ওয়াহ্দাতুশ শুহুদ। যারা সর্বেশ্বরবাদ বা Pantheism বললে আঁৎকে ওঠেন তারাই আবার সমার্থক আরবী শব্দ ওয়াহদাতুল ওজূদে আপত্তি করেন না। এই কারণে মুসলমান সমাজের এক অংশের মধ্যে এখনও নানা সংশয় বিদ্যমান। ইকবাল দেখিয়েছেন স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে ফারাক স্বীকার না করার অর্থ এমন ভয়ংকর যে, সে নীতিবোধ না হলে সভ্যতাই টিকতে পারে না। সেই নীতিবোধের মূলেই আঘাত করা হয় এবং আরও আপত্তি হচ্ছে যে, শুধু মানুষ নয়, প্রাণীসমাজ বা জড় পদার্থকেও পূজনীয় ভাবতে হবে। ন্যায়–অন্যায়, ভাল–মন্দ, মঙ্গল–অমঙ্গলের যে তফাৎ পার্থিব জীবনে আমরা লক্ষ্য করি তাও বিলুপ্ত হয়। তাছাড়া এর ফলে সমাজের নিষ্ক্রিয়তা এবং অবসাদের সঞ্চার হতে বাধ্য। অথচ কোরআনের মূল কথাই হচ্ছে মানুষ আল্লাহর খলীফা; তিনি মানুষকে একটা দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং এ দায়িত্ব পালন করতে হলে স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির কি সম্পর্ক– সে সম্বন্ধে পুরোপুরি অবহিত হতে হবে। স্রষ্টা ও সৃষ্টি যদি অভিন্ন হয় তাহলে দায়িত্বের প্রশ্ন ওঠে না।

এই স্পষ্ট বিশ্লেষণের ফলে ইসলামের যে রূপ বর্তমান যুগে আমরা উপলব্ধি করতে পারছি অনেকদিন সেটা আমাদের কাছে রহস্যাবৃত হয়ে ছিল। ইসলাম সম্পর্কে ইকবালের আত্মপ্রত্যয় এত গভীর ছিল বলেই তিনি ইসলামকে মানবসমাজের সার্বজনীন কল্যাণের বাণী হিসেবে দেখতে পেয়েছিলেন তার বক্তৃতায় যেমন, তেমনি তার বিখ্যাত কাব্য জাবিদনামায় তিনি দেখিয়েছেন যে, ইসলামই একমাত্র দর্শন যার উপর সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্মিত হতে পারে। আধুনিককালে আর কেউ ইসলামের এই সার্বজনীন রূপকে এভাবে উপস্থাপিত করতে পারেননি।

কাব্য, অনুবাদ ও পাঠক

শাহেদ আলী

ইকবালের কবিখ্যাতি পাকিস্তান, ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পাকিস্তানের স্বপ্ন-দ্রষ্টা হিসাবে উপমহাদেশে তাঁর একটা বিরাট পরিচিতি ও স্থান আছে এবং পাকিস্তানে আছে একটা অতুলনীয় মর্যাদা। একজন কবির স্বপ্ন থেকে একটি রাষ্ট্রের জন্ম-পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিরল ব্যাপার। এ জন্যে পাকিস্তানীদের কাছে তো বটেই, বিশ্বের রাষ্ট্রনীতি তত্ত্বের দার্শনিকদের কাছেও তাঁর রয়েছে এক বিস্ময়কর এবং কৌতূহলোদ্দীপক মর্যাদা। কিন্তু কাব্য-রসিক এবং সাহিত্যামোদীদের কাছে ইকবাল মূলত এবং প্রধানত একজন কবি, যিনি উর্দু এবং ফারসী ভাষায় কবিতা রচনা করলেও, তাঁর কাব্যের আবেদন ভাষার গন্ডি ডিঙ্গিয়ে তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। সত্য ও সৌন্দর্য সীমা মানে না। ইকবালের কাব্যে সত্য ও সুন্দরের যে প্রবল অভিব্যক্তি ঘটেছে তা ভাষার বন্ধন অতিক্রম করে, বন্যাবেগে আছড়ে পড়েছে, দেশে দেশে মানুষের হৃদয় তটে! এভাবেই, প্রকৃত সৃষ্টি একটি বিশেষ ভাষা, ভূগোল ও নিসর্গের মধ্যে জন্ম নিয়ে কালে তা বিশ্বের সকল মানুষের সম্পদ হয়ে ওঠে। সেই সিদ্ধির টীপ যতোদিন না কোনো কাব্যের কপালে পড়েছে, তার আগেও তা একটা জাতি, জন বা ভাষাগোষ্ঠীর চৈতন্যের কল্লোল-ধ্বনিরূপে হয়ে ওঠে তার আত্মার সংগীত। আর এ হচ্ছে কাব্যে প্রাথমিক সিদ্ধি। ইকবালের ভাগ্যে এই দুই সিদ্ধিই ঘটেছে- তাই তিনি একটি দেশের জাতীয় কবি হয়েও বিশ্ব-জনের কবি।

আজকের বাংলাভাষীদের কাছে ইকবাল কেবল একটা নাম, তাঁর কাব্যের সংগে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই, কেবল কিছু অনুবাদের মধ্যে তাঁকে অনুসন্ধানের প্রয়াস ছাড়া। কিন্তু কবিতা তো অনুবাদের বিষয় নয়; সৃষ্টি অনুবাদের মাধ্যমে আপন পরিচয় দিতে চিরকালই গররাজি! কবি তাঁর নিজের ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করেন নিজেকে; বাগানে বিচিত্র রঙ-বর্ণ ও গন্ধের ফুল ফুটে ওঠার মতোই কবির কাব্য-কুঞ্জ। বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ নিয়েই এক একটি ফুল, একেকটি ফল শোভা পায় বৃক্ষ-লতায়। কবি তো তার কাব্য-কুঞ্জে ফুল-ফলেরই চাষ করেন- তিনি কখনো পাঠককে আতরের গন্ধ বা ফলের রসের জন্য তাঁর কাব্য-কুঞ্জে আমন্ত্রণ করেন না। কবির ফুলের সভায়, ফুলের সমারোহে পাঠকের ভিড় হয়। ঈদের দিনে আমরা গোলাপের আতরের জন্য যাই দোকানীর কাছে, কবির বাগানে গোলাপের জন্য যাই না। গোলাপ মানে কেবল খোশবু নয়-সবুজ পাতার মধ্যে স্নিগ্ধ-মোলায়েম পাপড়ি মেলে, বুকভরা স্বর্গীয় সুরভি নিয়ে ফুটে ওঠা, বিস্ময়কর অবয়ব বিশিষ্ট যে বস্তুটি আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়, তাতে কেবল আমাদের নাসিকা তৃপ্ত হয় না, আমাদের চক্ষু এবং হৃদয় সমেত গোটা

চৈতন্য আনন্দের সারি গান গেয়ে ওঠে। তাই কবিতা ফুলের সাথে তুলনীয়। আর তার ভাব তুলনীয় ফুলের নির্যাস বা আতরের সংগে। অনুবাদ, ফুলকে দলিত মথিত করে নির্যাস বার করার মতোই। অনুবাদে আমরা কেবল কবির ভাবের সংগেই পরিচিত হই, আমরা কবিকে পাই না।

এ জন্য ইকবালের কাব্য যখনি আমাদের আলোচনায় আসে, আমরা কেবল তাঁর ভাব, চিন্তা ও দর্শনের বিচার-বিশ্লেষণেই মেতে উঠি। কবিকে ভুলে যাই। কবির ভাষা, তাঁর উপমা- প্রতীক, তাঁর শব্দ নির্মাণ, তাঁর সৃজনশীল আগ্রহ-উদ্দীপনার অনিবার্য চাপে যে বিশেষ রূপ ধারণ করে, অনুবাদে তা পাওয়া যায় না। অর্থাৎ যে গুণে ভাষা তার গতানুগতিকতার বেড়া ডিঙ্গিয়ে কাব্য হয়ে উঠে, সেই গুণটাই মারা যায়। ফলে, কেবল কবির চিন্তা ও দর্শন (যদি কিছু থাকে) আমাদের মগজকে বিদ্ধ করে, আমাদের ইন্দ্রিয় ও হৃদয়লোককে আনন্দ- বেদনার রসে আপ্লুত করে না। কবির ভাষা আর পাঠকের ভাষা যখন অভিন্ন হয় এবং কবির বাচনভঙ্গি, তাঁর উপমা-উৎপ্রেক্ষা, তাঁর অতীত-কথার ব্যবহার, তাঁর অনুষঙ্গ-নিসর্গ পরিচয় পাঠক যখন সহজেই অনুসরণ করতে সক্ষম, তখনি সে প্রবেশ করতে পারে কবির নিজস্ব ভুবনে। ইকবালের সার্থক কাব্য বিচার যে আমাদের ভাষায় হয় না বা হতে পারছে না, তার প্রধান কারণ- এদেশের পাঠকদের অনেকেই, বিশেষ করে কবি ও সাহিত্যিকগোষ্ঠী, বিশ্ব সাহিত্যের খবর রাখেন ইংরেজির মাধ্যমে, যে ভাষার চর্চা এদেশে প্রায় দু'শ' বছর হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশাসনের মাধ্যমে, কিন্তু ইকবালের কাব্যভুবন তাদের প্রায় অগম্য তাঁর কাব্য ভাষার জন্য; কারণ, ইকবাল উর্দু ও ফারসী ভাষায় তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলো লিখেছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সাহিত্যমনা লোকেরা উর্দু-ফারসীর চর্চা করেন না বলে, ইকবাল তাঁদের কাছে অনেক দূরের কবি। তাতে বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ কবির সাহিত্য কর্মের রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত হয়ে আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি।

বাংলা ভাষায় ইকবালের অনেকগুলো কাব্যের অনুবাদ হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। অনুবাদকদের মধ্যে রয়েছেন সৈয়দ আবদুল মান্নান, আশরাফ আলী খান, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, গোলাম মোস্তফা, মীজানুর রহমান, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন,, মোহাম্মদ সুলতান, অধ্যাপক আদামুদ্দিন, সৈয়দ আলী আহসান, মনীর উদ্দীন ইউসুফ প্রমুখ। কেউ কেউ পুরো একেকটি কাব্য তরজমা করেছেন, কেউ কেউ নির্বাচিত কবিতা অনুবাদ করেছেন বাংলায়। এতে করে ইকবালকে আমরা পুরোপুরি না জেনেও তার ধ্যান-ধারণার সাথে কিছুটা পরিচিত হতে পেরেছি। ফররুখ আহমদের অনূদিত অনেকগুলো কবিতায় ইকবাল-হৃদয়ের উত্তাপ আমরা অনুভব করি কিছুটা; কিন্তু জানা যায়, তিনিও অনুবাদ করেছিলেন ইকবালের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ থেকে। এতে বোঝা যায়, ইকবাল থেকে আমরা কতো দূরে রয়েছি। কেবল ইকবাল কাব্যই নয়, বিশ্বের যে কোনো শ্রেষ্ঠ কাব্যই, তা আমাদের নিজ ভাষা ছাড়া, অন্য যে কোনো

ভাষায়ই রচিত হোক, যদি না সে ভাষা, আমাদের প্রায় মাতৃভাষার মতোই হয়, তার প্রাণ সঞ্চারী উষ্ণ আবেদন থেকে আমাদের দূরত্ব একই! আমার নিজের কতো আফসোস যে, জার্মান ভাষা জানিনে বলে বিশ্বের অন্যতম মহত্তম কবি গ্যাটের জগতে আমার প্রবেশাধিকার নেই। উর্দু কিংবা ফারসী ভাষা আয়ত্ত করতে পারিনি বলে রুমী, হাফিজ ও ইকবালের কাব্য কুঞ্জের দরোজা আমার জন্য প্রায় বন্ধ। তরজমায় এসব মহৎ কবির চিন্তা-দর্শন এবং ভাবের সাথেই কেবল পরিচিত হই। যে আধারে কবির এই ভার চিন্তা অবয়ব লাভ করে দুর্লভ কবিতা হয়ে উঠেছে তা আমাদের নাগালের বাইরেই থেকে যায়। আমরা অনিবার্য ছন্দ, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, শব্দমালায় নির্মিত কবিতার অবয়ব বাদ দিয়ে, কেবল তার রূহ বা আত্মা নিয়েই তৃপ্ত থাকার চেষ্টা করি- ভুলে যাই যে দেহের আধারে বাঁধা না পড়লে, আত্মাও অনির্দেশ্য হয়ে পড়ে।

ইকবাল কাব্যে নিসর্গ, তার ছন্দ ব্যঞ্জনার নূপুরে অনুরণিত সংগীতময় হয়ে ওঠা বাণীর মূর্ছনা-উন্মাদনা পাঠককে ধাক্কা দিয়ে সুপ্তি-মগ্নতা থেকে জাগিয়ে দেয়, তার আলস্য স্থবিরতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তাকে করে তোলে গতিময় দুর্বার তরংগের মতো দুর্দম জীবনের অভিসারী। ইকবালের কাব্য ভাষায় যাদের প্রবেশ অবাধ, ইকবাল কাব্যে গতিবাদ-গতিই জীবন, তাঁর 'খূদী' তথা ব্যক্তিত্বের পরম বিকাশের মাধ্যমে পূর্ণ মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ, যেভাবে তাদের সমগ্র চৈতন্যকে আপ্লুত করে, কল্পনায় আগুন ধরিয়ে দেয়, আমাদেরকে তা করে না পুরোপুরি। তবু তা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তাকে সক্রিয় করে তোলে আর আমরা এক দার্শনিক ও চিন্তাবিদের সহগামী হয়ে উঠি- আপাতত এ-ই আমাদের লাভ। কিন্তু বিশ্বের মহত্তম কবিদের কেবল চিন্তা নয়, কাব্যের স্বাদ পেতে হলে তাদের ভাষা আয়ত্ত করতে হবে। ইকবালের সুউচ্চ কাব্য ভুবনে প্রবেশের সিঁড়ি হচ্ছে তার ভাষা। উর্দু এবং ফারসী ভাষার চর্চা ত্যাগ করে তো আমাদেরই ক্ষতি হয়েছে। কোনো ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা কেবল মূর্খতাকেই বাড়িয়ে চলে। যতো বেশি পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষাগুলোর দরোজা খোলার চাবি আমাদের হাতে আসবে, দুনিয়াটা আমাদের জন্য ততো বেশি প্রশস্ত হয়ে উঠবে-কেবল যে কাব্য ও সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণের জন্যই তা নয়, বৈষয়িক দিক দিয়েও।

ইকবালের দৃষ্টিতে মুসলিমদের বিজ্ঞান মনস্কতা

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী

বিজ্ঞান সভ্যতা আজ উন্নতি-উৎকর্ষতার শীর্ষে। মানুষ মুহূর্তের মধ্যে দূর থেকে দূরে দ্রুতযানের সাহায্যে চলে যাচ্ছে। পাখীর ন্যায় শূন্যে-মহাশূন্যে উড়ে বেড়াচ্ছে। চলে যাচ্ছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। মহাশূন্য যানে করে মানুষ মহাকাশের অনেক অজানা তথ্য-রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা করছে। চন্দ্র-পৃষ্ঠে করেছে তারা অবতরণ। মুহূর্তের মধ্যে নিজের কণ্ঠস্বর বেতারে পৌঁছে দিচ্ছে হাজার হাজার মাইল দূরে। তারা আবিষ্কার করেছে কম্পিউটার। আবিষ্কার করেছে দূরবীণ। পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কার দিনের পর দিন মানুষের সামনে শক্তির নতুন উৎসের দ্বার খুলে দিচ্ছে। মানুষ এ বিজ্ঞান গবেষণা তথা মহাস্রষ্টা আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর উপর গবেষণা চালিয়ে এগুলোর বহুমুখী ব্যবহারে অত্যাশ্চার্য সফলতা অর্জন করেছে। মানব গবেষণাপ্রসূত আবিষ্কারের এ সফলতা দ্বারা মানুষ অনেক দিক থেকে উপকৃত হচ্ছে। অবশ্য দুষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের হাতে পড়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ আবিষ্কার মানবতার অকল্যাণেও ব্যবহৃত হচ্ছে না যে, তা নয়। মহাস্রষ্টা আল্লাহর এ সৃষ্টি এবং সৃষ্ট জগত সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে যারা মানব কল্যাণে এ বিস্ময়কর সফলতা দেখালেন বা দেখাচ্ছেন, তারাই বর্তমানে বিশ্ব নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে সমাসীন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও আবিষ্কারে যাদের রয়েছে অগ্রণী ভূমিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে, সমগ্র দুনিয়ার মানুষ মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই তাদের মুখাপেক্ষী। কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক, কি সামরিক ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই দুনিয়ার মানুষ তাদের দ্বারা প্রভাবিত এবং তাদেরই অনুগত। কোনো জাতি নিজস্ব জীবনবোধ ও জীবনাদর্শ দ্বারা আপন জাতি সত্তাকে গড়ে তুলতে চাইলেও চিন্তা-গবেষণার সূক্ষ্ম চর্চার মাধ্যমে যারা আল্লাহর বিভিন্ন সৃষ্টির বহুমুখী ব্যবহারকে আয়ত্তে এনেছে এবং সামরিক, অর্থনৈতিক শিল্প-কারিগরি ইত্যাদি দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে, তাদের কাছেই সকলের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, সৃষ্ট-বস্তুর উপর গবেষণা চালিয়ে বস্তু-রহস্য উদঘাটনে এবং বস্তুর বহুমুখী ব্যবহারকে কাজে লাগিয়ে মানুষের জীবনমান উন্নতকরণে পাশ্চাত্যের অমুসলিমরা যেখানে এ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারলো, সে স্থলে বিশাল মুসলিম উম্মা'র কোনো সদস্যের দ্বারা তা সম্ভব হলো না কেন? অথচ দেখা যায়, মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরআন নাযিলের পূর্বে মহাকাশ গবেষণার কাজ হয়নি; বরং আল কোরআনই মহাকাশ গবেষণার ধারণা দেয় এবং পথিকৃৎ হিসাবে কাজ করেছে। আর পাশ্চাত্য সমাজ স্পেনের কর্ডোভা গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানদের নিকটই বিজ্ঞানের প্রথম সবক নেয়। ইতিহাসের এক তথ্যে জানা যায়, আব্বাসীয় শাসনামলেই উড়োজাহাজ আবিষ্কারের চেষ্টা চলে এবং প্রথম উড়োজাহাজটি সামান্য কিছুক্ষণ আকাশে থাকার পর ভেঙ্গে পড়ে।

মুসলিম জাতি বৈষয়িক বহু উপায়-উপকরণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাদের পরমুখাপেক্ষী এবং অন্যান্য দিক থেকে দুর্বল থাকার যে কারণ আল্লামা ইকবালের দর্শন থেকে স্পষ্ট হয়ে

উঠে, ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে আরও কেউ যেমন এ রহস্যটি তেমন উদঘাটন করেননি তেমনি আধুনিক বিশ্বে মুসলিম জাতি বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক সম–উন্নতির ও তার জীবনের আল্লাহ–নির্দেশিত কাঙক্ষিত লক্ষ্যে পৌছার সফল পথ–নির্দেশনাও সমকালীন অনেক দার্শনিকের পক্ষে দেখানো সম্ভব হয়নি।

মহাকবি আল্লামা ইকবালের দৃষ্টিতে আল্লাহর গোটা সৃষ্টির মধ্যে মানুষ যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি ক্ষমতাও অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় অনেক বেশী। তার বিখ্যাত দর্শন হলোঃ মানুষের মধ্যে সীমাহীন সম্ভাবনা লুক্কায়িত রয়েছে, আর তার বিকাশ নির্ভরশীল হচ্ছে প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে করায়ত্ত করার ওপর। ইকবাল মনে করেন, বহুমুখী সম্ভাবনার অধিকারী মানব জাতিকে এ পৃথিবীতে আল্লাহর একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে এই প্রকৃতির স্বার্থে লড়াই করে তার ওপর আপন সুপ্ত প্রতিভার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমগ্র সৃষ্টির ওপর বিস্তার করতে হবে তার আধিপত্য। কারণ, মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'য়ালা খোদ ঘোষণা করেছেনঃ "পৃথিবীর সকল কিছু মূলত তোমাদের কল্যাণে তোমাদের অনুগত করে দেয়া হয়েছে।" যেহেতু মহাকবি ইকবালের দর্শনের ভিত্তি আল কোরআন ও সুন্নাহ, সেহেতু তিনি কোরআনের ভাবের প্রতিধ্বনি করে বলেছেনঃ

فطرت کو خرد کے روبرو کر+ تسخیر مقامے رنگ وبوکر
تری فطرت ایان ھے ممکنات زندگانی کی
جھان کے جوھر ومضمرکا + گویا امتحان تو ھے

"প্রকৃতিকে জ্ঞান–প্রজ্ঞা দ্বারা অনুগত করো। বর্ণ ও গন্ধময় এ ধরাকে করো বশীভূত। জীবনের অফুরন্ত সম্ভাবনা তোমার মধ্যে নিহিত, তুমি এ জগতের গুপ্ত সম্পদরাজির (বহুমুখী ব্যবহারের পরীক্ষক)।

অর্থাৎ প্রকৃতির সকল গুপ্ত রহস্য মানুষকে উদঘাটন করতে হবে। এই শক্তি তার মধ্যে প্রদত্ত হয়েছে। মানুষ এ পরীক্ষায় সফলকাম হলে মহান আল্লাহর এ জগত সৃষ্টির উদ্দেশ্য সার্থক হবে। কারণ, একজন মুমিনের এ গবেষণা তাকে তার স্রষ্টার দিকেই নিয়ে যাবে, যে জন্যে মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন।

ইকবালের এ দর্শনের মধ্যদিয়ে একদিকে যেমন মানুষের পক্ষে তার এই জাগতিক জীবনকে সুখী–সুন্দর করার বহুমুখী ধারার উন্মোচন ঘটতে পারে, তেমনি প্রকৃতির গবেষণার মধ্য দিয়ে সে প্রকৃতির স্রষ্টার সন্ধানেও অনেক দূর পথ এগিয়ে যেতে পারে।

এ উভয় প্রকার ভাবের ইঙ্গিতই পাওয়া যায় আল কোরআনে। যেমন– "আসমান যমীনের সৃষ্টি এবং দিবা রাত্রির পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্যে রয়েছে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্যে আল্লাহর অস্তিত্ব

ও ক্ষমতার নিদর্শন। (তা দেখে তারা আস্থার গভীরতা নিয়ে) উঠতে, বসতে ও শুইতে আল্লাহকে স্মরণ করবে। তারা ধ্যান–গবেষণা করবে আসমান–যমীনের সৃষ্টি রহস্য ও তাৎপর্য নিয়ে। এগুলোর রহস্য উদঘাটন করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বলে উঠে, হে আল্লাহ! এ প্রাকৃতিক জগত সৃষ্টিতে রয়েছে তোমার নিগূঢ় উদ্দেশ্য, তুমি এটি অনর্থক সৃষ্টি করোনি।" এ কারণেই ইকবালের দৃষ্টিতে আল্লাহর সৃষ্টি মানুষ তথা খাঁটি বান্দারা এখনো প্রকৃতির কাছে হার মানতে পারে না। কারণ প্রকৃতি মানুষের দাস, ইকবাল এরই মধ্য দিয়ে যেমন বিজ্ঞান গবেষণায় মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করেছেন, তেমনি তার সুফল লাভের দ্বারা নিজেকে উন্নত করে সৃষ্টির খূদী সম্পন্ন আল্লাহর অনুগত বান্দা হবার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

বস্তুতঃ ইকবালের এ দর্শন যথাযথভাবে মুসলিম উম্মাহ কার্যকর করলে এবং প্রকৃতি জগতের বস্তু–রহস্য উদঘাটনে সে ব্রতী হলেও জাতিকে আজ প্রাকৃতিক শক্তির ওপর প্রাধান্য লাভকারী শক্তিসমূহের কাছে কিছুতেই মুখাপেক্ষী হতে হতো না। কারণ, প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্ন বস্তুর বহুমুখী ব্যবহার আয়ত্তে আনতে না পারার কারণেই আজ মুসলমানদেরকে বিজাতির কাছে ধরনা দিতে হচ্ছে। আর সে সুযোগে তাকে হারাতে হচ্ছে নিজের আত্মিক শক্তি খূদী, আত্মমর্যাদা, আত্মপরিচয়, স্বকীয়তা, স্বাধীনতা সবকিছু। বস্তুত দার্শনিক কবি ইকবালের এ দর্শনের মধ্যদিয়ে এ সত্যও উদঘাটিত হয়ে পড়ে যে, আজকের বস্তুবাদী শক্তিগুলো প্রাকৃতিক জগতের সৃষ্টি বস্তুসমূহের গবেষণার মধ্য দিয়ে যে সফলতা অর্জন করেছে, এ সফলতা লাভের জন্যে মূলত কোরআন মজিদে সর্বপ্রথম মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। মুসলমানরা যদি প্রাকৃতিক বস্তু নিয়ে এরূপ গবেষণা করতো তাহলে তার সুফল হতো আরো সুদূরপ্রসারী এবং ক্ষেত্রবিশেষে এটি মানবতার জন্যেও হুমকি হয়ে দেখা দিতো না; যা অন্যদের গবেষণার ফলশ্রুতি হিসেবে আজ বিশ্ববাসীর অস্তিত্বের জন্যে চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। ইকবালের দৃষ্টিতে মুমিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রেই সীমিত নয়; বরং এ পার্থক্য জগত ও জীবন কেন্দ্রিক মৌলিক চিন্তাধারার, জীবন–পদ্ধতির ও কৃষ্টি–সংস্কৃতির। মুমিনকে বিশ্ব প্রকৃতির ওপর এ জন্যে বিজয় অর্জন করতে হবে, যেন সে খোদায়ী প্রতিনিধি হিসাবে আপন ইচ্ছা–বাসনা মাফিক এ পৃথিবীকে সাজিয়ে তুলতে পারে। মহাকবি ইকবাল মনে করেন, কাফির যেখানে বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলে এবং একেই সবকিছু ভেবে তার কাছে পরাজয়বরণ করে, সে ক্ষেত্রে মুমিন আপন খূদী বা ব্যক্তিত্বের সচেতনতা দিয়ে বিশ্বকে আপন আয়ত্তে নিয়ে আসবে। নিজ ইচ্ছা–আকাঙ্ক্ষার নকশা অনুযায়ী তাকে সাজাবে। এভাবে মুমিন যতই এই প্রাকৃতিক জগতকে চিন্তা–গবেষণার মধ্য দিয়ে আপন করার মধ্যে আনতে সক্ষম হবে ততই তার খূদী বলিষ্ঠতর হবে– একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে তার মাথা নত হবে না। মহাকবির ভাষায়ঃ কাফিরের নিদর্শন হলো সে নিজেকে এ প্রাকৃতিক জগতের মাঝে হারিয়ে ফেলে, আর মুমিনের চিহ্ন হলো এ প্রাকৃতিক জগতই তার মাঝে হারিয়ে যাবে।

বলা বাহুল্য, মহাকবি ইকবালের এ দর্শনই পারে আজকের হীনমন্যতাগ্রস্ত মুসলিম জাতিকে যেমন বৈষয়িক জগতের প্রাকৃতিক সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার–জ্ঞানে উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে, তেমনি তার জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে সফলতার বাণী শোনাতে।

আল্লামা ইকবালের পরামর্শ

এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ

ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পর সুচতুর ইংরেজ ও ফরাসী জাতি সাম্রাজ্য বিস্তারে আত্মনিয়োগ করে। ফলে, অন্যান্য জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের মতো মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ অভ্যন্তরীণ স্বার্থ, কোন্দল, প্রশাসনিক দুর্বলতা, বিশেষ করে দ্বীনি আদর্শ থেকে বিচ্যুতির কারণে ইংরেজ ও ফরাসীদের নিকট পরাজিত হতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের পতন আরো ত্বরান্বিত হতে থাকে। আফ্রো-এশিয়ার অনেক মুসলিম রাষ্ট্র ইঙ্গ-ফরাসীদের অধীনে চলে যায়। সাম্রাজ্যহারা গোটা মুসলিম জাহান এমনি অপ্রত্যাশিত পরাধীনতার কারণে ইসলামের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস, শৌর্য, বীর্য এমনকি মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসকেও ভুলতে থাকে। ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির বিপ্লবী চিন্তাধারা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মর্মকথা, পার্থিব উন্নতি ও প্রবৃত্তির ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। সমগ্র মুসলিম মিল্লাত পরাধীনতার জাঁতাকলে পড়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সত্তাকে হারাতে থাকে। সুতরাং স্বাধীনতা এবং স্বাধীন জাতীয় সত্তার মর্ম উপলব্ধি করার মতো চিন্তা শক্তির চরম অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। ভারত উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর অবস্থাও এর ব্যতিক্রম ছিল না।

দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল চমৎকারভাবে মুসলিম দুনিয়ার এ করুণ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেন। মুসলিম জাহানকে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুপরামর্শও দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইকবাল তাঁর বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ আরমুগানে হেজায-এর বিভিন্ন কাব্যে মুসলিম দুনিয়ার নেতৃত্বের যোগ্যতম বিজ্ঞ আলেম, মনীষী ও সূফী সাধকদের ভ্রান্ত নীতি ও পদক্ষেপ, ভুল মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির এক নকশা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। ইকবালের ভাষায় দীর্ঘদিন যাবৎ পরাধীন থাকার কারণে মুসলিম সমাজের অধিকাংশ বিজ্ঞ মনীষীর মধ্যেই ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হয়ে ছিল। এ সব মুসলিম মনীষী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদত যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত সম্পর্কে বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েল শিক্ষাদান, প্রয়োজন বোধে কুফরীর ফতোয়া দান, তালাকের সমস্যার সমাধান, ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কুরআন-হাদীস, উসুলি ফিক্‌হর কিছু অংশ শিক্ষা দেয়াই মুসলমানদের দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের জন্য যথেষ্ট। এ আমলগুলোর গুরুত্ব কোন অংশেই কম করে দেখার উপায় নেই। এর বাইরে মুসলিম মিল্লাতের জাতীয় সত্তা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, কৃষ্টি, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, পার্থিব উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির বিষয় আলোচনা-পর্যালোচনা ও শিক্ষাদান সম্পূর্ণ পার্থিব বা দুনিয়াবী কাজ, খোদাদ্রোহী কাজ। দ্বীনি কর্মকাণ্ডের সাথে এর ন্যূনতম সম্পর্কও

নেই। সুতরাং এগুলোর চেষ্টা–প্রচেষ্টার কোন প্রয়োজন নেই। মুমিন মুসলমানদেরকে পরকালমুখী হতে হবে। আর এ জন্য ঐ সব বস্তুবাদী চিন্তাধারা পরিত্যাগ করতে হবে।

আল্লামা ইকবাল মুসলিম জাতির সামনে তুলে ধরা ইসলামের এ সব ভ্রান্ত ধারণা প্রত্যাখ্যান করে তাঁদেরকে ইসলামের মৌলিক ও সঠিক পথ–নির্দেশ পূর্বক পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, হে মুসলিম দুনিয়া! তোমাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে ঐ সব ভ্রান্ত ও অবাঞ্ছিত ধারণা পরিত্যাগ করতে হবে। আর তোমাদের মধ্যে ইসলামের বিপ্লবী ও জিহাদী চেতনা সৃষ্টি করতে হবে। খানকাহ বা নির্জনবাস থেকে বের হয়ে বাতিল শক্তি ও ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কেননা ইসলামী সমাজ দর্শন ও জাতি সত্তাকে বাদ দিয়ে খানকাহ বা নির্জনবাসের মাধ্যমে শুধুমাত্র কয়েকটা আনুষ্ঠানিক ইবাদতের শিক্ষা দান উত্তম জাতি হিসেবে তোমাদের কোন মঙ্গল বয়ে আনবে না বরং নৈরাশ্য, দুঃখ–বেদনা, অশান্তি–বিশৃংখলাসহ চরম অধঃপতন এবং সর্বোপরি পরাধীনতাই তোমাদের চির সঙ্গী হয়েই থাকবে।

হে মুসলিম মিল্লাত! ইসলামী জীবন দর্শন সম্পর্কে তোমাদের মন মেজাজে যে সব ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে, তা তোমাদেরকে বিজিত এবং পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ করে রাখবে। বস্তুবাদী চিন্তাধারাকে ত্যাগ করে মুমিন–মুসলমানদেরকে অবশ্যই পরকালমুখী হতে হবে। তাই বলে বস্তুকে এবং বস্তুর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। বস্তুকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসো, তাকে দাসে পরিণত করো। তোমরা বস্তুর অধীনে বা দাসে পরিগণিত হবে না। বস্তুতপক্ষে দুনিয়াই পরকালের ক্ষেত্র এবং আল্লাহ দুনিয়ার সব কিছু মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। অথচ তোমরা বস্তুকে ত্যাগ করাই ইসলামের শিক্ষা বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করছো। অন্য কথায়, তোমরা বৈরাগ্যবাদ বা রোহবানিয়াত–এর শিক্ষাকে ব্যাপক ভাবে প্রচার ও প্রকাশ করে চলেছো। আমি (ইকবাল) উন্নত জাতি হিসেবে তোমাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করে দিতে চাই যে, যখন কোন জাতির জাতীয় সত্তা, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হয় তখনই তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে দুনিয়া পরিত্যাগের ভাবনা–চিন্তা শুরু হয়। হে মুসলিম দুনিয়া! বর্তমান সময় তোমাদের জন্য খুবই নাজুক। সাম্রাজ্যবাদী অনৈসলামিক শক্তিসমূহ তোমাদেরকে চিরপরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ করার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা–প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ষড়যন্ত্র করেই চলেছে। ঐ অশুভ শক্তিসমূহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন সব ষড়যন্ত্র এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করছে যা বাহ্যিকভাবে খুবই মুখরোচক এবং যা তোমাদের নিকট বন্ধুত্বের উপহার বলেই মনে হয়, বস্তুত পক্ষে ঐ সব মুখরোচক পদক্ষেপসমূহ তোমাদেরকে পরাধীন রাখারই স্পষ্ট হাতিয়ার। এরাই তোমাদের চরম শত্রু। এরা বন্ধুর বেশে তোমাদের সাথে আচরণ করেই যাচ্ছে এবং বিভিন্ন সময়ে তোমাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এমন কি তোমাদের জন্য প্রয়োজনে সামরিক সাহায্যও করে থাকে। আসলে এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ওরা তোমাদেরকে ষড়যন্ত্রের জালে

আবদ্ধ করছে, ধোঁকায় ফেলছে। আর ঐ ধোঁকা ও ষড়যন্ত্রে তোমরা নির্বোধের মতো জড়িয়ে পড়ছো দিনের পর দিন। হে মুসলিম জাহান! এ ভাবে তোমরা মুসলিম জাতি হিসেবে তোমাদের স্বীয় ঐতিহ্য ও শৌর্যবীর্যকে হারিয়ে বসেছো। হে মুসলিম জাতি! চোখ খোল; চোখ বন্ধ করে রেখ না, নিজকে আল্লাহর দেয়া জীবন দর্শন অনুসারে গড়ে তোলার চেষ্টা কর এবং সে অকৃত্রিম নিদর্শনকে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে এসো।

হে আল্লাহ! আমার এ আহবান মুসলিম মিল্লাত বুঝবার চেষ্টা করছে না। হে আল্লাহ! আমার ভুল-ভ্রান্তি দূর কর এবং মুসলিম জাতিকে আমার এ পয়গাম বুঝবার এবং সে অনুসারে সমাজের অভ্যন্তরে তোমার দ্বীন-ঈমানের মহব্বত ও ভালবাসা পয়দা কর। শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভের শক্তি-সামর্থ্য দান কর। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে এবং দ্বীনের হিফাজতের জন্য পর্যাপ্ত জাগতিক শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োজন। ভারত উপমহাদেশসহ সমগ্র বিশ্বের মুসলিম জনগোষ্ঠী যখন বিপর্যয়ের অতল অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে, তা থেকে উদ্ধারের জন্য হে খোদা! তোমার সর্বাত্মক সাহায্য অবশ্যম্ভাবী। আর মুসলমানদেরকে এ সত্য উপলব্ধি করার তৌফিক দাও যে, ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া সুমলমান হিসেবে বাঁচার কোন অধিকার তাদের না থাকে।

ইকবালের দৃষ্টিতে, মুসলমানদের অধঃপতনের মৌলিক কারণ দু'টি- ১. আল্লাহর সাথে সম্পর্কের অবনতি, ২. ইসলামী জীবন দর্শনের ভুল ব্যাখ্যা। হে মুসলিম জাতি! রূহ কোন বস্তুগত বিষয় নয়। রক্ত-মাংসের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। (১) স্থান-কাল -পাত্র হিসেবে রুহকে কল্পনা করা যায় না। এটা অকৃত্রিম আলো বা নূর। (২) রূহের সক্রিয় ভূমিকার দ্বারা মানব মনে খূদী সৃষ্টি হয়। অতএব যার রূহ যত সক্রিয় আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক তত গভীর। আল্লাহর সাথে যার সম্পর্ক যত গভীর তার খূদীও তত মজবুত। পৃথিবীতে যত আদর্শিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তা এ খূদীর প্রভাবের কারণেই হয়েছে। (৩) খূদী দর্শনের আলোকে মানুষ দুনিয়া জয় করেছে। সুতরাং খূদী হচ্ছে মুমিন-মুসলিমের প্রকৃত বন্ধু। হে মুসলিম জাতি! তোমাদের মধ্যে খূদী জাগ্রত কর। কারণ যার খূদী জাগ্রত থাকে, তার মধ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে ইশকে রাসূল ও ইশকে খোদার আলো উজ্জ্বল থাকে। ফলে, সে রাজনৈতিক ও আদর্শিক পরাধীনতার চাপ সহ্য করতে পারে না।

হে মুসলিম মিল্লাত। তোমাদের মধ্যে যাদের খূদী নেই, যার রূহ সক্রিয় নেই অর্থাৎ যাদের মধ্যে ইশকে রাসূল ও ইশকে খোদা নেই তাদের দ্বারা ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দান অসম্ভব কিছু নয়। ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন-এ সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের অভাব থাকাই স্বাভাবিক। কুরআন-হাদীসের বাহ্যিক শিক্ষাদান এবং আনুষ্ঠানিক কিছু কিছু ইবাদাত-বন্দেগী করলেও ইসলাম সম্পর্কে তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দূর হয় না। ইসলামের মৌলিক দাবী তাদের দ্বারা পূর্ণ হয় না। ইকবাল বলেন;

মৌলভী মাওলানাদের কিতাবী ইলম কোন কাজে আসেনি। এ ভাবে ইকবাল ঐ উলামা ও মাশায়েখদের (ইসলাম সম্পর্কে) ভুল ধারণা দূর করার চেষ্টা করেছেন, যারা কুরআন–হাদীসের বাহ্যিক শিক্ষা দান করাকেই পূর্ণাংগ ইসলাম বলে প্রচার ও প্রকাশ করে চলেছেন। এদের রূহ সক্রিয় নয়, খূদী মজবুত নয়। দ্বীন ও ইসলামের বিজয়ের ধারণা এদের নিকট স্পষ্ট নয়। ফলে, দুনিয়া ও আখেরাতের পার্থক্য বুঝা এদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ভাবে মরক্কো থেকে জাকার্তা পর্যন্ত গোটা মুসলিম দুনিয়ার সকলেই যেন খূদী দর্শন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে, মুসলিম মিল্লাত মৌলিকভাবে চিন্তাই করতে পারছে না যে, মহান আল্লাহ কি মর্যাদা দিয়ে এবং কি উদ্দেশ্যে তাদেরকে পাঠিয়েছেন এ দুনিয়ায়। প্রকৃত পক্ষে নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন উত্তম জাতি হিসেবে ইসলামী জীবন দর্শনকে সমাজে প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে তাদের মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ মহান দায়িত্বের অনুভূতির অভাবের কারণে মুসলিম দুনিয়া শুধু রাজনৈতিক নেতৃত্বের যোগ্যতাই হারায়নি; বরং মসজিদের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণের পরিবর্তে মদের আড্ডাখানার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর বন্দেগীর পরিবর্তে মুসলিম জনসাধারণ খোদাদ্রোহী শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করেই চলেছে। অথচ ঈমানী শক্তি মজবুত হলে রূহের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং খূদীর শক্তি কার্যকর হয়। ফলে অন্যান্য জাতি ও শক্তির উপর নেতৃত্ব–কর্তৃত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ অনুভূতির দারুণ অভাব। এ কারণেই গোটা মুসলিম জাহান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শক্তি এবং সমাজ ব্যবস্থার অধীন হয়ে আছে। ফলে মুসলমানদের জাতীয় সত্তা বিলুপ্তির পথে।

এ হেন অবস্থায় ইকবাল মহান আল্লাহর দরবারে এই বলে ফরিয়াদ করেছেন– হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান দান কর। এ বিপর্যয় থেকে তুমি আমাদেরকে রক্ষা কর। হে আল্লাহ! তুমি নিশ্চয় জান যে, অনৈসলামিক সমাজ ব্যবস্থায় মুসলমানগণ তোমাকে যে সিজদা করে তা প্রকৃত সিজদা হয় না। কারণ, এ সিজদায় কোন তৃপ্তি নেই, আনন্দ নেই, তোমাকে পাওয়ার কোন দর্শন নেই, খোদাদ্রোহী শক্তি বাহ্যিকভাবে এ সিজদা করার অনুমতি দিচ্ছে বলেই মুসলমানগণ সিজদা করছে। ঐ খোদাদ্রোহী শক্তির অনুমতি না হলে মুসলমানগণ এ সিজদা করতে পারতো না। ইকবাল বলেন–

ملا کو جو ہے ھند میں سجدے کی اجازت
نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد ۔

অর্থাৎ ভারতে মোল্লা (মুসলমান)–কে সিজদার যে অনুমতি দিয়েছে তাকেই মুসলমানগণ ইসলামের সজীবতা মনে করছে।

হে আল্লাহ! এ অনৈসলামিক শক্তি ভাল করেই জানে যে, সমাজ দর্শন থেকে মুক্ত থেকে মুসলমানগণ মসজিদে গিয়ে যে সিজদা করছে তাতে ওদের কোন বিপদ নেই। অর্থাৎ এ

সিজদার মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী দর্শন বাস্তবায়নের কোন মনোভাব বা বিপ্লবী চেতনা সৃষ্টি হয় না, বস্তুত পক্ষে ইসলামী দর্শনের মৌলিক বিষয় 'জিহাদ'কে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মসজিদে সিজদা করলেই মুসলমানদের মধ্যে বিপ্লবী ও জিহাদী মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে না। তাই তো ঐ অনৈসলামিক শক্তি সিজদার অনুমতি দিয়ে রেখেছে। ইকবাল বলেন, হে খোদা! তুমি আমাদেরকে রাজনৈতিক ও আদর্শিক পরাধীনতা থেকে মুক্ত কর। মুসলিম মিল্লাতকে ঐক্যবদ্ধ হবার তৌফিক দাও। ইসলামী জীবন দর্শনকে সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানদেরকে তাওফিক দান কর।

ইকবাল মুসলিম মিল্লাতকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে মুসলিম মিল্লাহ! তোমরাই উত্তম জাতি। ইসলামী জীবন দর্শনকে সমাজে বাস্তবায়নের জন্যই তোমাদের পাঠানো হয়েছে। কারণ একমাত্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আলোকে পার্থিব উন্নতি ও প্রবৃত্তির মাধ্যমে দুনিয়ার শান্তি ও পরকালের মুক্তি লাভ সম্ভব। আর এ জন্য হে মুসলিম মিল্লাহ! তোমাদের স্থবিরতা ও নিরবতা পরিত্যাগ করতে হবে। সম্মিলিতভাবে নিজেদের মধ্যে ইসলামের বিপ্লবী ধারণা সৃষ্টি করতে হবে এবং সঠিক ও নির্ভুল বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। তবেই আল্লাহর সাহায্য অনিবার্য, অন্যথায় হে মুসলিম জাহান! রাজনৈতিক ও আদর্শিক পরাধীনতাই তোমাদের চিরসাথী হয়ে থাকবে।

পরিশেষে, ''বসন্ত আসলে ফুল না ফুটে যেমন থাকতে পারে না, পাখী গান না গেয়ে থাকতে পারে না'', তেমনি ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্য এক দল মর্দে মুজাহিদ যদি তৈরী হয়, জান–মাল কুরবানী করতে রাজী থাকে, তবেই আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং ইসলামী জীবন দর্শন বাস্তবায়িত হবে। কুরআনের ভাষায় ''যারা বলে আল্লাহই আমাদের রব এবং এর উপর দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে টিকে থাকে, তাদের উপর (আল্লাহর) রহমত নিয়ে ফেরেশতা নাযিল হয়ে থাকে।''

আল্লামা ইকবালের কথা যেভাবে মনে পড়ে

শেখ দরবার আলম

আল্লামা ইকবালের কথা আমি খুব স্পষ্টভাবে শুনি আমার আরবী শিক্ষক কাজী মোহাম্মদ মোস্তফার কাছে। আমি তখন চব্বিশ পরগনা জেলার বশিরহাট মহ্‌কুমায় হাড়োয়া পীর গোরাচাঁদ হাই স্কুলে পড়ি।

আমার অতি প্রিয় শিক্ষক কাজী মোহাম্মদ মোস্তফা ছিলেন অত্যন্ত সৎ এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন বুদ্ধিজীবী। অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ লিখেছেন। বাইরের কোনো কোনো দেশের পত্র-পত্রিকায়ও তিনি নিবন্ধাদি লিখতেন। বিশেষত মিসরের পত্র-পত্রিকায়।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কবি শাহাদাৎ হোসেন এবং কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা আমি আমার আব্বার কাছে শুনেছিলাম। শৈশবে এবং বাল্যকালে।

আব্বার কাছে সবচেয়ে বেশি শুনেছিলাম কবি কাজী নজরুল ইসলামের কথা।

কৈশোরে হাড়োয়া পীর গোরাচাঁদ হাই স্কুলে আমার শিক্ষক এবং প্রিয় জ্ঞানী লেখক কাজী মোহাম্মদ মোস্তফা সাহেবের কাছে বিশেষকভাবে শুনেছিলাম যে দু'জন কবির কথা; তাঁরা হলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং কবি আল্লামা ইকবাল।

ইকবালকে উপলব্ধি করার জ্ঞান গম্যি তখন আমার হয়নি। তবু তাঁর কাছে শুনে শুনে আল্লামা ইকবালের অন্তত দু'টি গ্রন্থের নাম মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো।

সবচেয়ে বড় কথা, তিনি যে একজন খুব বড় কবি এবং শ্রদ্ধেয় মানুষ, আমাদের কবি, আমাদের মানুষ-এই ধারণাটা আমার মনে তখনই দৃঢ়মূল হয়েছিলো।

সেই তখন থেকেই আমি নজরুলকে জানবার, বুঝবার চেষ্টা করি। নজরুল পড়তে গিয়েও দেখলাম আল্লামা ইকবালের প্রতি তিনি খুবই শ্রদ্ধাবনত।

আল্লামা ইকবালের খূদী-দর্শন নজরুল সাহিত্য ও সঙ্গীতে যে কী বিশাল, বিপুলভাবে আছে সে তো এক পৃথক গবেষণার বিষয়।

আসলে, আল্লামা শেখ মুহাম্মদ ইকবাল এবং কাজী নজরুল ইসলাম-এই উভয়েরই চিন্তাধারার মূল উৎস হচ্ছে ইসলাম। ইকবালের যে 'মর্দে মুমিন' আল্লাহর খিলাফত স্বীকার করে আল্লাহরই প্রতিনিধি হিসাবে বিশ্ব বিজয়ের স্বপ্ন দেখেন এবং সক্রিয় হন তার উপস্থিতি তো নজরুল সাহিত্যেও প্রবলভাবে বিদ্যমান। ফলে ইকবালের মতো নজরুলও বিশ্বাস করতেন

যে, মানুষ তার তাকদীরের স্রষ্টা। তৌহিদের ভিত্তিতে যে তত্ত্বে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে তফাৎ রক্ষা করে ইকবাল অগ্রসর হয়েছেন সেই 'ওয়াহদাতুশ শুহূদ'-এর প্রতিফলন নজরুল সাহিত্য ও সঙ্গীতেও ঘটেছে।

আল্লামা ইকবালের মতো নজরুল চিন্তাধারারও অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ইজতিহাদে বিশ্বাস। মুসলমানরা এক সময় এই চিন্তাধারা মোতাবেক কঠিন অধ্যবসায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানান শাখায় অবদান রেখেছিলেন। আল্লামা ইকবালের মতো নজরুল ইসলামও ইসলামকে একটা অনুষ্ঠান-সর্বস্ব ধর্ম হিসাবে আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখতে চাননি। আল্লামা ইকবালের মতো কবি কাজী নজরুল ইসলামও গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, পাশ্চাত্য যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানান ক্ষেত্রে এত উন্নতি করেছে এর মূল যে শক্তি, যে ইঙ্গিতগুলো কাজ করছে সেগুলো তারা ইসলাম থেকে, ইসলামের মধ্যযুগ থেকেই পেয়েছে।

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ইতিহাস এবং রাজনৈতিক অর্থনীতিকে ইকবাল যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে এবং দেখাতে চেয়েছেন, সেটার সঙ্গে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গির একটা স্পষ্ট সাযুজ্য আছে। উভয়ের সাহিত্য থেকে এসব গভীরভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার পান্ডিত্য যাঁদের আছে তাঁরা তা করবেন। আমি ইকবাল সম্পর্কিত আমার টুকরো টুকরো স্মৃতিকথায় ও অনুভূতির কথায় ফিরে যাচ্ছি।

১৯৬৮, ১৯৬৯, ১৯৭০-এর দিকে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল-এ ছিলাম। তিন তলায় ৩২৮ নম্বর রুমে। ছাত্র নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, তোফায়েল আহমদ, আ স ম আবদুর রব এই হল-এ থাকতেন। ছাত্র নেতা শাহজাহান সিরাজকেও এই হল-এ অনেক সময় থাকতে দেখেছি। তোফায়েল ভাই থাকতেন তিন তলায় ৩১৪ নম্বর রুমে। কয়েক দিন তিনি গোসল করে আমার রুমে এসে ডেফোডিলের শিশি থেকে নারকেল তেল মেখে গেছেন। তখন তো তিনি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির অঙ্গনে হিরো। ঢাকার জনসভায় দেখেছি জনতা তাঁর কথায় ওঠেন, বসেন, হাত তোলেন ইত্যাদি। শেখ মুজিবুর রহমান তখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জেল হাজতে। সেই উনসত্তরে শেখ মুজিবুর রহমান জেল হাজত থেকে বা'র হয়ে এলে রমনা রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় তাঁকে বঙ্গবন্ধু খেতাব দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন এই তোফায়েল আহমদ। তাঁর অনুরোধে ইকবাল হল ক্যান্টিনে তাঁদের ছাত্র শাখার দু' একটা সভায়ও শ্রোতা হিসাবে গিয়েছি।

ছাত্র নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী আমাকে 'মিতে' বলতেন। তিনি আমার কাছে পরীক্ষার নোট নিতেও আসতেন। তাঁর সঙ্গেই আমার তুলনামূলকভাবে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল; তবে কোনো রাজনীতি আমি তখনও করতাম না, যেমন এখনও করি না। কথাগুলো এই জন্যই উল্লেখ করলাম যে, কারো রাজনীতির প্রতিই আমি কখনো অ্যালার্জিক ছিলাম না এবং এখনও নই।

তবু ইকবাল হল–এর নাম পাল্টানোর যৌক্তিকতা আমি আজো খুঁজে পাইনি। এই ঘটনার কথা মনে পড়লে আমি আজো দুঃখ পাই। বিষণ্ন বোধ করি।

এটা যে আমাদের একটা সাংস্কৃতিক অধঃপতনকেই চিহ্নিত করছে সেটা উপলব্ধি করলাম, যখন দেখলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৬–এর দিকে ইকবালের জন্ম শতবর্ষ পালন করলো। আল্লামা ইকবালের তখন যে বিশাল ছবিটি বাঁধানো হয়েছিলো সেটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শিক্ষকদের কমন রুমে কয়েক বছর সংরক্ষিত আছে দেখলাম। ভাবি, বাংলাভাষী হিন্দুদের যদি ইকবালের প্রতি অ্যালার্জিক হওয়ার কোনো কারণ না থাকে তবে বাঙলাভাষী মুসলমানদের সে রকমটা হওয়ার কী এমন কারণ থাকতে পারে? আসলে আমরা অনেক কিছুই দূরদৃষ্টি দিয়ে খতিয়ে দেখতে রাজি নই। বড্ড বেশি বেশি হুজুগে আন্দোলিত হই আমরা।

২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ , এই ঠিকানাস্থিত পুস্তক বিপণী থেকে ১৯৯১–এর জুনে প্রকাশিত 'ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা' গ্রন্থের 'সবিনয় নিবেদন' অংশে পৃষ্ঠা '(গ)'–এ গৌতম নিয়োগী লিখেছেনঃ

'দেশ বিভাগ বা তৎকালীন দাঙ্গার বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই, কারণ আমি তা দেখিনি। তবে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসার প্রত্যক্ষ ফল ভোগ ক'রছি আজও। ১৯৬৪–এর দাঙ্গা, ১৯৭১–এর যুদ্ধ-----।'

গৌতম নিয়োগী এককালের পূর্ববঙ্গের মানুষ। এখন হুগলীর উত্তর পাড়ার প্যারী মোহন কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এবং পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের সদস্য।

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মধ্য যুগের ভারত' বিষয়ে 'উচ্চতম পঠন–পাঠন কেন্দ্র'–এর অধিকর্তা এবং নতুন দিল্লীর ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পরিষদের অধ্যক্ষ ডঃ ইরফান হাবিবের আমন্ত্রণক্রমে গৌতম নিয়োগী আলীগড়ে গিয়ে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস 'আল্লামা ইকবাল হল'–এ উঠেছিলেন ১৯৮৬–এর ১৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায়। গৌতম নিয়োগী 'ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা' শিরোনামে তাঁর উক্ত গ্রন্থের ৮৪ এবং ৮৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, ডঃ ইরফান হাবিবের আমন্ত্রণক্রমে তিনি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন ইতিহাস বিভাগে মধ্যযুগের ভারত বিষয়ে পক্ষকালব্যাপী কর্মশালায় যোগ দিয়ে দিল্লীর সুলতানি আমল ও মুঘল আমল সম্পর্কে পুরোনো বিদ্যা ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য। সঙ্গে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের একটা চিঠিও নিয়ে গিয়েছিলেন ডক্টর ইরফান হাবিবের একটা সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য। সে যা–ই হোক, তিনি লিখেছেন যে, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্রাবাস 'আল্লামা ইকবাল হল'–এ একই রুমে তিনি এবং স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপক

শিবাজী কয়াল বেশ যত্ন-আত্যি এবং আদরের সঙ্গে ছিলেন। কথাটা উল্লেখ করলাম এ জন্যই যে, কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মতো আল্লামা ইকবালও ভারতে অচ্ছুৎ হয়ে যাননি।

অবিভক্ত ভারতে এই আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আল্লামা ইকবালকে সম্মানসূচক ডি· লিট· উপাধি দিয়েছিল। এই ডিগ্রী তিনি অবশ্য দেশ-বিদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই পেয়েছিলেন। ১৯০৭ সালে তিনি জার্মানীর মিউনিক য়ুনিভার্সিটি থেকে পি. এইচ ডি ডিগ্রী পান। ১৯৩৩-এ লাহোর পাঞ্জাব য়ুনিভার্সিটি তাঁকে দিলো 'ডক্টর অব লিটারেচার' উপাধি। ১৯৩৭-এ উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ য়ুনিভার্সিটিও তাঁকে ডি.লিট. ডিগ্রী দিয়েছে। ইতোমধ্যে ১৯৩৫ সালে অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রফেসর পদে নিয়োগপত্র দিলেও তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে যাননি।

ভারতের জাতীয় প্রচার মাধ্যমে যে আল্লামা ইকবাল কতখানি সমাদৃত তার একটা উদাহরণ ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, এই ঠিকানাস্থিত আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রকাশিত মোবাশ্বের জাভেদ আকবরের 'ভারত/ অন্দরের অবরোধ' শীর্ষক গ্রন্থের ১৬০ পৃষ্ঠায় আছে ঃ পাঞ্জাবের আকাবিলদের অধিকাংশ দাবি সরকার মেনে নিয়েছেন, এই ঘোষণার জন্য ১৯৮৪-এর ২ জুন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের টেলিভিশন 'দূরদর্শন'-এ যেদিন ভাষণ দেন সেদিন তার ভাষণের অব্যবহিত আগে আল্লামা ইকবালের গান 'সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা' জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে বাজানো হয়েছিল। এম· জে আকবর লিখেছেনঃ

'২ জুন শনিবার সন্ধ্যায় পাঞ্জাব সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য মিসেস গান্ধী জাতীয় দূরদর্শনে এলেন। তাঁর ভাষণের পূর্বে সঙ্গীতানুষ্ঠান হল। একটি গানের রচয়িতা স্যার মহম্মদ ইকবাল। রচিত এই শতকের দ্বিতীয় দশকে। ধর্মনিরপেক্ষ অখন্ড ভারতের প্রতি তখনই তাঁর আস্থা ছিল। 'সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা' (বিশ্বের সুন্দরতম দেশ আমাদের হিন্দুস্তান)।'

এই দৃষ্টান্তগুলোর উল্লেখ আমি এই জন্য করলাম যে, মুষ্টিমেয় লোকের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের সহায়ক হওয়ার রাজনীতি আল্লামা ইকবাল করেননি। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনেরও ভিত্তিভূমিতে আছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা, ইসলামী মূল্যবোধ। ফলে সেটাকে সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে ফেলে দেখতে যাওয়াটা সঠিক উপলব্ধির, সঠিক মূল্যায়নের কাজ হবে না। ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা একটা পাকিস্তান কামনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। যে পাকিস্তান আমরা দেখেছি, সেই পাকিস্তানের মধ্যে তো নয়ই। প্রখর আর্থ-সাংস্কৃতিক সচেতনতা তাঁর ছিল বলেই, তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতাও ছিলো অত্যন্ত তীক্ষ্ম, শাণিত এবং সূক্ষ্ম। তাঁর সময়ে উপমহাদেশে তিনি মুসলিম লীগের সার্থক তাত্ত্বিক নেতা হতে পারতেন। এটা হওয়ার ব্যাপারে

তাঁর অনিচ্ছা ছিল না। কিন্তু তাঁর সেই আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারা পুরোপুরি ধারণ করে এগিয়ে যাওয়ার মতো সামর্থ্যের পরিচয় মুসলিম লীগ দিতে পারেনি। উপমহাদেশীয় মুসলমানদের একটা রাজনৈতিক সংগঠন যে রকম হওয়া উচিত বলে আল্লামা ইকবাল পরিকল্পনা করেছিলেন, মুসলিম লীগ সেভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। এমন কি, মুসলিম লীগ সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলীও যে রকমটা পরিকল্পনা করেছিলেন, সেভাবেও তো মুসলিম লীগ কার্যত গড়ে উঠতে পারেনি। এর কারণ, এই সংগঠনটিকে একাধারে সংগ্রাম করতে হয়েছে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসক সম্প্রদায় এবং তাদের এদেশীয় সহযোগী হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। কিন্তু এ বিষয়ে পুরোপুরি সাফল্য লাভ করতে হলে (এক) যে আর্থিক সামর্থ্য দরকার, (দুই) যে শক্তিশালী প্রেস বা প্রচার মাধ্যম দরকার, (তিন) যে ত্যাগী, বিচক্ষণ এবং সুসংহত নেতৃবৃন্দ দরকার, মুসলিম লীগের তা ছিল না। উপমহাদেশ বিভক্তির মুহূর্তেও দেখা গেলো এই সব ক্ষেত্রেও কংগ্রেসের চেয়ে মুসলিম লীগ অনেক পিছিয়ে ছিল। ফলে পাকিস্তানের নামে ইংরেজ, কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভা যা দিতে চাইল সেটুকু নিতেই কায়েদ-ই-আযমকে বাধ্য হতে হলো। যেভাবে তিনি এটা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন সেটাই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম, এবং শেষ অনিয়ম। কিন্তু এখানে বিবেচ্য বিষয় হলো এই যে, তিনি তখন এটা গ্রহণ করতে না চাইলে পাকিস্তান বলে যা পাওয়া গিয়েছিল তা আর পাওয়া যেতো না। আর সেই পাকিস্তান না হলে ভাষা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র, একাত্তর ইত্যাদি কিছুই ঘটতো না। আর পাকিস্তান না হলে, বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসক সম্প্রদায় কংগ্রেস তথা হিন্দু সম্প্রদায়ের হাতে শাসন ক্ষমতা দিয়ে গেলে আমাদের কোন্ সম্ভাবনা থাকতো- সেটাও একবার খতিয়ে দেখা যেতে পারে। আল্লামা ইকবালের নাম, কায়েদ-ই-আযমের নাম মুছে ফেলতে হলে এ সব কিছুই বিবেচনা করে দেখতে হবে।

তদুপরি আল্লামা ইকবালের ইন্তেকালের অন্তত ন' বছর পর উপমহাদেশ বিভক্তির ঘটনাটা ঘটেছে। বিভক্তিটা যেভাবে ঘটেছে তার দায়-দায়িত্বটা তো কোনক্রমেই তাঁর ওপর বর্তায় না। তবে এ ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাধারাটা আমরা বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি, যেটা আমি অন্তত আমাদের নিজেদের ব্যাপারে শিক্ষণীয় বলে মনে করি।

ইকবালের রাজনৈতিক দর্শনের দিকে দৃষ্টি দিলে উপলব্ধি করা যাবে যে, সাতচল্লিশোত্তর কালে, বিশেষত কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং কায়েদ-ই-মিল্লাত লিয়াকত আলী খানের ইন্তেকালের পর অনেকেই, বিশেষত সামাজিক নেতারা পাকিস্তানকে দু'খন্ড জমি বলে মনে করেছিলেন। ইকবাল পরিকল্পিত পাকিস্তান কিন্তু সে রকমটা ছিল না।

তবু পাকিস্তান নামক যে দু'টি ভূমি খন্ড পাওয়া গিয়েছিল, সেই ভূমি খন্ড দু'টিকে নিয়ে অনেক সার্থক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যেতো, তার সমস্ত সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা যেতো। আল্লামা ইকবাল যে আদর্শ নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই পথে।

ইকবালের নজর ছিল বিশেষত তৃণমূল স্তরের জনসাধারণের দিকে। জনসাধারণের সার্বিক উন্নতিই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এ নিয়ে তাঁর উদ্বেগের অন্ত ছিল না। অসুস্থ হয়ে পড়ার কিছু দিন আগ পর্যন্ত তিনি এ বিষয়ে কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে বার বার চিঠি লিখে কেবল তাঁর এই উদ্বেগের কথা নয়, সমস্যা সমাধানের পন্থা-পদ্ধতির কথাও লিখেছেন। কায়েদ-ই-আযমকে তাঁর কর্মব্যস্ততার মধ্যে বিরক্ত করছেন কি-না সে বিষয়ে সঙ্কোচ প্রকাশ করেও বার বার লিখেছেন। এই জায়গাটায় বিশেষ করে এই মহৎ মানুষটার হৃদয়টা চেনা যায়। কী বিশাল দরদী মানুষ! এই জায়গাটায় নজরুলের সঙ্গেও তাঁর মিল আছে। নজরুলও তাঁর শেষ জীবনে সাধারণ মানুষের, মজলুম মানুষের অবস্থার কথা চিন্তা করে খুব উদ্বিগ্ন বোধ করতেন। উভয়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে একটা সাযুজ্য ছিল। কেননা, উভয়েরই চিন্তাধারার মূল উৎস তো একটাই ঃ ইসলাম। তবে প্রসঙ্গত এটাও মনে রাখতে হবে যে, আল্লামা ইকবাল ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের অগ্রজ।

রাজনীতিতে কত গভীরভাবে মনঃসংযোগ করেছিলেন আল্লামা শেখ মুহাম্মদ ইকবাল! ২৫ জুন ১৯৩৬ তারিখ বৃহস্পতিবার কায়েদ-ই-আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে এক চিঠিতে মুহাম্মদ ইকবাল লিখছেনঃ 'স্যার সিকান্দর হায়াৎ খাঁ দু'এক দিন আগে লাহোর ত্যাগ করেছেন এবং বোম্বাইয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। দৌলতানা গতকাল আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। ইউনিয়নিষ্ট পার্টি ঘোষণা দেবেঃ কোনো নন-মুসলিম গ্রুপের সঙ্গে প্রাদেশিক পরিষদে প্যাক্ট করবে না।'

কী গভীর, অপরিসীম উদ্বেগ তাঁর এই পিছিয়ে পড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য! কত খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁর মনোযোগ!

এর পর ১৭ আগস্ট ১৯৩৬ তারিখ সোমবার কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করলেন কৃষক প্রজা সমিতি পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডে যোগদান করবে।

এটা সেই সময় যখন আল্লামা ইকবালের 'শেকওয়া ওয়া জওয়াবে শেকওয়া'র মোহাম্মদ সুলতানকৃত অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা লিখছেন নজরুল। আমাদের জাতীয় কবি আল্লামা ইকবালের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ২১ আগস্ট ১৯৩৬ (৫ ভাদ্র ১৩৩৪) তারিখ শুক্রবার লিখছেনঃ 'সুলতানের 'শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া'র কাব্যানুবাদ পড়লাম আসল 'শেকওয়া ওয়া জওয়াবে শেকওয়া' পাশে রেখে। অনুবাদের দিক দিয়ে এমন সার্থক আর দেখেছি বলে মনে হয় না। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ইকবালের অপূর্ব সৃষ্টি এই 'শেকওয়া ওয়া জওয়াবে শেকওয়া।'

এর এক দিন পর আল্লামা ইকবাল লাহোরের মেয়ো রোড থেকে কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে লিখছেনঃ

"There is some talk of understanding between the Punjab Parliamentary Board and the Unionist party. I should like you to let me know what you think of such a compromise and to suggest conditions for the same. I read in the papers that you have brought about a compromise between the Bengal Proja Party and the Parliamentary Board. I should like to know the terms and the conditions. Since the Proja Party is non-communal like the Unionist, your compromise in Bengal may be helpful to you".

আল্লামা ইকবাল লিখলেনঃ 'পাঞ্জাব পার্লামেন্টারি বোর্ড এবং ইউনিয়নিষ্ট পার্টির মধ্যে সমঝোতার কিছু কথাবার্তা হয়েছে। এই ধরনের সমঝোতার বিষয়ে আপনি কী মনে করেন এবং এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ কী আমাকে যদি জানান তাহলে ভালো হয়। কাগজে পড়লামঃ বঙ্গীয় প্রজাপার্টি এবং পার্লামেন্টারি বোর্ডের মধ্যে একটা সমঝোতা আনতে পেরেছেন। কোন্ কোন্ শর্তে তা হল সেটা জানাবেন। যেহেতু ইউনিয়নিষ্টদের মতো প্রজাপার্টি অসাম্প্রদায়িক, সেহেতু বাঙলায় আপনার এই আপোষে আসার ব্যাপারটা আপনার পক্ষে খুব সহায়ক হবে।'

২০ মার্চ ১৯৩৭ (৬ চৈত্র ১৩৪৩ঃ ৬ মোহাররম ১৩৫৬) তারিখ শনিবার কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে এক চিঠিতে আল্লামা ইকবাল লিখছেনঃ

ভারত এবং ভারতের বাইরের জগতকে জানানোর প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে যে, অর্থনৈতিক সমস্যাই ভারতের একমাত্র সমস্যা নয়। মুসলিম দৃষ্টিকোণ থেকে, অধিকাংশ মুসলমানের কাছে সাংস্কৃতিক সমস্যা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কোনোক্রমেই তা অর্থনৈতিক সমস্যার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আল্লামা ইকবাল লিখলেনঃ মুসলমানদের সাংস্কৃতিক সমস্যাই সর্বাপেক্ষা গভীর। মুসলমানরা একটা পৃথক রাজনৈতিক ইউনিট।

নতুন সংবিধান যে অন্তত পক্ষে ভারতীয় মুসলমানদেরকে ভারত এবং মুসলিম এশিয়ার রাজনৈতিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মসংগঠনের এক অপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে, সে কথাও তিনি লিখছেন।

এর দু'দিন আগে ১৮ মার্চ ১৯৩৭ তারিখ বৃহস্পতিবার প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহের নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্য এবং ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির এক যুক্ত অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয়েছিল

যে, 'কারো ব্যাপারে কংগ্রেস সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তাকে মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হবে না। —শাসনতান্ত্রিক কাজে গভর্নর মন্ত্রীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে নিজের বিশেষ ক্ষমতা খাটাতে পারবেন না।'

বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ, বোম্বাই ও যুক্ত প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করে কংগ্রেস। বোম্বাই ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং পরে আসামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সঙ্গে মিলিতভাবে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করে; যদিও আগে ঘোষণা করেছিল যে, অন্য কোনো দলের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না। এতে বোঝা যায় যে, কংগ্রেস একমাত্র মুসলিম লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী ছিল না। যুক্ত প্রদেশের ঘটনা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ টিকিটে নির্বাচিত সদস্য কংগ্রেসী প্রতিশ্রুতিপত্রে দস্তখত করে মন্ত্রিত্ব লাভ করেছিলেন। ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৭টিতে উজীরসভা গঠন করে কংগ্রেস।

এই পটভূমিকায় ২০ মার্চ ১৯৩৭ তারিখের চিঠিতে কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে আল্লামা ইকবাল লিখলেনঃ

" I suppose you have read Pandit Jawahar lal Nehru's address to the All India National Convention and that you fully realise the policy underlying in it so far as Indian Muslims are concerned. I believe you are also aware that the new constitution has at least brought a unique opportunity to Indian Muslims for self-organising in view of the future political developments in both India and Muslim Asia. While you are ready to co-operate with other progressive parties in the country, we must not ignore the fact that the whole future of Islam as a moral and political force in Asia rests very largely on a complete organisation of Indian Muslims. I, therefore, suggest that an effective reply should be given to the All India National Convention. you should immediately hold an All India Muslim Convention in Delhi to which you should invite members of the new Provential Assemblies as well as other prominent Muslim leaders. To this Convention you must re-state as clearly and as strongly as possible the political objective of the Indian Muslims as a distinct political unit in the country.

It is absolutely necessary to tell the world both inside and outside India that the economic problem is not the only problem in the country. From the Muslim point of view the cultural problem is much greater consequence to most Indian Muslims. At any rate it is not less important than the economic problem.

If you could hold this convention, it would test the credentials of those Muslim Legislators who have formed parties contrary to the aims and aspirations of Indian Muslims. It would further make it clear to the Hindus that no political device however subtle, can make the Indian Muslim lose sight of his cultural unity. I am coming to Delhi in a few days' time and hope to have a talk wilh you on this important matter. I shall be staying in the Afgan consulate. If you could spare a few moments, We should meet there. Please drop a line in reply to this letter as early as possible.

Yours sincerely
Muhammad Iqbal'

কায়েদ–ই–আযমকে লেখা আল্লামা ইকবালের এই চিঠিগুলি উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে চিরকাল পথ দেখাবে। আল্লামা ইকবাল লিখেছেনঃ

আমি ধরে নিচ্ছি যে, নিখিল ভারত জাতীয় সম্মেলনে (অল–ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কনভেনশনে) পন্ডিত জওহর লাল নেহরুর ভাষণ আপনি পড়েছেন এবং এর মধ্যে ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে তাদের যে পলেসির কথাটা ব্যক্ত হয়েছে, সেটা পুরোপুরি উপলব্ধি করেছেন। আমি বিশ্বাস করি, আপনি এ বিষয়েও অবহিত যে, নতুন সংবিধান ভারত এবং মুসলিম এশিয়া উভয়েরই ভবিষ্যৎ রাজনীতির প্রয়োজনে ভারতীয় মুসলমানদের আত্মসংগঠনের ক্ষেত্রে একটা অনন্য সুযোগ এনে দিয়েছে। আপনি যখন দেশের অন্যান্য প্রগতিশীল দলগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত থাকছেন তখন আপনি এই বাস্তবতাটাও অস্বীকার করতে পারেন না যে, একটা নৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ইস্লামের গোটা ভবিষ্যতটাই অনেকাংশে নির্ভর করছে ভারতীয় মুসলমানদের একটা পরিপূর্ণ সংগঠনের ওপর। অতএব আমি পরামর্শ দেবো যে, নিখিল ভারত জাতীয় সম্মেলন (অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কনভেনশন)–এর একটা কার্যকর জওয়াব দেওয়া উচিত। আপনার উচিত, দিল্লীতে সত্বর একটা নিখিল ভারত মুসলিম সম্মেলন (অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনভেনশন) আহবান করা, যেখানে আপনি প্রাদেশিক আইনসভার নবনির্বাচিত সদস্যদেরকে এবং শীর্ষস্থানীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দকে আহবান করবেন। এই সম্মেলনে আপনি দেশের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ইউনিট হিসাবে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক লক্ষ্য যথাসম্ভব পরিষ্কার ও জোরালো ভাষায় পুনর্ব্যক্ত করবেন।

ভারতের ভিতরে এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রে বিশ্ববাসীকে এটা জানিয়ে দেয়া একেবারে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে যে, দেশে অর্থনৈতিক সমস্যাটাই একমাত্র সমস্যা নয়। মুসলমানদের

দৃষ্টিভঙ্গিতে অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমানদের কাছে সাংস্কৃতিক সমস্যার পরিণাম অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আপনি যদি এই সম্মেলন আহবান করতে পারেন তা হলে ঐ সব মুসলমান বিধায়ক (প্রাদেশিক আইনসভার মুসলিম সদস্য)-দের আত্মপরিচয়ের পরীক্ষাটা হয়ে যাবে, যাঁরা ভারতীয় মুসলমানদের লক্ষ্য ও আশা-আকাঙক্ষার পরিপন্থী দল গঠন করেছেন। তদুপরি এটা হিন্দুদের কাছে আরো সুস্পষ্ট করে দেবে যে, রাজনৈতিক কোনো ফন্দি-ফিকির, তা সে যতই সূক্ষ্ম হোক না কেনো, ভারতীয় মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ঐক্যের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

কয়েক দিনের মধ্যেই আমি দিল্লীতে আসছি এবং আশা করি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হবে। আফগান দূতাবাসে আমি থাকবো। যদি কয়েক মুহূর্ত আপনি সময় দিতে পারেন, সেখানে আমাদের দেখা হবে। অনুগ্রহ করে এর জওয়াবে যত শীঘ্র সম্ভব এক লাইন লিখবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত
মুহাম্মদ ইকবাল''

কী অবিস্মরণীয় চিন্তাশীল মানুষ তিনি! ভারতীয়, এশীয়, এমন কি, বিশ্ব মুসলমানের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সংস্কৃতি সম্পর্কেও কত গভীর চিন্তা-ভাবনা তাঁর। চিঠিটি তিনি যখন লিখছেন সেটা সেই সময়ের কথা, যখন প্রাদেশিক আইনসভার অনেক মুসলমান সদস্য অপরিণামদর্শিতার কারণে কেনা-বেচার শিকারে পরিণত হচ্ছেন।

১৯৩৭-এর মে মাসের ২ এবং ৩ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসের দলীয় বৈঠকে মুসলিম লীগ টিকিটে নির্বাচিত কতিপয় সদস্যকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী খালেকুজ্জামান হপ্তাখানেক কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র সঙ্গে যোগাযোগ করেন না। ৩ মে ১৯৩৭ তারিখে 'নিউ টাইমস' এবং অন্যান্য পত্রিকায় এই বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর যুক্তপ্রদেশের মুসলমানদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'ইন্ডিয়া উইনস্ ফ্রিডম' গ্রন্থে লিখেছেন যে, জওহরলাল নেহরু মুসলিম লীগকে মাত্র একটি আসন দিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু চৌধুরী খালেকুজ্জামান দাবি করেছিলেন দু'টি;-একটি নিজের এবং অন্যটি নওয়াব ইসমাইল খানের জন্য। জনমতের চাপে তখন কংগ্রেস চৌধুরী খালিকুজ্জামান সমর্থিত কংগ্রেসী সদস্য রফি আহ্‌মদ কিদওয়াই এবং মুসলিম লীগ দলত্যাগী হাফিজ মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দেয়। ইতোপূর্বে যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠনের শর্ত পন্ডিত জওহরলাল নেহরু খারিজ করে দেন।

ইতোপূর্বে ২৭ এপ্রিল ১৯৩৭ তারিখ মঙ্গলবার দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ও পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর পরস্পরবিরোধী বিবৃতি প্রকাশিত হলো।

এরই পাঁচ দিন আগে ২২ এপ্রিল ১৯৩৭ তারিখ বৃহস্পতিবার কায়েদ-ই-আযমকে চিঠি লিখলেন আল্লামা ইকবালঃ

My dear Mr Jinnah,

I do not know whether my letter which I posted to you about two weeks ago ever reached you. I posted it to your address at New Delhi, and when I went to Delhi later I discovered that you had already left Delhi. In that letter I proposed that we should hold immediately an All India Muslim Convention, say at Delhi, and once more to re-state the policy of Indian Muslims both to the Govertment and to the Hindus.

As the situation is becoming grave and the Muslim feeling in the Punjab is rapidly becoming pro-Congress for reasons which it is unnecessary to detail, I would request you to consider and decide the matter as early as possible.The session of the All India Muslim League is postponed till August and the situation demands an early re-statement of the Muslim policy. If the convention is preceded by a tour of prominent Muslim leaders, the meeting of the convention is sure to be a great success. Please drop a line in reply to this letter as early as possible.

Yours sincerely
Muhammad Iqbal

ভাবতে অবাক লাগে; মজলুম মুসলিম জনস্বার্থের প্রতি কত নিঃস্বার্থ, অপরিসীম আবেগ এবং উদ্বেগ থাকলে এই ধরনের একটা চিঠি লেখা যায়! কত বড় হৃদয় ছিল তাঁর। ব্যক্তিগত স্বার্থ তাঁর যে ব্যাপারে কানাকড়িও নেই সে রকম একটা ব্যাপারে তাঁর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানুষ কায়েদ-ই-আযমের কাছে সঙ্কোচে লিখছেনঃ

"প্রিয় জনাব জিন্নাহ্,

গত দু' হপ্তা আগে আপনার ঠিকানায় যে চিঠিটা আমি ডাকে পাঠিয়েছিলাম সেটা কখনো আপনার কাছে পৌছেছে কি-না জানি না। আপনার নয়াদিল্লীর ঠিকানায় আমি ডাকে

পাঠিয়েছিলাম এবং পরে আমি যখন দিল্লী গেলাম তখন আমি জানতে পারলাম যে, আপনি ইতোমধ্যেই দিল্লী ত্যাগ করেছেন।

ওই চিঠিতে আমি প্রস্তাব করেছিলাম যে, আমাদের অনতিবিলম্বেই দিল্লীর মতো একটা জায়গায় নিখিল ভারত মুসলিম সম্মেলন (অল্ ইন্ডিয়া মুসলিম কনভেনশন) আহবান করা উচিত এবং সেখানে আরো একবার সরকার এবং হিন্দুদের কাছে ভারতীয় মুসলমানদের পলেসিটা পুনর্ব্যক্ত করা দরকার।

অবস্থাটা যেহেতু সঙ্গীন হয়ে উঠছে এবং আপনাকে বিস্তারিত বলা নিষ্প্রয়োজন, যে কারণে হোক, পাঞ্জাবের মুসলমানদের অনুভূতি যেহেতু কংগ্রেসপন্থী হয়ে উঠছে, সে সব দিক ভেবে আমি আপনাকে অনুরোধ করছিঃ ব্যাপারটা যত শীঘ্র সম্ভব বিবেচনা করবেন এবং সিদ্ধান্ত নেবেন।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশন আগস্ট পর্যন্ত মুলতবী হয়ে আছে এবং বর্তমান পরিস্থিতির প্রয়োজনে মুসলমানদের নীতি (পলেসি) শীঘ্রই পুনর্ব্যক্ত করা দরকার। প্রখ্যাত মুসলিম নেতৃবৃন্দ যদি এই সম্মেলনের আগে দেশের বিভিন্ন এলাকা সফর করেন তাহলে এই সম্মেলন নিশ্চিত সাফল্য অর্জন করবে। এই চিঠির জবাব যত শীঘ্র সম্ভব অনুগ্রহ করে এক লাইন লিখে পাঠান।

আপনার বিশ্বস্ত

মুহাম্মদ ইকবাল''

২২ মে ১৯৩৭ তারিখ শনিবার হিন্দু–মুসলমান সমস্যা সমাধানের বিষয়ে কায়েদ–ই–আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র এক অনুরোধের জবাবে তিথল থেকে মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী লিখলেন, 'আপনার খবর ফের আমাকে দিয়েছে। পারলে আমি কিছু করতাম। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ অসহায়।'

২৮মে ১৯৩৭ তারিখ শুক্রবার কায়েদ–ই–আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে লেখা এক চিঠিতে আল্লামা ইকবাল জানালেন যে, ইসলামী অনুশাসন প্রয়োগে মুসলমানদেরকে দারিদ্র্য দূর করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া দরকার। দু'শ' বছর ধরে তাদের অধঃপতন হচ্ছে, এ কথা মুসলমানেরা বুঝতে শুরু করেছে। সাধারণত তাদের বিশ্বাস, হিন্দু মহাজন এবং ধনীকেরাই তাদের দারিদ্র্যের কারণ। বিদেশী শাসনও যে তার জন্য সমান দায়ী–এ বোধ এখনো তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি পুরোপুরি। কিন্তু সে ধারণা একদিন অবশ্যই আসবে। জওহরলাল নেহরুর নাস্তিক্যবাদী সমাজতন্ত্রে মুসলমানদের যথেষ্ট সাড়া দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এখন প্রশ্ন হলো ঃ কীভাবে মুসলমানদের দারিদ্র্যের সমস্যার সমাধান করা যায়? এ সমস্যা

সমাধানে লীগের ভূমিকার ওপরই লীগের ভবিষ্যৎ পুরোপুরি নির্ভর করছে। লীগ যদি এ ধরনের কোন প্রতিশ্রুতি দিতে না পারে, তা হলে মুসলিম জনসাধারণ যে লীগের প্রতি আগের মতো উদাসীন থাকবে, সে ব্যাপারে তিনি এক রকম নিশ্চিত। সৌভাগ্যবশত ইসলামী আইন প্রয়োগ করে এর সমাধান এবং আধুনিক ভাবধারা অনুসারে বিকাশের একটা পন্থা রয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে ইসলামী আইন সতর্ক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে তিনি এই উপসংহারে উপনীত হয়েছেন যে, যদি সে আইনটি যথার্থ বুঝে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে অন্তত বেঁচে থাকার অধিকারটুকু অর্জন করতে সক্ষম হবে। কিন্তু এ দেশে ইসলামী শরীয়তের প্রয়োগ এবং বিশ্বাস সম্পূর্ণ স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহের প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত সম্ভব নয়।——— হিন্দু ধর্ম সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র গ্রহণ করলে আর হিন্দু ধর্ম থাকবে না। কিন্তু ইসলামের বেলাতে ইসলামের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র রক্ষা করলে তা বিপ্লব না হয়ে হবে বিশুদ্ধভাবে ইসলামের নীতিতেই ফিরে যাওয়া। হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের পক্ষে আধুনিক সমস্যাগুলো সমাধান করা অধিকতর সহজ। কিন্তু মুসলিম ভারতের এই সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব করে তোলার জন্য আঞ্চলিক পুনর্গঠন ব্যবস্থার প্রয়োজন অপরিহার্য এবং চূড়ান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতাসম্পন্ন একটি বা একটির বেশী মুসলিম রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে হবে। এ রকম একটা দাবী তোলার সময় এসেছে। তাঁর প্রশ্নঃ কায়েদ-ই-আযম কি এ কথা মনে করেননা?

আল্লামা ইকবালের এই গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটি তাঁর নিজের ভাষায়ঃ

"Thank you for your letter which reached me in due course. I am glad to hear that you will bear in mind what I wrote to you about the changes in the Constitution and Programme of the League. I have no doubt that you fully realise the gravity of the situation as far as Muslim India is concerned. The League will have to finally dicide whether it will remain a body representing the upper classes of Indian Muslims or Muslim masses who have so far, with good reason, taken no interest in it. Personally I believe that a political organisation which gives no promise of improving the lot of the average Muslims cannot attract our masses.

Under the new constitution the higher posts go to the sons of upper classes; the smaller ones go to the friends and relatives of the Ministers. In other matters too our political instititutions have never thought of improving the lot of Muslims generally. The problem of

bread is becoming more and more acute. The Muslim has begun to feel that he has been going down and down during the last 200 years. Ordinarily he believes that his poverty to Hindu money-lending or Capitalism. The perception that it is equally due to foreign rule has not yet fully come to him. But it is bound to come. The atheistic socialism of Jawaharlal is not likely to receive much response from the Muslims. The question, therefore, is – how it is possible to solve the problem of Muslim poverty? And the whole future of the League depends on the League's activity to solve this question. If the League can give no such promises I am sure the Muslim masses will remain indifferent to it as before. Happily there is a solution in the enforcement of the law and its further development in the light of modern ideas. After a long and careful study of Islamic law I have come to the conclusion that if this system of law is properly understood and applied, at least the right to subsistence is secured to everybody. But the enforcement and development of the Shariat of Islam is impossible in this country without a free Muslim state or states. This has been my honest conviction for many years and I still believe this to be the only way to solve the problem of bread for Muslims as well as to secure a peaceful India. If such a thing is impossible in India the only other alternative is a civil war which as a matter of fact has been going on for some time in the shape of Hindu-Muslim riots.

I fear that in certain parts of the country e.g. N. W. India, Palestine may be repeated. Also the insertion of Jawaharlal's socialism into the body- politic of Hinduism is likely to cause much bloodshed among the Hindus themselves. The issue between social democracy and Brahmanism is not dissimilar to the one between Brahmanism and Budhism. Whether the fate of socialism will be the same as the fate of Budhism in India I cannot say. But it is clear to my mind that if Hinduism accepts social democracy it must necessarily cease to be Hinduism. For Islam the acceptance of social democracy in some suitable form and consistent with the legal principles of Islam is not a

revolution but a return to the original purity of Islam. The modern problems, therefore, are, far more easy to solve for the Muslims than for the Hindus. But as I have said above in order to make it possible for Muslim India to solve these problems it is necessary to re-distribute the country and to provide one or more Muslim states with absolute majorities. Don't you think that the time for such a demand has already arrived? Perhaps this is the best reply you can give to the atheistic socialism of Jawaharlal Nehru.

Anyhow, I have given you my own thoughts in the hope that you will give them serious consideration either in your address or in the discussions of the coming sess on of the Muslim Lieague. Muslim India hopes that at this serious juncture your genious will discover some way out of our present difficulties.

P.S-On the subject matter of this letter I intended to write to you a long and open letter in the press. But on further consideration I felt that the present movement was not suitable for such a steh.

কায়েদ–ই–আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে লেখা এই চিঠির পাঁচ দিন পর ২ জুন ১৯৩৭ তারিখ বুধবার বোম্বাইতে হিন্দু–মুসলমান দাঙ্গা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিলো।

কায়েদ–ই–আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে ২৮ মে ১৯৩৭ তারিখ শুক্রবারের চিঠিতে আল্লামা ইকবাল লিখেছেন; 'আপনার চিঠির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ওটা ঠিকমতো পৌঁছেছে। এটা শুনে আমি খুশি হয়েছি যে, সংবিধানের পরিবর্তন এবং লীগের কর্মসূচী সম্পর্কে আপনার কাছে যা আমি লিখেছিলাম তা আপনি মনে রাখবেন। আমার সন্দেহ নেই যে, অন্তত মুসলিম ভারত সম্পর্কে সমস্যার গুরুত্ব আপনি পুরোপুরি উপলব্ধি করেন। লীগকে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, এই সংগঠন কেবলমাত্র ওপর তলার মুসলমানদেরই প্রতিনিধিত্ব করতে থাকবে, না যে জনসাধারণ সঙ্গত কারণে এই সংগঠনটি সম্পর্কে এখনও আগ্রহী হয়ে ওঠেনি, তাদের প্রতিনিধিত্ব করবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি যে, মুসলিম জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নের ব্যাপারে কোনো প্রতিশ্রুতি দেয় না, এমন কোনো রাজনৈতিক সংগঠন আমাদের মুসলিম জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতে পারে না।

নতুন সংবিধানের অধীনে উচ্চতর পদগুলি পাবেন উঁচু শ্রেণীর লোকেরা; ক্ষুদ্রতর পদগুলি পাবেন মন্ত্রীর আত্মীয়–স্বজন এবং বন্ধু–বান্ধবরা। অন্যান্য বিষয়েও আমাদের রাজনৈতিক

প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণভাবে মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়নের কথা কখনো চিন্তা করেনি। অন্নের সমস্যা ক্রমে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে। মুসলমানরা অনুভব করতে শুরু করেছেন যে, গত দু'শ' বছরে তারা দিনকে দিন অধঃপতিত হয়ে চলেছেন। সাধারণভাবে তারা বিশ্বাস করেন যে, তাদের দারিদ্র্যের কারণ হিন্দু সুদ খোররা বা ধনতন্ত্র। এই নীতিসূত্রটা এখনও তাদের ধারণায় আসেনি যে, ঔপনিবেশিক শাসন তাদের এই দূরবস্থার জন্য সমান দায়ী। কিন্তু এটা একদিন আসতে বাধ্য। জওহরলালের নাস্তিক্যবাদী সমাজতন্ত্র মুসলমানদের কাছ থেকে স্বাভাবিকভাবেই যথেষ্ট সাড়া পাবে না। তাহলে প্রশ্নটা থেকে যাচ্ছে এই যে, মুসলমানদের দারিদ্র্যের সমস্যাটা কীভাবে সমাধান করা সম্ভব? এই প্রশ্নটা লীগ কীভাবে সমাধান করে– সেই সব কাজকর্মের ওপরই লীগের পুরো ভবিষ্যতটা নির্ভর করছে। লীগ যদি এই ধরনের প্রতিশ্রুতি না দিতে পারে তা হলে আমি নিশ্চিত যে, মুসলিম জনসাধারণ এই রাজনৈতিক সংগঠনটি সম্পর্কে আগের মতোই উদাসীন থাকবে। আশার কথা, আইনের প্রয়োগের মধ্যে এবং আধুনিক ধ্যান–ধারণার আলোকে এর আরো উন্নয়নের মধ্যে এটির একটা সমাধান আছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এবং খুব মনোযোগের সাথে ইসলামী আইন বিষয়ে পড়াশুনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, এই পদ্ধতির আইন যদি যথাযথ উপলব্ধি করা যায় এবং প্রয়োগ করা যায় তা হলে অন্তত জীবিকার অধিকারটা প্রত্যেককেই দেওয়া যাবে। কিন্তু ইসলামের শরীয়তের প্রয়োগ এবং উন্নয়ন এই দেশে একটা স্বাধীন মুসলিম রাজ্য বা রাজ্যসমূহ ছাড়া সম্ভব নয়। এটা বহু বছর যাবৎ আমি সৎভাবে বিশ্বাস করে এসেছি এবং এখনও আমি বিশ্বাস করি যে, মুসলমানদের অন্নের সমস্যার সমাধান এবং একটি শান্তিপূর্ণ ভারত অর্জন কেবলমাত্র এই পথেই সম্ভব। এই ধরনের সমাধান ভারতে যদি অসম্ভব হয় তা হলে একটি মাত্র বিকল্প অবশিষ্ট থাকে এবং সেটা হলো গৃহযুদ্ধ, যা কার্যত কিছুদিন যাবৎ চলে আসছে হিন্দু–মুসলিম দাঙ্গার আকারে।

আমার ভয় হয় যে, দেশের কতকগুলি অংশে, যেমন– উত্তর–পশ্চিম ভারতে প্যালেস্টাইনের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। তদুপরি হিন্দুবাদী রাষ্ট্রে জওহরলালের সমাজতন্ত্র সম্ভবত হিন্দুদের নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট রক্তপাতের কারণ হবে। সামাজিক গণতন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রশ্ন থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং বৌদ্ধবাদের মধ্যকার প্রশ্নটার চারিত্র্য কিন্তু আলাদা কিছু নয়। ভারতে সমাজতন্ত্রের ভাগ্য বৌদ্ধবাদের ভাগ্য থেকে আলাদা কিছু হবে কি–না জানি না, কিন্তু আমার ধারণায় এটা সুস্পষ্ট যে, হিন্দুবাদ যদি সামাজিক গণতন্ত্রকে গ্রহণ করে তা হলে তাকে হিন্দুবাদ থেকে অবশ্যই সরে আসতে হবে।

অন্যদিকে ইসলামের আইনগত নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কোনো উপযুক্ত কাঠামোয় ইসলামের পক্ষে সামাজিক গণতন্ত্র গ্রহণ করাটা কোনো বিপ্লব নয়, বরং এটা হলো ইসলামের মৌলিক পবিত্রতায় ফিরে যাওয়া। ফলে আধুনিক সমস্যাগুলো হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের

পক্ষে সমাধান করা সহজ। কিন্তু আগেই যেমনটা বলেছি; মুসলিম ভারতের এই সমস্যা সমাধান করতে হলে দেশটিকে পুনর্গঠিত করতে হবে এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ এক বা একাধিক রাজ্য গঠন করতে হবে। আপনি কি মনে করেন না যে, এই ধরনের দাবি জানানোর সময় ইতোমধ্যেই এসে গেছে। জওহরলাল নেহরুর নাস্তিক্যবাদী সমাজতন্ত্রের এটাই হচ্ছে সম্ভবত উপযুক্ত জবাব যা আপনি দিতে পারেন।

যা-ইহোক, আমি আমার মতবাদ ব্যক্ত করলাম এই আশায় যে, মুসলিম লীগের আগামী অধিবেশনে আপনি আপনার ভাষণে কিংবা আলোচনায় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। মুসলিম ভারত আশা করে যে, এই কঠিন যুগসন্ধিক্ষণে আপনার প্রতিভা আমাদের বর্তমান সমস্যাদি সমাধানে একটা পথ আবিষ্কার করবে।

দ্রষ্টব্যঃ চিঠির এই বিষয়বস্তুর ব্যাপারে আপনার উদ্দেশ্যে কাগজে আমি একটা সুদীর্ঘ খোলা চিঠি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পরে এ বিষয়ে আরো চিন্তা-ভাবনা করে আমি উপলব্ধি করলাম যে, এই মুহূর্তটা এই ধরনের পদক্ষেপের উপযুক্ত নয়।

২১ জুন ১৯৩৭ তারিখ সোমবার কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে এক চিঠিতে আল্লামা ইকবাল লিখছেনঃ জাতি, ভাষা ও ধর্মীয় একতা মোতাবেক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ শান্তির জন্য প্রয়োজন। কায়েদ-ই-আযম হচ্ছেন একমাত্র মুসলিম যিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতে এবং এমন কি, বোধ হয় সম্পূর্ণ ভারতে যে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে, তাতে যথার্থ নেতৃত্ব দান করতে পারেন।

তার মনে হচ্ছে, একমাত্র হিন্দুদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। অবশ্য হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে হিন্দুরা নিরঙ্কুশভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ যেখানে, সেখানে তারা মুসলমানদেরকে একদম গণনায় না ধরলেও পারে। কিন্তু মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের ওপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছে। এ সংবিধান ভারতীয় মুসলমানদের অপরিমিত ক্ষতি সাধনের দূরভিসন্ধি নিয়ে যে প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

তার মনে পড়ছে লর্ড লোথিয়ান তাঁকে ইংল্যান্ড ত্যাগ করার প্রাক্কালে বলেছিলেন, তাঁর পরিকল্পনাই হলো ভারতের বিসংবাদের একমাত্র সমাধান, কিন্তু সে জন্য পঁচিশ বছর সময়ের প্রয়োজন।

ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব স্বীকার করে তাদের কেবল একটি সাম্প্রদায়িক ন্যায্য প্রাপ্যই মঞ্জুর করা হয়েছে। কিন্তু যে সংবিধানে একটি জাতির দারিদ্র্য নিরসনের কোনো ব্যবস্থা নেই এবং এ বিষয়ে কিছু করতে পারে না, তার অস্তিত্বের স্বীকৃতিরও কোনো মূল্য তাদের কাছে নেই। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট যে মুসলমানদের রাজনৈতিক অস্তিত্বকে অস্বীকার

করেছেন তা মোটেই ভুলে যাওয়ার কথা নয়। অন্য হিন্দু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিন্দু মহাসভা, যা হিন্দু জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধি বলে তাঁর মনে হয়েছে, একাধিকবার ঘোষণা করেছে যে, ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মিলিতভাবে জাতি গঠন করা অসম্ভব। সুতরাং এ রকম পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ ভারতের প্রতিষ্ঠার একমাত্র পন্থা হলো ভারতকে জাতিগত, ধর্মীয় ও ভাষাগতভাবে পুনর্বন্টন করা। মুসলিম প্রদেশসমূহের সমবায়ে পৃথক একটি যুক্তরাষ্ট্র তাঁর উল্লিখিত বর্ণিত সূত্র অনুসারে গঠন করাই হলো ভারতের একমাত্র শান্তিপূর্ণ পন্থা এবং মুসলমানদেরকে অমুসলিমদের প্রভুত্ব থেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায়। ভারতের ভিতরের অথবা বাইরের অন্যান্য জাতিসমূহের মতো উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং বাংলার মুসলমানদের কেন জাতি বলে মেনে নেওয়া হবে না? ব্যক্তিগতভাবে তিনি মনে করেন, উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং বাংলার মুসলমানদের বর্তমানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে অগ্রাহ্য করা উচিত।

কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মাতৃভাষা ছিল গুজরাটী। তিনি গুজরাটী ভাষার একটি দৈনিক কাগজ পড়তেন, অন্যান্য যে দৈনিকগুলি পড়তেন সেগুলি ছিলো ইংরেজী কাগজ। কাজকর্মও চালাতেন ইংরেজীতে। আল্লামা ইকবাল সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন মূলত উর্দূতে এবং ফারসীতে, উর্দুতে যা করেছেন তার দ্বিগুণ করেছেন ফারসীতে। কায়েদ-ই-আযমের কাছে তিনি যে চিঠিগুলি লিখেছেন সেগুলি সবই ইংরেজীতে। উর্দুতে বা অন্য কোনো ভাষায় নয়।

লাহোর থেকে ২১ জুন ১৯৩৭ তারিখ সোমবার লেখা চিঠিটি হুবহু উদ্ধৃত করছিঃ

My dear Mr. Jinnah, Lahore

21st June,Lahore, 1937

Thank you so much for your letter which I received yesterday. I know you are a busy man; but I do hope you won't mind my writing to you so often, as you are the only Muslim in India today to whom the community has a right to look up for safe guidance through the storm which is coming to North-West India and perhaps to the whole of India. I tell you that we are actually living in a state of civil war which, but for the police and military would become universal in no time. During the last few months there has been a series of Hindu-Muslim riots in India. In North-West India alone there have been at least three riots during the last three months and at least four cases of vilification of the Prophet by Hindus and Sikhs. In each of these cases, the vilifier

has been murdered. There have also been cases of burning of the Koran in Sind. I have carefully studied the whole situation and believe that the real cause of these events is neither religious nor economic. It is purely political, i. e. the desire of the Sikhs and Hindus to intimidate Muslims even in the Muslim majority provinces. And the new Constitution is such that even in the Muslim majority provinces, the Muslims are made entirely depended on non-Muslims. The result is that the Muslim Ministry can take no proper action and are even driven to do injustice to Muslims partly to please those on whom they depend and partly to show that they are absolutely impartial. Thus it is clear that we have our specific reasons to reject this constitution. It seems to me that the new constitution is devised only to placate the Hindus. In the Hindu Majority provinces, the Hindus have of course absolute majorities, and can ignore Muslims altogether. In Muslim majority provinces, the Muslims are made entirely dependent on Hindus . I have no doubt in my mind that this constitution is calculated to do infinite harm to the Indian Muslims. Apart from this it is no solution of the economic problem which is so acute among Muslims.

The only thing that the communal award grants to Muslims is the recognition of their political existence in India. But such a recognition granted to a people whom this constitution does not and cannot help in solving their problem of poverty can be of no value to them. The Congress President has denied the political existence of Muslims in no unmistakable terms. The other Hindu political body i. e. the Mahasabha, whom I regard as the real representative of the masses of the Hindus, has declared more than once that united Hindu-Muslim nation is impossible in India. In these circumstances, it is obvious that the only way to a peaceful India is a redistribution of the country on the lines of racial, religious and linguistic affinities .Many British statesman also realise this and the Hindu-Muslim riots which are rapidly coming in the wake of this constitution are sure further to open their eyes to the real situation in the country. I remember Lord Lothian

told me before I left England that my scheme was the only possible solution of the problems of India, but it would take 25 years to come. Some Muslims in the Punjab are already suggesting the holding of a North-West Indian Muslim conference, and the idea is rapidly spreading. I agree with you, however, that our community is not yet sufficiently organised and disciplined and perhaps the time for holding such a Conference is not yet ripe. But I feel that it would be highly advisable for you to indicate in your address at least the line of action that the Muslims of North-West India would be finally driven to take.

To my mind the new constitution with the idea of a single Indian federation is completely hopeless. A separate federation of Muslim provinces, reformed on the lines I have suggested above, is the only course by which we can secure a peaceful India and save Muslims from the domination of non-Muslims. Why should not the Muslims of North-West India and Bengal be considered as nations entitled to self-determination just as other nation in India and outside India are?

Personally I think that the Muslims of North-West India and Bengal ought at present to ignore Muslim minority provinces. This is the best course to adopt in the interests of both Muslim majority and minority provinces .It will, therefore be better to hold the coming session of the League in the Punjab, and not in a Muslim minority province. The month of August is bad in Lahore. I think you should seriously consider the advisability of holding the coming session at Lahore in the middle of October when the weather is quite good in Lahore. The interest in the All India Muslim Leauae is rapidly growing in the Punjab and the holding of the coming session in Lahore is likely to give fresh political awakening to the Punjab Muslims.

Yours sincerely

Muhammad Iqbal

এই চিঠি যে সময় লেখা হয়েছে এর অব্যবহিত পর দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসী প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলো গদীনশীন হচ্ছে।

৯ জুলাই ১৯৩৭ তারিখ শুক্রবার মধ্যপ্রদেশে প্রথম ডঃ খারের নেতৃত্বে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হলো।

১৫ জুলাই ১৯৩৭ তারিখ বৃহস্পতিবার মাদ্রাজে সি· রাজা গোপালাচারি কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

এই রকম একটা সময়ে আল্লামা ইকবাল ২১ জুন ১৯৩৭ তারিখে লাহোর থেকে কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে চিঠি লিখেছিলেন। এই গুরুত্বপুর্ণ চিঠিটি হুবহু তরজমা করার চেষ্টা করছিঃ

লাহোর
২১ জুন ১৯৩৭

প্রিয় জনাব জিন্নাহ,

আপনার চিঠির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। গতকাল পেয়েছি আপনার চিঠি।

আমি জানি, আপনি একজন ব্যস্ত মানুষ। কিন্তু আমি আশা করি, আপনার কাছে এত ঘন ঘন চিঠি লিখছি বলে আপনি কিছু মনে করবেন না। যেহেতু আজকের ভারতে আপনিই কেবল একমাত্র মুসলমান যাঁর কাছ থেকে আমাদের সম্প্রদায় নিরাপদ পথ-নির্দেশনা পাওয়ার জন্য তাকিয়ে আছে। সেই ঝড়ের মধ্যে, যা উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিকে আসছে এবং সম্ভবত সমগ্র ভারতের দিকেই। আমি আপনাকে বলছিঃ আমরা প্রকৃত পক্ষে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতিতে বাস করছি। পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীও এর প্রভাবে নিরপেক্ষ থাকতে পারবে না। গত কয়েক মাসে একটা ধারাবাহিক হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। গত তিন মাসে উত্তর-পশ্চিম ভারতেই কেবল অন্তত তিনটি দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। এবং অন্তত চারটি ক্ষেত্রে হিন্দু ও শিখদের হাতে আল্লাহ-রাসূলের নিন্দাবাদের ঘটনা ঘটেছে। এবং এর প্রতিটি ক্ষেত্রে কুৎসা রটনাকারী নিহত হয়েছে। সিন্ধুতে কোরআন শরীফ পোড়ানোর কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। গোটা পরিস্থিতিটা আমি অত্যন্ত সচেতনভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি এবং আমি বিশ্বাস করি যে, এই ধরনের প্রতিটি ঘটনার প্রকৃত কারণ ধর্মীয় নয় কিংবা অর্থনৈতিকও নয়। এটা পুরোপুরি রাজনৈতিক, যেমন- শিখ এবং হিন্দুদের কামনা মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলিতেও মুসলমানদেরকে ভয় দেখানো কিংবা ভগ্নোদ্যম করা। এবং এই নতুন সংবিধানটা এই ধরনের যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতেও মুসলমানদেরকে পুরোপুরি অমুসলিমদের ওপর

নির্ভরশীল করা হয়েছে। এর ফল হয়েছে এই যে, মুসলিম মন্ত্রিসভাগুলো উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে পারে না এবং ক্ষমতায় থাকার জন্য মুসলমানদের ওপর অবিচার করতে বাধ্য হয়, যাদের ওপর তারা নির্ভরশীল তাদেরকে অংশত সন্তুষ্ট করার তাকিদে এবং অংশত এটা দেখানোর জন্য যে, তারা পুরোপুরি নিরপেক্ষ। এর ফলে এটা এখন পরিষ্কার যে, আমাদের দিক দিয়ে সুনির্দিষ্ট কতগুলো কারণ আছে এই সংবিধান বাতিল করার।

আমার মনে হয় যে, এই নতুন সংবিধান হিন্দুদের কেবল শান্ত করার লক্ষ্যেই প্রণীত হয়েছে। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে হিন্দুদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে এবং তারা মুসলমানদেরকে পুরোপুরি উপেক্ষা করতে পারে। অন্যদিকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে মুসলমানদেরকে পুরোপুরি নির্ভরশীল করা হয়েছে অমুসলিমদের ওপর। আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই সংবিধান ভারতীয় মুসলমানদেরকে অপরিসীম ক্ষতি করার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে। এ ছাড়াও ভারতীয় মুসলমানরা যে তীব্র অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে আছেন, সে বিষয়ে কোনো সমাধান এই নতুন সংবিধানে নেই।

ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য যে জিনিসটা এই সংবিধানে স্বীকার করা হয়েছে, সেটা হলো পৃথক বা সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা। কিন্তু যে জনগণের দারিদ্র্যের সমস্যা সমাধান করার ব্যাপারে এই সংবিধান যখন কোনো সাহায্য করে না এবং করতে পারে না তখন এই ধরনের অধিকারের কোনো মূল্যও থাকছে না। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পরিষ্কার ভাষায় মুসলমানদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন।

হিন্দুদের আর যে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আছে অর্থাৎ হিন্দু মহাসভা, এই হিন্দু মহাসভাকেই আমি হিন্দুদের যথার্থ প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান বলে মনে করি। হিন্দু মহাসভা একাধিকবার ঘোষণা করেছে যে, ভারতে হিন্দু–মুসলমানে মিলে একটি জাতি হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। এই পরিস্থিতিতে এটা স্বাভাবিক যে, শান্তিপূর্ণভাবে ভারত গঠনের জন্য ভারতের পুনর্গঠন দরকার জাতি, ধর্ম ও ভাষার ভিত্তিতে। অনেক বৃটিশ রাষ্ট্র–নায়ক এটা উপলব্ধি করেন। এই সংবিধানটা আসার অব্যবহিত পর হিন্দু–মুসলিম দাঙ্গা যেভাবে সংঘটিত হচ্ছে তাতে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তাদের দৃষ্টি আরো স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। মনে পড়ে, আমার ইংল্যাণ্ড ত্যাগের আগে লর্ড লোথিয়ান আমাকে বলেছিলেন যে, আমার পরিকল্পনা ভারতের সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা। কিন্তু এটা আসতে ২৫ বছর সময় লাগবে।

পাঞ্জাবের কিছু মুসলমান ইতোমধ্যেই পরামর্শ দিচ্ছেন যে, উত্তর–পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের একটা সম্মেলন আহ্বান করা হোক এবং এই ধারণার দ্রুত প্রসার ঘটছে। আমি আপনার সঙ্গে অবশ্য একমত যে, আমাদের সম্প্রদায় এখনও যথেষ্ট সুসংগঠিত এবং সুশৃঙ্খল হয়ে ওঠেনি এবং সম্ভবত এ ধরনের সম্মেলন আহ্বান করার সময় আসেনি। কিন্তু আমি

উপলব্ধি করি, এটা আপনার নজরে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আনা নিতান্তই দরকার যে, আপনার ভাষণে সেই ইঙ্গিতটা থাকা দরকার যা উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানরা চূড়ান্তভাবে নিতে বাধ্য হবে।

আমার মনে হয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটি মাত্র ভারতের যে ধারণা নতুন সংবিধানে আছে, সেটা নিতান্তই পুরোপুরি হতাশাজনক। আমি উপরোক্ত যে লাইনে পরামর্শ দিয়েছি সেভাবে সংস্কার বা সংশোধন করে মুসলিম প্রদেশসমূহের একটি পৃথক যুক্তরাষ্ট্রই হচ্ছে একমাত্র পন্থা, যে উপায়ে একটি শান্তিপূর্ণ ভারত অর্জন করা এবং অমুসলিমদের আধিপত্য থেকে মুসলমানদের রক্ষা করা সম্ভব। উত্তর-পশ্চিম ভারতের এবং বাংলার মুসলমানরা ভারতের এবং ভারতের বাইরের অন্যান্য জাতিগুলির মতো জাতি হিসাবে কোনো আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পাবে না?

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে, উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং বাংলার মুসলমানদের এখন উচিত মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলিকে উপেক্ষা করা। মুসলিম প্রধান এবং মুসলিম সংখ্যালঘু, উভয় ধরনের প্রদেশের জন্য এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা। এ কারণে মুসলিম লীগের আগামী অধিবেশন কোনো মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশে নয়। পাঞ্জাবে হলে ভালো হবে। লাহোরে আগস্ট মাসটা খারাপ যায়। লাহোরে অক্টোবর মাসটা ভালো যায়। অক্টোবরের মাঝামাঝি লাহোরে মুসলিম লীগের আগামী অধিবেশন আহ্বান করার ব্যাপারটা গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে দেখতে পারেন। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতি আগ্রহ পাঞ্জাবে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং মুসলিম লীগের আগামী অধিবেশন লাহোরে আহূত হলে পাঞ্জাবের মুসলমানদের মধ্যে সম্ভবত একটা নতুন রাজনৈতিক জাগরণ আসবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত

মুহাম্মদ ইকবাল

এই সব চিঠিপত্রের মধ্যে আল্লামা ইকবালের এক বিশাল হৃদয়ের পরিচয় আছে। তিনি মুসলমান সমাজের তৃণমূল স্তরের মানুষগুলোর কথাও ভেবেছিলেন, যে মানুষগুলো আজো এই উপমহাদেশের অধিকাংশ জায়গায় বড্ড বেশি উপেক্ষিত ও নিগৃহীত হচ্ছেন। তাঁর ইন্তেকালের বছরখানেক আগে তিনি এই যে সব চিঠিপত্র লিখেছিলেন, সেগুলো নিয়ে নানাভাবে চিন্তা-ভাবনা করার আছে। চিন্তার অনেক খোরাক জোগাতে পারে এই চিঠিপত্রগুলো।

ইকবাল ঃ বিচক্ষণ পরামর্শদাতা ও পথ-প্রদর্শক

সৈয়দ তোসারফ আলী

ধর্মচর্চা অনেকেই করেন, ইকবালও করেছেন। দর্শনচর্চা অনেকেই করেন, ইকবালও করেছেন। কবিতাচর্চা অনেকেই করেন, ইকবালও করেছেন। রাজনীতি অনেকেই করেন, ইকবালও করেছেন। তাহলে অনেকের সঙ্গে ইকবালের পার্থক্যটা কোথায়? হ্যাঁ, পার্থক্য অবশ্যই আছে। কি ধর্মচর্চায়, কি দর্শনচর্চায়, কি কাব্যচর্চায়, কি রাজনীতিচর্চায়, সর্বত্রই ইকবাল তাঁর স্বকীয়তার, তাঁর নিজস্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। অনেকের মধ্যে অনন্য হয়ে উঠেছেন। যে কারণে ইকবাল আমাদের মনোযোগ কাড়েন। বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আমরা তাঁর অভিমতের সঙ্গে আমাদের মতামতকে মিলিয়ে নেবার তাগিদ অনুভব করি। পথনির্দেশ খুঁজি তাঁর বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যে।

ইকবালের ধর্মচর্চার স্বরূপ

আল্লামা ইকবাল নিজেই বলেছেন, 'আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ ব্যয় করেছি ইসলামের সযত্ন অধ্যয়নে। বিশেষ করে ইসলামের কানুন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাস অধ্যয়নে।'

এখানে প্রশ্ন জাগে, আল্লামা ইকবাল কি ব্যক্তিগত মোক্ষ লাভের পথ ও পন্থা খুঁজে বের করার জন্য তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ ব্যয় করেছিলেন কোরআন-হাদীস, ইসলামের ইতিহাস, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও পূর্বসুরি চিন্তানায়কদের ভাবনা-চিন্তার বিশাল সম্ভার অধ্যয়নে ও অনুশীলনে। যেমনটি মধ্যযুগে অনেকেই করেছেন। এ প্রশ্নের উত্তরে দৃঢ়ভাবে বলা যায়, ব্যক্তিগত মোক্ষ লাভের চিন্তা ইকবালের ক্ষেত্রে মুখ্য ছিল না। ইকবালের ধর্মচর্চা মোটেই মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল না।

জানা যায়, আল্লামা ইকবাল কোরআনের কোনও কোনও আয়াত এক থেকে দেড় হাজার বার পর্যন্ত অধ্যয়ন করেছেন। বিশেষ বিশেষ আয়াতের মর্মভেদ করার জন্য তাঁকে এটা করতে হয়। পূর্বসুরি কোনো বিশেষজ্ঞের দেয়া ভাষ্যে বা ব্যাখ্যায় তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলে তাঁকে নিশ্চয় এতটা পরিশ্রম করতে হতো না। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি পূর্বসুরি কারও ব্যাখ্যাকে তর্কাতীত বা চরম বলে মেনে নেননি। মুক্ত মন নিয়ে তিনি কোরআন-হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাণবস্তুর সন্ধান করেছেন। সমকালীন চাহিদা ও বাস্তবতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রেখে তিনি ধর্মীয় সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন এবং নবতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি ইসলামী সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের মধ্যে বিশ্বজনীন সত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যকে আবিষ্কার করেন। জিজ্ঞাসু মন নিয়ে তিনি তাঁর সময়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও দার্শনিক ভাবনা-চিন্তাকে যুক্তির কষ্ঠিপাথরে যাচাই করেন। অন্ধবিশ্বাস কিংবা গোঁড়ামীকে তিনি সর্বতোভাবে বর্জন করেন। বৈজ্ঞানিকের নিষ্ঠা, আগ্রহ ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি কোরআন-হাদীস তথা ইসলামী ঐতিহ্যের উৎস থেকে মৃতসঞ্জীবনী সুধা সংগ্রহ করে মুমূর্ষু মুসলিম সমাজের দেহে নব-জীবন দান করতে চেয়েছিলেন। ইসলামী জীবনাদর্শকে তিনি তাঁর মতো করে উপস্থাপিত করেছিলেন নতুন যুগের আদর্শ নির্দেশ করতে। তিনি চিরায়ত ইসলামী সংস্কৃতির সাহায্যে স্থবির মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক রূপান্তর ঘটাতে চেয়েছিলেন। ইসলাম ধর্মের জীবনী-শক্তি, বিস্তার-শক্তি, বাইরের ভালো জিনিস গ্রহণ করার শক্তি এবং তা একত্ববাদের মূল প্রবাহের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার শক্তি ইতিহাসের আলোকে বিশ্লেষণ করে মুসলিম জীবনে আধুনিক

গতিশীল সমাজের আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের, অর্থের সঙ্গে পরমার্থের, আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে ইহলৌকিকতার, পরিবর্তনের সঙ্গে শাশ্বতের সম্পর্ককে তিনি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অসাধারণ যোগ্যতার সঙ্গে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। পার্থিব জীবনে তিনি খুদীর (অহম) উন্নয়নের কথা জোর দিয়ে বলেছেন। মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গের আহ্বান জানিয়েছেন। ইসলামকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন পূর্ণতার অনুধ্যান হিসাবে, সুন্দর জীবন গঠনের শ্রেষ্ঠ পন্থারূপে।

দার্শনিক ইকবাল

ইকবাল দর্শন শাস্ত্রে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন ইংল্যান্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হতে। দর্শনের উপর ডক্টরেট করেন জার্মানীর মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় হতে। এ তথ্যগুলো অনেকের জানা থাকলেও এখানে নতুন করে উল্লেখ করছি এ কারণে যে, আধুনিক মনের উপর ইউরোপীয় ভাবধারা ও দর্শন চিন্তার যে বিরাট প্রভাব রয়েছে সেই ভাবধারা ও দর্শন চিন্তার সঙ্গে আল্লামা ইকবালের যে সম্যক পরিচয় ছিলো সে কথাটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য।

আল্লামা ইকবালের চিন্তা-ভাবনার বিকাশে পাশ্চাত্যের বিরাট অবদান রয়েছে। সে ঋণ তিনি অকপটে স্বীকারও করেছেন। লবণের পুতুল সমুদ্র দর্শনে গিয়ে যেমন নিজের অস্তিত্বকে সমুদ্রের মধ্যে হারিয়ে ফেলে, আল্লামা ইকবাল তেমন লবণের পুতুল ছিলেন না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের উৎকর্ষকে তিনি প্রশংসার চোখে দেখলেও সভ্যতা নির্মাণের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের জীবন-দর্শন ও রাষ্ট্র-দর্শনের ভুল-বিচ্যুতিকে তিনি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখেছেন। ভুলগুলিকে তিনি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েও দিয়েছেন। পাশ্চাত্যের বাহ্যিক চাকচিক্য ও জীবনের যৌলুশ তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি; বরং ইসলামী জীবন-দর্শনের আলোকে তিনি পাশ্চাত্যের আধুনিক দর্শনের সঙ্গে আজীবন বোঝাপড়া করেছেন। অবশ্য, পাশ্চাত্যের যা কিছু ভালো, যা কিছু মানুষের জন্য কল্যাণকর তাকে সাগ্রহে বরণ করে নিয়ে তিনি ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন করার চেষ্টা করেছেন। 'The Reconstruction of Religious Thought in Islam' ছিল তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতাবলীর শিরোনাম।

ইকবালের দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য সভ্যতা মানুষকে দেখেছে নিছক শোষণ করার মতো বস্তু হিসাবে, সাংস্কৃতিক শক্তি দ্বারা বিকাশ সাধন ও বৃহত্তর রূপদানের মতো ব্যক্তিত্ব হিসাবে নয়। পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্মে ব্যক্তির মূল্য স্বীকৃত হয় এবং তাকে শৃংখলায় আনা হয় তার সর্বস্ব আল্লাহ ও মানুষের সেবায় বিলিয়ে দেবার জন্য। ইকবাল বিশ্বাস করতেন, ইসলাম এখনও এমন এক নতুন দুনিয়া গড়ে তুলতে পারে, যেখানে মানুষের সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হবে না তার জাতি, বর্ণ অথবা অর্জিত সম্পদ দ্বারা; যেখানে মানব-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে উদরের সাম্যের উপর নয় বরং আত্মার সাম্যের উপর।

একজন তীক্ষ্ণধী দার্শনিক হিসাবে ইকবাল তাঁর সময়ের প্রভাবশালী কতিপয় দার্শনিক মতবাদের ভুল-ভ্রান্তি যথার্থভাবে সনাক্ত করেন। ইসলাম ধর্মকে আধুনিক দর্শনের পরিভাষায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। ইকবালের চোখে 'বস্তুবাদের সবচেয়ে দুঃখজনক ভুল এই যে, এই মতবাদে সসীম চেতনা নিজ লক্ষ্যবস্তুকেই নিঃশেষিত করে দেয়।' আধুনিক বিবর্তনবাদ সম্পর্কে তাঁর অভিযোগ হলো, 'বর্তমান পৃথিবীতে ক্রমবিকাশবাদ মানব জীবনে আশা ও উদ্যম আনবার পরিবর্তে এনেছে হতাশা ও উদ্বেগ।' ইকবালের মতে, 'আধুনিক বিবর্তনবাদীরা অকারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, মানুষের বর্তমান শারীরিক ও মানসিক

গঠনই জৈব বিকাশের চরমতম ফল এবং জীবন মৃত্যুতেই শেষ; তারপর আর কিছু নেই।' আধুনিক নাস্তিক্যপুষ্ট সমাজবাদ ও জাতীয়তাবাদকে সমালোচনা করতে গিয়ে ইকবাল বলেছেন, 'ঘৃণা, সন্দিগ্ধতা, ক্রোধ ইত্যাদি মানবাত্মাকে কলুষিত করে এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ পথ রুদ্ধ করে দেয়। অথচ এসব 'গুণাগুণ'ই ঐ শ্রেণীর মতবাদের মূল উপজীব্য।' ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে ইকবাল স্বীকার করে নিতে পারেননি এই যুক্তিতে যে, তাহলে ধর্মীয় বিশ্বাসের সমান্তরাল আর একটি রাষ্ট্রীয় বিশ্বাসও আমাদের পোষণ করে চলতে হবে। ধর্ম ও রাষ্ট্র একই বস্তুর দুই বিভিন্ন দিক, এ ধারণাকে ইকবাল সত্য বলে মেনে নিতে পারেননি। ইকবালের বিচারে, মানব চরিত্রকে দ্বিধা-বিভক্ত মনে করার বিভ্রান্তি থেকে, এই পুরাতন ভুলটি জন্ম নিয়েছে। তাঁর বিবেচনায়, প্রকৃত সত্য এই যে, স্থান-কালের পরিপ্রেক্ষিতে জড় চেতন-এর রূপ লাভ করে। মানুষের মধ্যেই জড় ও চেতন-এর সমাবেশ বিদ্যমান। জাগতিক কার্যকলাপের মধ্যে মানুষ একদিকে প্রতিভাত হয় দেহরূপে; আবার সেই একই কার্যের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের বিচারে প্রতিভাত হয় মন বা আত্মারূপে।

আইনস্টাইনের মত একজন যুগান্তকারী বিজ্ঞানীর আপেক্ষিকতাবাদকেও ইকবাল সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। কারণ, ইকবালের কাছে আইনস্টাইনের মতবাদে 'সময়' গতিহীন এবং অদ্ভুতভাবে স্থান সদৃশ মনে হয়েছে। তাই তিনি আইনস্টাইনের আপেক্ষিক মতবাদ অপেক্ষা হোয়াইটহেডের আপেক্ষিক মতবাদকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ধর্ম ও দর্শনের আলোচনায় ইকবাল তাঁর পূর্বসুরিদের অবদানের উপর পর্যাপ্ত আলোকপাত করেছেন। বিস্মৃতপ্রায় বহু মুসলিম মনীষীর কৃতিত্বকে অকৃপণভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ইসলামী জীবনধারা গঠনের লক্ষ্যে অনেক ব্যাপারে ইকবাল তাঁর নিজস্ব মতামতও ব্যক্ত করেছেন। সার্বজনীন ইমামত এবং খিলাফতের অবর্তমানে এর দায়িত্ব একটি নির্বাচিত প্রতিনিধিসংঘের হাতে ন্যস্ত করার বিষয়ে তুরস্কের সিদ্ধান্তকে ইকবাল সম্পূর্ণ নির্ভুল বলেছেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সাধারণতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। শুধু তা-ই নয়, ইকবালের বিচারে আজকের মুসলিম বিশ্বে উদ্ভূত নব নব সমস্যাবলী নিয়ন্ত্রণে সাধারণতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থাই একান্তভাবে অপরিহার্য।

ইকবালের কাছে ইসলাম জাতীয়তাবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ নয়, এ একটি জাতিসংঘ। যা মানবকৃত সীমারেখা, ভাষাগত, বর্ণগত স্বাতন্ত্র্য মেনে নেয় শুধুমাত্র পরিচয় সৌকর্যের জন্য, এ সবের সাহায্য নিয়ে কোনো বিশেষ জাতির সামাজিক বিকাশকে খর্ব করবার জন্যে নয়। তিনি বলেছেন, 'ইসলামে দেশ-ভেদ নেই। এর উদ্দেশ্য হল সমগ্র মানবমন্ডলীকে নিয়ে এক মহাজাতি গঠন করা।'

ধর্মকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন

আল্লামা ইকবাল নিজে একজন বড় মাপের দার্শনিক হয়েও ধর্মকে দর্শনের উপর স্থান দিয়েছেন। কারণ, তাঁর বিবেচনায় দর্শন সত্তাকে যেন দূর থেকে দেখতে আগ্রহী কিন্তু ধর্ম চায় সত্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ। ইকবাল বলেন, দর্শন একটা মতবাদ আর ধর্ম হচ্ছে জীবন্ত অভিজ্ঞতা, সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠতা। এই ঘনিষ্ঠতা লাভ করতে হলে, ইকবাল মনে করেন, চিন্তাকে তার নিজের নাগাল পেরিয়ে আরও ঊর্ধ্বে উঠতে হবে এবং তার সার্থকতা খুঁজতে হবে একটা মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে, যে দৃষ্টিভঙ্গিকেই ধর্ম বর্ণনা করে প্রার্থনা বলে।

আল্লামা ইকবাল অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে, আধুনিক মানুষ তার বুদ্ধির আবিষ্কার এবং উপলব্ধির দ্বারা এতদূর সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যে, আধ্যাত্মিকতার আবেদন তার জীবনে আর নেই বললেই চলে। নিজ অন্তরের সাথেই তার যোগ নেই। চিন্তা জগতে

যেমন তাঁর নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনেও তেমনি অপরের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব। বিকট আত্মসর্বস্বতা, অফুরন্ত ঐশ্বর্য-পিপাসা তাঁকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে; অপর পক্ষে তাঁর লাভ হয়েছে জীবনব্যাপী অবসাদ। এর থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করতে গিয়ে ইকবাল বলেছেন, 'একমাত্র ধর্মীয় পন্থাতেই সত্যিকারের আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবন সম্ভব হতে পারে এবং এই ধর্মীয় পন্থাই মানুষকে অনন্ত জীবন ও অপরিসীম ক্ষমতার সান্নিধ্যে আনতে পারে।'

ইসলামের ব্যাখ্যায় ইকবাল

দার্শনিক ইকবাল ইসলামের জন্মকে আরোহমান বুদ্ধিবৃত্তিরই জন্ম হিসাবে দেখেছেন। আর যে নবুওয়তের প্রয়োজন নেই– এই বোধ, এই উপলব্ধিই ইসলামের নবুওয়তকে পূর্ণতা দান করেছে বলে ইকবাল মনে করেন। এর ব্যাখ্যায় ইকবাল বলেছেন, 'জীবন চিরদিন পরের পরিচালনায় চলতে পারে না; পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধির জন্যে মানুষকে তার নিজস্ব সঙ্গতির উপরই নির্ভর করতে হবে।' নবুওয়তের অবসান সম্পর্কিত আলোচনায় ইকবাল আরও বলেছেন, 'ইসলামে পুরোহিত প্রথা এবং উত্তরাধিকার সূত্রে রাজক্ষমতা লাভ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কুরআনে সর্বদা যুক্তি আর অভিজ্ঞতার প্রতি আবেদন জানান হয়েছে। মানবীয় জ্ঞানের উৎস হিসাবে প্রকৃতি ও ইতিহাসের দৃষ্টান্তের উপর নজর দিতে বলা হয়েছে।' ইকবালের বিবেচনায় এ সবই হচ্ছে অবসানবাদের একেকটি দিক। ইসলামে বুদ্ধিবৃত্তির এই সাবালকত্বের উপর গুরুত্ব দেয়ার জন্য মুসলমানদের উন্নত ও সভ্য জাতিসমূহের পাশে স্থান পাওয়া উচিত বলে ইকবাল মনে করেন।

ইসলামের প্রত্যক্ষবাদী মনোভাব ইকবাল চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কুরআন চরম সত্তার নিদর্শন দেখতে শেখায় সূর্য্যের মধ্যে, চন্দ্রের মধ্যে, দীর্ঘায়মান ছায়ার মধ্যে, দিবা-রাত্রির আবর্তনের মধ্যে, মানুষের বর্ণ ও ভাষার বৈচিত্র্যের মধ্যে, মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্যে, এক কথায় মানুষের ইন্দ্রিয়গাহ্য সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে।

ইকবালের ধারণায়, কুরআনের আশু উদ্দেশ্য হল প্রকৃতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ দ্বারা মানুষের মধ্যে সেই সচেতনতা জাগিয়ে দেয়া, যাতে প্রকৃতি তার কাছে প্রতীক বলে প্রতীয়মান হয়। ইকবালের মতে, প্রত্যক্ষবাদী মনোভাবই হচ্ছে কুরআনের প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। এই মনোভাবই কুরআন অনুসারীদের মনে বাস্তবের প্রতি করেছিল গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি। তার ফলেই পরিণামে তারা হয়েছিল আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। যে-যুগে মানুষ আল্লাহর অনুসন্ধান করতে পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহকে মূল্যহীন মনে করে বর্জন করেছিল, সেই যুগে এই প্রত্যক্ষবাদের উন্মেষ সাধন প্রকৃতই এক মহান ব্যাপার ছিল। ইকবাল আরও বলেন, কুরআনের ঘোষণায় বিশ্বের রয়েছে একটা মহান উদ্দেশ্য। বিশ্বের পরিবর্তনশীল বাস্তবই আমাদের সত্তাকে নব নব রূপ পরিগ্রহ করতে বাধ্য করছে। বিশ্ব আমাদের সামনে প্রতিনিয়ত যে-সব বাধার সৃষ্টি করছে তা অতিক্রম করার মানসিক প্রচেষ্টাতেই আমাদের জীবন সমৃদ্ধ ও বিকশিত হচ্ছে। উপরন্তু আমাদের অন্তর্দৃষ্টিও হচ্ছে প্রখরতর। এভাবেই আমরা মানবীয় অভিজ্ঞতার সূক্ষ্মতর দিকগুলো আরো গভীরভাবে আয়ত্ত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠছি। পার্থিব জগতের পরিবর্তন প্রবাহের সঙ্গে মনের সংযোগই আমাদের অপার্থিবকে মানস-চোখে দেখতে শিখিয়ে তোলে, সত্তা তার নিজ অভিব্যক্তির মধ্যেই বিদ্যমান। মানুষকে জীবন ধারণ করতে হয় প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে। কাজেই, দৃশ্যমান জগতকে উপেক্ষা করে চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। পরিবর্তনের মত একটা বিরাট ব্যাপারের প্রতি কুরআন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই পরিবর্তন হৃদয়ঙ্গম ও নিয়ন্ত্রণের দ্বারাই শুধু স্থায়ী সভ্যতা গড়ে তোলা সম্ভব। এশিয়া তথা গোটা প্রাচীন জগতের সংস্কৃতিসমূহ ব্যর্থ

হয়েছিল এই কারণে যে, তারা সত্তাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিল ভেতর থেকে এবং ভেতর থেকে অগ্রসর হয়েছিল বাইরের দিকে। এই পদ্ধতিতে তারা শুধু অন্তসারশূন্য থিওরী বা মতবাদের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু নিছক মতবাদের উপর ভিত্তি করে তো কোন স্থায়ী সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না।

ইকবালের পর্যবেক্ষণে এটাও ধরা পড়ে যে, ইউরোপ কতিপয় বিশ্বজনীন মূলনীতির ভিত্তিতে তার নিজ আদর্শ সম্মত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে ইকবালের মূল্যায়ন হলো, ইউরোপের আদর্শবাদ কখনো তার ব্যক্তি বা সমাজ জীবনে প্রাণবন্ত শক্তিরূপে ক্রিয়া করেনি। নিছক যুক্তির মারফত যে সত্য লাভ ঘটে, তা জীবন্ত বিশ্বাসের সে শিখা জ্বালাতে পারে না, যা একমাত্র ব্যক্তিগত উপলব্ধি দ্বারা সম্ভব। এই কারণেই শুধুমাত্র চিন্তাবৃত্তির সাহায্যে আজ পর্যন্ত মানুষকে সামান্যই প্রভাবিত করা গেছে। আর ধর্ম ব্যক্তির উন্নয়ন ও সমাজের চেহারা বদলে দিতে অনেকখানি সফল হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইকবাল বলেছেন ঃ মুসলিম জাতিপুঞ্জ ঐশীবাণীর সহায়তায় এমন একটি চূড়ান্ত আদর্শের অধিকারী– যার বাণী উদ্‌গত হয় জীবনের নিগূঢ়তম গভীরতা থেকে এবং যা মুসলিম জীবনের আপাত-বহির্মুখী প্রকাশকে অন্তর্মুখী গতি দান করে। সাধারণ মুসলিমের কাছেও জীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তি এমন একটি দৃঢ় বিশ্বাসের ব্যাপার যে, তার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতেও সে দ্বিধাবোধ করে না। ইকবালের বিবেচনায় যদিও কোরআনের মুখ্য উদ্দেশ্য আল্লাহ ও বিশ্বজগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ধারণে উন্নততর চেতনাবোধ জাগ্রত করা, তারপরও কোরআন ধর্ম ও রাষ্ট্রের, নীতিশাস্ত্র ও রাজনীতির একতার প্রয়োজন অনুভব করেছে এবং একই ঐশীবাণীতে দু'য়ের স্বীকৃতি দান করেছে।

ইকবাল মনে করেন, 'ইসলামী সংস্কৃতিতে বিশ্ব-ঐক্যের ভিত্তি হলো 'তওহীদ' বা আল্লাহর একত্ববাদ। এই একত্ববাদের নীতিকে মানুষের চিন্তা ও ভাব জগতে জীবন্ত রূপ দেয়াই কার্যত ইসলামের সমাজ ও রাষ্ট্র বিধানের সবচেয়ে বড় কাজ।' ইকবাল বলেন, 'ইসলাম দাবী করে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য, কোনো সিংহাসনের প্রতি আনুগত্য নয়। আর যেহেতু আল্লাহই সমগ্র জীব জগতের আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির মূল নিদান, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বস্তুত মানুষের আপন আদর্শ-প্রকৃতির প্রতি আনুগত্যেরই নামান্তর।'

ইকবালের ধারণায় তওহীদের কার্যকরী অভিব্যক্তি হল সাম্য, সংহতি ও স্বাধীনতায়। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে রাষ্ট্র হল এই আদর্শ নীতিগুলোকে স্থান-কালীয় শক্তিতে পরিণত করার প্রচেষ্টা বা এ-সব নীতিকে নির্দিষ্ট মানবীয় অনুষ্ঠানে রূপায়িত করার আকাঙ্ক্ষা। একমাত্র এই বিশেষ অর্থেই ইসলামী রাষ্ট্রকে 'ধর্মীয়' আখ্যা দেয়া হয়। এর অর্থ এই নয় যে, 'ধরা পৃষ্ঠে আল্লাহর প্রতিভূ' বেশে কেউ এ-রাষ্ট্রের কর্ণধার থাকবেন এবং নিজের কল্পিত অভ্রান্ততার সুযোগ নিয়ে তিনি যদৃচ্ছাচরণের অধিকার ভোগ করবেন।'

ইকবালের দৃষ্টিতে, যে-কোন রাষ্ট্র যা কেবলমাত্র ব্যক্তি বা দল-বিশেষের আত্মপ্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত নয়, বরং এসব আদর্শমূলক নীতিকে কার্যে পরিণত করতে ব্যাপৃত, তাকে ধর্ম ভিত্তিক বলেই স্বীকার করতে হবে।

ইকবালের কাব্য চর্চা

আল্লামা ইকবাল নিছক কল্পনা শক্তির বাহাদুরী দেখাবার জন্য কবিতা লেখেননি। কবি হিসেবে নিজকে কখনও 'সরস কথার যোগানদার' ভাবেননি। ইকবাল নিজেই বলেছেন, এলেমেলো উটগুলোকে সুশৃঙ্খল করাই তাঁর কবিতার লক্ষ্য। বস্তুত ইকবালের কাব্য ভুবনে যাঁরা স্বচ্ছন্দ বিহারের যোগ্যতা রাখেন তাঁরা স্বীকার করবেন যে, নিজের দার্শনিক ভাবনা, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিশ্বাসকে কাব্যের আধারে সুকৌশলে ইকবাল পরিবেশন করেছেন।

তাঁর বিশ্বাস ছিলো গদ্য অপেক্ষা কবিতার ভাষায় উপস্থাপিত বক্তব্য পাঠক হৃদয়ে বেশী দাগ কাটতে এবং স্থায়ী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে। বলতে দ্বিধা নেই, 'শিক্ওআহ' এবং 'জওআব-ই-শিক্ওআহ' নামে বিখ্যাত খন্ড কাব্য লিখে ইকবাল তাঁর ধারণাকে সত্য প্রমাণ করেন।

বাংলা ভাষায় ইকবালের জীবনীকার ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর আলোচনা থেকে জানা যায় যে, ১৮৯৯ সালে ইকবাল তাঁর কবিতা 'অনাথের আর্তনাদ' লাহোরের আঞ্জুমান-ই-হিমায়াত-ই-ইসলামের বার্ষিক সভায় পাঠ করে শ্রোতাদের চোখের পানি কেড়ে নেন। পরের বছর উক্ত সংগঠনের বার্ষিক সভায় পাঠ করেন আরও একটি করুণ কবিতা 'ঈদের চাঁদের প্রতি অনাথের উক্তি'। এই সময়ের রচনায় স্বদেশ, প্রকৃতি ও মানব জীবনে দুঃখ-বেদনার প্রতিফলন বেশী করে চোখে পড়ে। 'হিমালয়', 'হিন্দুস্তাঁ হামারা', 'তারানা-ই-হিন্দী' প্রভৃতি কবিতা এই সময়ের রচনা। ইকবালের এই সময়ের কবিতায় পাশ্চাত্যের শিক্ষা এবং ইংরেজী কবিতার প্রভাব লক্ষণীয়। 'তারানা-ই-হিন্দী' বা ভারত সঙ্গীতে ইকবাল বলেন ঃ মায্হাব নেহী সিখাতা আপস মে বায়ের রাখ না, হিন্দী হাঁয় হাম, ওয়াতন হাঁয় হিন্দুস্তাঁ হামারা। অর্থাৎ ধর্ম কখনও পরস্পর শত্রুতা করতে শেখায় না; হিন্দী আমি, হিন্দুস্তান স্বদেশ আমার।

১৯০৫ সালে ইকবাল উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলেত যান এবং কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে দর্শনের ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন। ১৯০৭ সালে 'দি ডেভেলপমেন্ট অব মেটাফিজিক্স্ ইন পারসিয়া' বিষয়টি নিয়ে তিনি গবেষণা করেন জার্মানীর মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯০৮ সালে ফিরে আসেন স্বদেশে। প্রবাস জীবনে দেশী-বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা ইকবালের বুদ্ধির দীপ্তি, কথাবার্তায় যুক্তির ধার এবং কল্পনার মৌলিকত্ব দেখে মুগ্ধ হয়। ঐ সময়ে প্রখ্যাত বাঙালী শিক্ষাবিদ ডক্টর আব্দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী এবং অন্যান্য ভারতীয় মুসলিম ছাত্রদের উদ্যোগে একটি 'প্যান ইসলামিক সমিতি' গড়ে ওঠে। ইকবালও প্যান ইসলামিক ভাবধারাকে সমর্থন করেন। এই ভাবধারার সমর্থনেই ইকবাল আমৃত্যু তাঁর লেখনী চালনা করে গেছেন।

ইউরোপে অবস্থানকালে ইকবালের চেতনায় এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। প্রাচ্যের ভাববিলাসের সঙ্গে তাঁর আগেই পরিচয় ছিল। এবার তাঁর পরিচয় ঘটে ইউরোপের কর্মকুশলতার সঙ্গে। স্থবির জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন তিনি। ইউরোপের কাছ থেকে তিনি গতিশীল জীবনের পাঠ নেন। পাশ্চাত্যের শক্তিকে অনুধাবন করেন তার জ্ঞান-বিজ্ঞানে। পরবর্তীকালে একটি কবিতায় তিনি তাঁর এই অনুভবকে প্রকাশ করেছেন এভাবে ঃ পাশ্চাত্যের শক্তি বীণা ও সেতারে নয়, /বে-পর্দা মেয়েদের নাচে নয়।/ কমলমুখী যাদুকরীদের যাদুতে নয়,/ নয় সে উলঙ্গ জানুতে কিংবা চুল ছাঁটায়।/ তার শক্তি তার ধর্মহীনতায় নয়, নয় তার প্রভাব লাটিন অক্ষরের কারণে।/ ইউরোপবাসীর শক্তি জ্ঞান ও শিল্প হতে,/ এই আগুন হতেই তার প্রদীপ জ্যোতির্ময়।/ জামার ছাঁট কাটে কোনও জ্ঞান গরিমা নাই,/ পাগড়ী জ্ঞান বিজ্ঞানের বিঘ্ন নয়।

১৯১১ সালের এপ্রিলে আঞ্জুমান-ই-হিমায়াত-ই-ইসলামের বার্ষিক সভায় ইকবাল তাঁর বিখ্যাত খন্ডকাব্য 'শিকওআহ' পাঠ করেন। এই কাব্যে ইকবাল সর্বহারা মুসলিম মিল্লাতের হয়ে আল্লাহর কাছে তাঁর নালিশ, তাঁর ফরিয়াদ পেশ করেন। অমুসলিম সমাজের উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং মুসলিম সমাজের দুর্গতি, জিল্লতি প্রত্যক্ষ করে ক্ষুব্ধ, বিচলিত কবি চিত্তের এ এক ব্যতিক্রমী অভিব্যক্তি। ইকবাল বলেন ঃ নালিশ আর্জি করছে খোদা! তোমার ভক্ত বান্দা শোন;/ স্তব-স্তুতি স্বভাব যাদের, একটু তাদের নিন্দা শোন।

আল্লাহর কাছে নালিশ পেশ করতে গিয়ে ইকবাল মুসলমানদের অতীত কীর্তি,

গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা এবং অবদানের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, তার প্রতিদান হিসেবে বর্তমানে কেন এই দুর্ভোগ, দুর্দশা এবং গ্লানিকর অবস্থা মুসলমানদের ভাগ্যলিপি হয়ে দাঁড়িয়েছে? অন্যায়, পাপতো অনেকেই করছে কিন্তু শাস্তি কি শুধু মুসলমানরাই ভোগ করবে?

এই কাব্যে ইকবাল আল্লাহ্‌কে নিয়ে এতদূর স্পর্ধিত উচ্চারণ করার সাহস দেখান যে, 'কভী হাম্ সে কভী গায়রোঁ সে শনাসায়ী হায়। বাত কাহ্‌নে কী নহী- তু ভী তো হরজাঈ হায়! (কখনো আমার কখনো ওদের সঙ্গে তোমার লীলা/বলবার মতো কথা না– তুমিও বহুজন রঙ্গিলা!)

ইকবালের এই কালাপাহাড়ী কান্ডকে গোঁড়া মুসলমানরা যে খুব সুনজরে দেখেনি তা বলাই বাহুল্য। এজন্যই লিখতে হয়েছিল তাঁকে ঃ দেখেছি কত আমি অন্ধ বিশ্বাস, দেখেছি গোঁড়া মুসলিমে/ প্রতিটি ক্ষণে তাই আমার শরীরের ভিতরে মন কাঁপে হিমে।

শিকওআহ কাব্যে যদিও কবি চিত্তের প্রচন্ড ক্ষোভ এবং অভিমান ভাষা পেয়েছে তথাপি উপসংহারে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আল্লাহর দরবারে বিনীত আবেদনও রয়েছে। ইকবাল নালিশের আঙ্গিকে এই কাব্য রচনা করেছেন মূলতঃ এই প্রত্যাশায় যে, তাঁর এই করুণ আর্তি মুসলিম হৃদয়ে নব-বিশ্বাস এবং নব-জাগরণের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করবে। ভক্তের বেদনা ভারাক্রান্ত অভিযোগের জবাবও দিয়েছেন ইকবাল নিজে তাঁর জওআব-ই-শিক্‌ওআহ কাব্যে। মুসলিম নামধারীদের মিথ্যা অহমিকা ও ফাঁকা গরিমার বেলুন চুপসে গেছে সে জবাবে। নিজের দোষ অপরের ঘাড়ে চাপাবার ফন্দি ব্যর্থ করে দিয়ে মুসলমানদের আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি করেছেন ইকবাল। মুসলমানদের জন্যে কেবল পরলোকে হুরের ওয়াদা সম্পর্কিত অভিযোগের জবাবে আল্লাহর পক্ষে ইকবাল বলছেন ঃ বিধর্মী পায় হুর ও দৌলত নিলে আইন মুসলমানী। . . . কি কব হায়! দুখের কথা, কেউ তোমাদের চায় নাক হুর;/ কৈ সে মূসা? নয় ত আজো তুর পাহাড়ে ঐ দেখ নূর।

এরপর ইকবাল 'মুসলমান ধ্বংস হল' বলে যে আওয়াজ তোলা হয় এবং মুখে মুসলমান বলে যে বড়াই করা হয় তার জবাব দিতে গিয়ে বলছেন,– উঠছে আওয়াজ ধরার মাঝে ধ্বংস হল মুসলমান;/ বল্‌ব আমি, সত্যি কোথা মুসলিম ছিল বিদ্যমান! . . . সৈয়দ কিংবা মির্জা কিংবা হ'তে পার আফগানও;/ সবই তুমি হতে পার, বল তুমি মুসলমানও? এমনিভাবে নানা প্রশ্নবানে জর্জরিত করে নানা প্রশ্নের জবাব দিয়ে তিনি মুসলিম মিল্লাতের মিথ্যা অহমিকা ভেঙে দিয়ে তাদের মধ্যে আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন।

ইকবাল মূলত ব্যক্তিত্বের কবি। ইসলামের সূফীপন্থায় ব্যক্তিত্বের বিনাশ লক্ষ্য করে তিনি মানুষের মধ্যে আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটাবার জন্য লেখেন আসরার-ই-খূদী নামে তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যে ইকবাল শুধু কবি নন, শিল্পী নন– জীবনের সংগঠক। তিনি সমকালীন মুসলিম জীবনে অদৃষ্টবাদের বিস্তার দেখে, গোলামীর মানসিকতা দেখে ক্ষুব্ধ হন। তাঁর অভীষ্ট ছিল ইস্পাতের মত শক্ত এবং পরিশ্রমী মানুষ। তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন আত্মশক্তিতে বলীয়ান মানুষ। যে মানুষ অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি এবং সাহস রাখে। যে মানুষ জীবনকে সমৃদ্ধ করবার আয়োজনে সাড়া দিতে পারে। ইকবালের এই আসরার-ই-খূদীর ইংরেজী অনুবাদ করেন বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ ডঃ আর, এ, নিকলসন। এই অনুবাদের ফলে ইকবাল আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন।

এরপর ইকবাল রুমূয-ই-বেখূদী কাব্যে আত্মবিলোপের রহস্য ব্যাখ্যা করেন। ব্যষ্টি এবং সমষ্টির সম্পর্ক তথা বৃহত্তর সামাজিক মঙ্গল নিশ্চিত করবার জন্য ব্যক্তির মধ্যে আত্মোৎসর্গের মনোভাব জাগ্রত করার ইচ্ছা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইকবাল রচনা করেন এই কাব্য।

ইকবালের লক্ষ্য ছিলো মুসলমানের হৃদয়তন্ত্রীতে আবার নতুন করে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা জাগ্রত হোক, আর সে ভালবাসার অভিব্যক্তি ঘটুক সমাজের প্রতি দায়িত পালনে, মানবিকতার চর্চায়।

ইকবাল তাঁর শেষ জীবনে রচনা করেন 'জাভিদনামাহ্' বা শাশ্বতের গাঁথা। ১৯৩২ সালে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই কাব্যে ইকবাল তাঁর পীর মাওলানা রুমীকে নিয়ে গ্রহ-উপগ্রহ ভ্রমণে বের হন। এই আকাশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিলো তাঁর বিশ্বাসের সত্যতা সম্পর্কে আরও গভীর তত্ত্ব সংগ্রহ করা। 'প্রদীপ হাতে সূর্য্যের সন্ধানে' ইকবালের এই আকাশ ভ্রমণ। এই কাব্যে কার্লমার্কস থেকে মীর জাফর পর্যন্ত অনেকের সম্পর্কে তীর্যক মন্তব্য আছে। যেমন, কার্লমার্কস সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ তাঁর হৃদয় ছিলো ভক্ত আর মস্তিষ্ক ছিল পাষন্ড। পাশ্চাত্য জাতিসমূহ তাদের স্বর্গকে হারিয়ে ফেলেছে, তারা পেটের মধ্যে প্রাণের সন্ধান করে।

সিরাজুদ্দৌলার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর এবং টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক সাদিক সম্পর্কে ইকবাল বলেন, জাফর আয বাঙ্গাল ওয়া সাদিক আয দকন, নঙ্গে আদম, নঙ্গে দী, নঙ্গে ওয়াতন। অর্থাৎ বাংলার মীর জাফর আর দাক্ষিণাত্যের সাদিক/মানুষের কলঙ্ক, ধর্মের কলঙ্ক, জন্মভূমির কলঙ্ক।

জাভিদনামাহ্ কাব্যে ভাবুকদের জন্য গভীর ভাবনা-চিন্তার খোরাক রয়েছে। কল্পনার সাহসে এবং ভাবের গভীরতায় জাবিদনামাহ্ এক অসাধারণ সৃষ্টি। এই অমর কাব্যে ইকবালের বলিষ্ঠ উচ্চারণ ঃ জীবন মানেই হলো আত্মবোধে নিজকে সাজানো/নিজের সত্তার কাছে সত্য হতে চাওয়াই জীবন;/জন্মের সূত্রেই শুধু হে মানুষ আশ্চর্য মানুষ–/এসেছিলে একদিন এমন সীমার পৃথিবীতে;/ আবার জন্মেরই সূত্রে মুক্তিও সম্ভব হতে পারে/সম্ভব নিজেকে সব শৃঙ্খলের থেকে খুলে নেওয়া;/ কিন্তু সে জন্ম তো কোনো মাটিজলে বাঁধা জন্ম নয়/ সে জন্ম জেনেছে সে-ই আছে যার জীবন্ত হৃদয়।

কবি রবীন্দ্রনাথকে ইকবালের একটি কাব্যগ্রন্থ (বইটির নাম উল্লেখ করেননি) পাঠানোর কথা উল্লেখ আছে রবীন্দ্রনাথকে লেখা কবি অমিয় চক্রবর্তীর একটি চিঠিতে। চিঠিতে ইকবালের কবিতার কাব্যমূল্য বিচারের প্রয়াসও আছে। ইকবালের ইসলাম-প্রীতিকে খুব সুনজরে দেখেননি অমিয় বাবু। তবুও ইকবালের গভীর দৃষ্টি তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। ১৯৩৮ সালের ঐ চিঠিতে কবি অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথকে লেখেন ঃ "কবি ইকবালের একটি বই আপনাকে পাঠালাম। একে ব্যক্তিগতভাবে বড়োই ভালো লাগে।..... একটি মাধুর্য আছে এঁর যথার্থ বিনয়নম্র আচরণে। সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরী পন্ডিতবংশের বুদ্ধি এবং শ্রেষ্ঠ ইসলামী আভিজাত্য এক জায়গায় মিশেছে। .... মুসলিম লীগের হাওয়ায় কাব্য শুকিয়ে একরকমের ফরমাশী ইসলামী ফুল তৈরি হচ্ছে। মতামত আমাদের সঙ্গে প্রায় কোথাও একটু মেলে না। কিন্তু এও জানি উনি যাকে ইসলামী বলছেন তা ওঁর একান্ত দূরের কল্পনায় গড়া প্রতীক-অনেক খৃষ্টানও এইভাবে খৃষ্টান ইতিহাসের একটি কল্পমূর্তিকে সমস্ত সত্যের একমাত্র পরিচয় রূপে পূজা করে থাকেন। দৃষ্টিতে অন্ধপ্রায়, চলৎশক্তি রহিত, কথা বলার শক্তিও প্রায় গেছে, এই অবস্থায় মনের একটি অস্বাভাবিক সংকীর্ণ উগ্রতার মধ্যে রচনার তৃপ্তি পান। বইখানিতে যথেষ্ট গভীর দৃষ্টির সঙ্গে এই মনোবৃত্তির মিশেল দেখতে পাই। অথচ ব্যবহারে, ব্যক্তিগত যে কোন আচরণে উনি একাকী, সহজ মানুষ।" (দেশঃ ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২)

রাজনীতিক ইকবাল

আল্লামা ইকবালের জীবনের শেষ ত্রিশ বছরে (১৯০৮-১৯৩৮) বিশ্ব রাজনীতিতে এবং

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ভার্সাই সন্ধি, ভারতে রাউলাট এ্যাক্ট, জালিওআনওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড, খিলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, তুর্কিতে সাধারণতন্ত্র কায়েম ও খিলাফতের বিলোপ সাধন- এ সব ঘটনা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইকবাল অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও কোনো আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করেননি।

জানা যায়, তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধে ১৯২৬ সালে পাঞ্জাবের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য পদপ্রার্থী হন এবং নির্বাচিতও হন। পাঞ্জাব লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে তিনি কৃষক-শ্রমিকদের সমস্যা নিরসনে এবং রাজস্ব ও আয়কর বিষয়ে মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করে বেশ সুনামও অর্জন করেন। কিন্তু রাজনীতি তাঁকে প্রলুব্ধ করতে ব্যর্থ হয়। তিনি এক পর্যায়ে তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন যে, "মানুষ নিজের কোনও না কোনও স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কাউন্সিলে যায়, আমার তো কোন স্বার্থ নাই"। (ইকবালঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, পৃঃ ৩৩)। এই বক্তব্য থেকে আমরা ইকবাল মানসের একটা বিশেষ দিক সম্পর্কে ধারণা পাই। ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের উপায় হিসাবে তিনি রাজনীতিকে ব্যবহার করতে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না বলে দলীয় রাজনীতি কিংবা সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন। কিন্তু একজন শীর্ষস্থানীয় চিন্তাবিদ হিসাবে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তিনি অবশ্যই রাজনৈতিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেন। ১৯২৭ সালে তিনি সাইমন কমিশনের সামনে সাক্ষ্যদান করেন। উল্লেখ্য, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই কমিশন বয়কট করেছিলো।

১৯৩০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। সেদিন সভাপতির ভাষণে তিনি ভারতীয় রাজনীতির গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে যে বক্তব্য রাখেন তা ভারতীয় মুসলমানদের জন্য দিক-নির্দেশ হিসাবে কাজ করে। ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে তিনি লন্ডনে 'গোল টেবিল কনফারেন্সে' যোগদান করেন। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় তৎকালীন ভারতের সংবিধানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ও স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। দলীয় নেতা না হয়েও তিনি রাজনীতিতে যে নির্ধারক ভূমিকা রেখেছেন তা অনেক বড় বড় দলীয় নেতার পক্ষেও রাখা সম্ভব হয়নি। তারপরও রাজনৈতিক নেতা হবার কোনো খায়েশ ইকবালের ছিলো না। তাঁর নিজের ভাষায়, 'আমি কোনো দলের নেতা নই, কোনো নেতার অনুসরণ আমি করি না।' ইকবাল ছিলেন মূলত স্বাপ্নিক, দার্শনিক। পার্থিব বাধা-বন্ধনমুক্ত আদর্শকে তুলে ধরাই ছিলো তাঁর কাজ। আদর্শকে জীবন্ত বাস্তবে রূপায়িত করার পথ ও পন্থা নির্দেশ করা, বাস্তবের বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করে আদর্শকে রূপায়িত করার কঠিন কাজটি তিনি রেখেছিলেন রাজনৈতিক নেতার জন্য। ইকবাল নেতা বলতে বুঝতেন, 'সেইসব লোককে যাঁরা খোদায়ী দান অথবা অভিজ্ঞতা দ্বারা ইসলামের প্রাণবস্তু ও পরিণতি সম্পর্কে তীক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন এবং সেই সঙ্গে আধুনিক ইতিহাসের ধারা সম্পর্কেও যাঁদের তীক্ষ্ম অনুভূতি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এ ধরনের লোকেরাই এক একটা জাতিকে পরিচালিত করার মতো শক্তি ও যোগ্যতা রাখেন। কিন্তু তাঁরা খোদার দান, ফরমান মোতাবেক তাঁদেরকে তৈরি করা যায় না।'

রাজনৈতিক নেতা না হয়েও রাজনীতির ব্যাপারে ইকবাল কেন মনোযোগী হলেন তার ব্যাখ্যা তিনি নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, রাজনীতির মূল রয়েছে মানুষের আত্মিক জীবনের অভ্যন্তরে। এটা আমার বিশ্বাস যে, ইসলাম কোনো ব্যক্তিগত মতামতের ব্যাপার নয়। এ হচ্ছে একটি সমাজ, অথবা ইচ্ছা করলে একে আপনারা বলতে পারেন পৌর ধর্মমন্ডলী (civic church)। যেহেতু বর্তমান রাজনৈতিক আদর্শসমূহ যেভাবে ভারতে

রূপ পরিগ্রহ করছে, তাতে তার মৌলিক কাঠামো ও প্রকৃতিকে প্রভাবিত করতে পারে, তারই জন্য আমি রাজনীতির ব্যাপারে মনোযোগী হয়েছি। ইউরোপে জাতীয়তাবাদ বলতে যা বোঝায়, আমি তার বিরোধী। তার কারণ এই নয় যে, ভারতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ সাধন করা হলে তাতে মুসলিমদের বাস্তব লাভের সম্ভাবনা কম থাকবে। আমি এর বিরোধী। কারণ, আমি এর ভিতরে দেখতে পাচ্ছি নাস্তিকতামূলক জড়বাদের জীবাণু, যাকে আমি আধুনিক মানবতার পক্ষে বৃহত্তর বিপদ সম্ভাবনা বলে মনে করি।' এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইকবাল আরও বলেন, 'দেশাত্মবোধ একটি পূর্ণ স্বাভাবিক বৃত্তি এবং তার একটা বিশেষ স্থান রয়েছে মানুষের নৈতিক জীবনে। তথাপি যার জন্য প্রকৃতপক্ষে মানুষের উদ্বেগ, তা হচ্ছে মানুষের বিশ্বাস, তার সংস্কৃতি, তার ঐতিহাসিক ঐতিহ্য। আমার দৃষ্টিতে এই ক'টি জিনিসের জন্য মানুষ বেঁচে থাকতে পারে এবং এরই জন্য মৃত্যুবরণ করতে পারে, সেই ভূমিখন্ডের জন্য নয়, যার সাথে অস্থায়ীভাবে মানুষের আত্মার সংযোগ ঘটেছে।'

সাম্প্রদায়িকতা ও ইকবাল

ভারতীয় রাজনীতির এক বিশেষ সংকট সন্ধিক্ষণে আল্লামা ইকবাল তাঁর চিন্তা-ভাবনাকে সবার সামনে তুলে ধরেন। তিনি রেনান-এর ধারণাকে উদ্ধৃত করে বলেন, 'জাতির উপাদান সন্নিবেশ করার মতো নৈতিক চেতনা গড়ে তোলার জন্য যে মূল্য দেবার প্রয়োজন, ভারতের জাতিসমূহ সে মূল্য দিতে প্রস্তুত নয় সুতরাং এক ভারতীয় জাতির ঐক্য খুঁজতে হবে বহুকে অস্বীকার করার ভিতরে নয়, বরং বহুর পারস্পরিক ঐক্য ও সহযোগিতার ভিতরে। সত্যিকার রাজনীতি জ্ঞান সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না, তা যতই পীড়াদায়ক হোক। যেরূপ পরিস্থিতির অস্তিত্ব নেই, তার অস্তিত্ব কল্পনা করাই একমাত্র পন্থা নয়, বরং একমাত্র পন্থা হচ্ছে বাস্তব সত্যকে স্বীকার করা এবং তাকে আমাদের সর্বোত্তম কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা।'

অভ্যন্তরীণ একটা ঐক্যের নীতি খুঁজে বের করার চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু কেন? এ সম্পর্কে ইকবালের মূল্যায়ন হলোঃ 'সম্ভবত আমরা পরস্পরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করি। অবস্থাবিশেষে আমরা যে-সব একচেটিয়া অধিকার লাভ করেছি, পারস্পরিক সহযোগিতার উচ্চতর স্বার্থের খাতিরেও আমরা সম্ভবত তা ত্যাগ করতে পারছি না এবং আমরা আমাদের আত্মকেন্দ্রিকতাকে গোপন করছি জাতীয়তাবাদের আবরণে। বাইরে আমরা মহৎ অন্তকরণ বিশিষ্ট দেশাত্মবোধের প্রেরণা যোগাই, কিন্তু ভিতরের দিকে আমরা জাতি বা গোষ্ঠী বিশেষের মতোই সংকীর্ণমনা। সম্ভবত আমরা স্বীকার করতে চাই না যে, প্রত্যেক দলেরই তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুযায়ী অবাধ আত্মবিকাশের অধিকার রয়েছে।........ মুসলিম মন সম্পর্কে আমি যতোটা পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছি, তাতে আমার একথা ঘোষণা করতে কোনো দ্বিধা নেই যে, ভারতীয় মুসলিম তার নিজস্ব ভারতীয় আবাসভূমিতে নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারা অনুযায়ী পূর্ণ ও অবাধ আত্মবিকাশের অধিকারী, স্থায়ী সাম্প্রদায়িক মীমাংসার বুনিয়াদ হিসাবে এই সত্য স্বীকৃত হলে সে ভারতের আযাদীর জন্য তার সর্বস্ব পণ করতে প্রস্তুত থাকবে।'

এরপরই আল্লামা ইকবাল বলেন, 'প্রত্যেক দলই তার নিজস্ব ধারায় অবাধ আত্মবিকাশের অধিকারী, এই নীতি কোনো সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়। সাম্প্রদায়িতকার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। যে সম্প্রদায় অপরের প্রতি অসদিচ্ছার মনোভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত, সে নীচ ও ঘৃণার্হ। অপর সম্প্রদায়সমূহের রীতি-নীতি, কানুন, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের প্রতি আমি উচ্চতম শ্রদ্ধা পোষণ করি। এমনকি, কোরআন শরীফের শিক্ষা অনুযায়ী প্রয়োজন হলে তাদের উপাসনাগারসমূহ সংরক্ষণ করাও আমার কর্তব্য।'

অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন থেকেই আল্লামা ইকবাল নিজের সম্পর্কে পরিষ্কার ভাষায় বলেন, যে সাম্প্রদায়িক দল আমার জীবন ও আচরণের উৎস এবং যার ধর্ম, যার সাহিত্য, যার চিন্তাধারা, যার তমদ্দুন আমায় বাস্তবে রূপায়ণ করেছে এবং আমার চেতনায় যার সম্পূর্ণ অতীত এক জীবন্ত কার্যকরী উপাদান হিসাবে পুনরুজ্জীবন লাভ করেছে, সেই বিশেষ সাম্প্রদায়িক দলটিকে আমি ভালবাসি।

এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, নেহরু রিপোর্টের প্রণেতাগণও সাম্প্রদায়িকতার এই উচ্চতর বৈশিষ্ট্যের মূল্য স্বীকার করেন। সিন্ধুর পৃথকীকরণের আলোচনা করতে গিয়ে তাঁরা বলেনঃ 'কোনো সাম্প্রদায়িক প্রদেশ সৃষ্ট হওয়া উচিত নয়, জাতীয়তাবাদের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একথা বলতে যাওয়া বিশেষ ধারায় আরো ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এইরূপ বলারই সমার্থক যে, কোনো স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব থাকা উচিত নয়। এই উভয় উক্তির মধ্যেই কতকটা সত্য নিহিত রয়েছে। কিন্তু সর্বাধিক নিষ্ঠাবান আন্তর্জাতিকতাবাদীও স্বীকার করেন যে, পূর্ণতম স্বাধিকার ব্যতীত আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা অত্যধিক দুরূহ। তেমনি পূর্ণতম সাংস্কৃতিক স্বাধিকার ব্যতীত এক ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ে তোলাও হবে কঠিন, কেননা শ্রেষ্ঠতর বৈশিষ্ট্য সহকারে সাম্প্রদায়িকতার নামই হচ্ছে সংস্কৃতি।'

জওহরলাল নেহরুর আত্মচরিতে 'সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া' শীর্ষক একটি আলোচনা আছে, যেখানে ইকবালের কথাও এসেছে। উক্ত আলোচনায় বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে জওহরলাল নেহরুর সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী বক্তৃতাদানের কথা আছে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রগতিবিরোধী চরিত্রের কথা বলায় তাঁর বিরুদ্ধে হিন্দ মহাসভার নেতারা ক্ষেপে যায়। এর জবাবে নেহরু হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন। যে প্রবন্ধে তিনি দেখান, দুই পক্ষের কেউই 'খাঁটি' সাম্প্রদায়িকতাবাদী নয়; আসলে রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিরোধীরাই সাম্প্রদায়িকতার মুখোশ পরে আত্মগোপন করে আছে। নেহরু লিখছেন, ঐ প্রবন্ধ বের হবার পর কি হিন্দু কি মুসলমান কোন পক্ষ হতেই কোন জবাব এলো না। মুসলমানদের পক্ষ হতে কেবল স্যার মুহম্মদ ইকবাল দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক সম্বন্ধে আমার কয়েকটি ভ্রম সংশোধন করতে চেষ্টা করলেন। এছাড়া তিনি আমার যুক্তি সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। আমি রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলি গণপরিষদ আহবান করে মীমাংসা করা উচিত বলে ইংগিত করলাম। (আত্মচরিতঃ জওহরলাল নেহরু, পৃঃ ৩৪৫)।

ইকবাল মূলত ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃশ্যমান ও সংযোগের বিভিন্ন দিক বিবেচনায় এক 'সুসংবদ্ধ সমগ্র' গড়ে তোলার সম্ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায়, "কোনো গুরুতর বৈষম্যই তার ঐক্যকে বিপর্যস্ত করতে পারে না বরং সকল বৈষম্যকেই সে তার বুকের মধ্যে টেনে নেবে। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারার সমস্যা ছিলো, কি করে এক তার একত্ব না হারিয়ে বহুতে রূপ লাভ করবে। আজকের দিনে এই সমস্যা তার নৈতিক উচ্চতর স্তর থেকে নেমে এসেছে আমাদের রাজনৈতিক জীবনের স্থূলতর পর্যায়ে এবং আমাদেরকে এখন তার সমাধান করতে হবে তার বিপরীত ধারায়, অর্থাৎ কি করে বহু তার বহুত্বের প্রকৃতি না হারিয়ে একে পরিণত হবে।'

এক ঐক্যবদ্ধ আকাঙ্ক্ষার সুসংবদ্ধ সামগ্র্যে পৌছার জন্য আল্লামা ইকবালের আহবান ছিল এরূপ ঃ 'দলীয় স্বার্থ ও ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার উর্ধ্বে উঠুন। আপনাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কার্যকলাপ যতোই বস্তুবাদী উদ্দেশ্য প্রণোদিত হোক, আপনাদের অনুসৃত আদর্শের আলোকে তার মূল্য নির্ধারণ করতে শিখুন। বস্তু থেকে আত্মার দিকে ফিরে আসুন। বস্তু হচ্ছে অসমতা; আত্মাই আলোক, জীবন ও ঐক্য।' স্মরণীয় গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ

অর্জুনকে সাত্তিক জ্ঞান দিতে গিয়ে বলেছেন প্রাণীগণ ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু আত্মা এক।
বস্তুত আল্লামা ইকবাল ছিলেন রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও ভাবুকদের বিচক্ষণ পরামর্শদাতা ও পথ-প্রদর্শক।

উপসংহার

'তারানা-ই-হিন্দী' কবিতায় যে ইকবাল নিজকে ভারতের ফুলবাগানের এক বুলবুল বলে দাবী করলেন সেই ইকবাল আবার 'তারানা-ই-মিল্লী'তে কেন ঘোষণা করলেন ঃ চীন-ওয়া-আরব হামারা হিন্দোস্তাঁ হামারা/ মুসলিম হাঁয় হাম ওয়াতন হাঁয় সারা জাহাঁ হামারা– এ প্রশ্ন অনেকেই তুলেছেন। দেশপ্রেমের ওপরে এক ধর্মপ্রেমে উত্তরণকে স্ব-বিরোধিতা হিসেবেও অনেকে দেখেছেন। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ভাবনার সুন্দর স্বপ্নে বিভোর থাকলে ইকবালকে নিয়ে হয়তো এ জাতীয় কোনো প্রশ্ন উঠতো না। কিন্তু গোল বাধল তখন যখন তিনি সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করা আর সম্ভব নয় ভাবতে বাধ্য হলেন। ১৯৩০ সালের বিখ্যাত বক্তৃতায় ভারতবর্ষে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা হাজির করে বসলেন এবং ১৯৩৭ সালে জিন্নাহকে ব্যক্তিগত পত্রে সেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করলেন। ইকবালের বিরুদ্ধে এ কারণে একটি মহল বিরূপ। কিন্তু ইকবালের চিন্তাধারাকে গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তিনি তাঁর সময়ে একই সঙ্গে ভারতীয় এবং মুসলমান হিসেবে নিজকে উপস্থাপিত করে মোটেই স্ব-বিরোধিতার পরিচয় দেননি। তিনি আসলে একজন ভারতীয় মুসলমান হিসাবে বিশ্বের এবং ভারতবর্ষের মুসলিম সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত বাস্তব এবং আন্তরিক। কিন্তু ভারতের সংখ্যাগুরুরা ধৈর্য নিয়ে ভিন্ন কোনো সম্প্রদায়ের সমস্যাকে, বেদনাকে, আকাঙ্ক্ষাকে তলিয়ে দেখতে চাননি। নিজেদের কর্মকান্ডের প্রতিক্রিয়াকে পর্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে অনুধাবন করতে আগ্রহী হননি। আল্লামা ইকবাল যে গভীর দার্শনিক দৃষ্টি নিয়ে এসব সমস্যার মীমাংসা চেয়েছিলেন তার তাৎপর্য অনুধাবনের অক্ষমতা থেকেই সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে কলুষিত হয়েছে এবং হচ্ছে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস।
বিগত দশকগুলোতে অনেক ভাঙা-গড়া, অনেক উত্থান-পতন হয়েছে কিন্তু মূল সমস্যার স্থায়ী ও কাঙ্ক্ষিত সমাধান আজও মেলেনি। ঐক্য ও সমঝোতার লক্ষ্যে সার্কের জন্ম হলেও পারস্পরিক সন্দেহ-অবিশ্বাস ও স্বার্থের টানাপড়েনে তা বিকশিত হতে পারছে না। বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের দেশ ভারতে উগ্র হিন্দু জাতীয়তার উত্থান ঘটেছে। ভারতীয় সংবিধান, সুপ্রীম কোর্ট, মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি আজ সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও জীবনের নিরাপত্তা দিতে পারছে না। ষোড়শ শতকের ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধূলায় মিসিয়ে দেবার দৃশ্য ভারতের এবং বিশ্বের বিবেকী মানুষ তীব্র ক্ষোভের সঙ্গেই প্রত্যক্ষ করেছে। ভারতীয় রাজনীতির বর্তমান দৃশ্যপট কি ইকবালের ভাবনাকে মিথ্যা প্রমাণ করতে সক্ষম হচ্ছে? এই কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হবার সৎসাহস আজকের এই উপমহাদেশের ভাবুক সমাজের থাকা চাই।
ইকবাল শুধু সাম্প্রদায়িক সমস্যার ব্যাপারেই উদ্বিগ্ন ছিলেন না। নাস্তিকতাবাদী কমিউনিজমের বিস্তার দেখেও তিনি ইসলামের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। এই উৎকণ্ঠা থেকেই তিনি ইসলামী আইন-কানুনের ভিত্তিভূমিতে নতুনভাবে অনুসন্ধান চালাবার তাগিদ দিয়েছিলেন। আধুনিক গবেষণা পদ্ধতির সঙ্গে ইসলামী আইনবিদদের পরিচিত হবার কথা বলেছিলেন। তাঁর ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিলো, নতুন অনুসন্ধানে এমন অনেক রত্ন মিলতে পারে যার স্থায়িত্ব ও দীপ্তি ভবিষ্যতের সুষ্ঠু সমাজ গড়ার কাজে মুসলমানদের

অশেষ শক্তি, সাহস ও বিশ্বাস যোগাবে। আজ সময়ের কঠিন পরীক্ষায় কমিউনিজমের পতন শুরু হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে গেছে। বার্লিনের দেয়াল উঠে গেছে। ইতিহাসের 'স্বপ্নভঙ্গ' হয়েছে। সেই সঙ্গে মতাদর্শের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে এক অভাবনীয় শূন্যতা। এই পটভূমিতে ইকবালের মত সাহসী ও দূরদর্শী ভাবুকের চিন্তা-ভান্ডার থেকে আমরা সঠিক পরামর্শ ও পথনির্দেশ পেতে পারি।

আল্লামা ইকবাল মুসলমানদের সুন্দর ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে নিজে যেমন প্রচুর চিন্তা-ভাবনা করেছেন, তেমনি মুসলিম ভাবুকদের নতুন করে ভাবতে শেখারও প্রেরণা যুগিয়ে গেছেন। কারণ, চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত মুসলিম দেশের স্থবির ও রক্ষণশীল অবস্থা প্রত্যক্ষ করে ইকবাল শঙ্কিত বোধ করেন। তিনি ইংরেজ দার্শনিক হোবস্‌কে উদ্ধৃত করে বলেন, 'পর্যায়ক্রমে একের পর এক যে একই চিন্তা-ভাবনা তা আদতে চিন্তা-ভাবনাই নয়।' অথচ ইকবাল লক্ষ্য করেন যে, প্রায় সব মুসলিম দেশ কলের মতো পুরোনো মূল্যমান নিয়েই সব কিছুর বিচার করে চলেছে। ইকবাল তাই চেয়েছিলেন মুসলিম দেশসমূহের ভেতরে নতুন জীবন চাঞ্চল্য সৃষ্টি হোক, জীবনে পরিবর্তন আসুক, জীবন প্রসারিত হোক, নতুন নতুন আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিক, কঠিন ও জটিলতর সমস্যা সৃষ্টি হোক, প্রচলিত নীতির নবতর ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের প্রয়োজন অনুভূত হোক। চলমান জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানুষের বিচার ব্যবস্থাও এগিয়ে চলুক। মানুষের এই অবিরাম চলার পথে পূর্ব-পুরুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাঁধা না হয়ে সহায়ক হোক। ধর্ম থেকে মানুষ লাভ করুক একটি জীবন্ত ও প্রেরণাধর্মী অনুভূতি যাতে তার প্রত্যয় ও ইচ্ছা শক্তি প্রবল হয়। সীমাহীন জীবন প্রবাহের সঙ্গে সীমাবদ্ধ ব্যক্তিসত্তার সংযোগ দৃঢ়তর হয়।

ইকবাল তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতেন যে, সমস্ত সৃষ্টির ভেতর দিয়ে চলেছে এক ক্রমবিকাশমান খুদীর সুর এবং সে সুর পূর্ণতা লাভ করেছে মানুষের মধ্যে। মানুষের কাছে জগৎ শুধুমাত্র 'ধারণার মাধ্যমে দেখবার বা জানবার' বস্তু নয়; বরং বিরামহীন প্রচেষ্টায় তাকে গড়া, ভাঙা এবং পুনরায় গড়ে তুলবার বিশাল ক্ষেত্র। এর মধ্যে যেমন আছে অসীম প্রশান্তি, তেমনি রয়েছে ব্যক্তিসত্তার শ্রেষ্ঠতম পরীক্ষা।

তথ্যসূত্র

১. ইকবাল ঃ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
২. ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন ঃ ডঃ মুহম্মদ ইকবাল
৩. ঐতিহ্যের বিস্তার ঃ শঙ্খ ঘোষ
৪. পাকিস্তানের ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান
৫. আত্মচরিত ঃ জওহরলাল নেহরু
৬. ইকবাল মানস ঃ অনুবাদ সংকলন
৭. আল্লামা ইকবাল ঃ ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড, আল্লামা ইকবাল সংসদ

নবমূল্যায়নে ইকবাল

ফাহমিদ-উর-রহমান

কবিরা হলেন শব্দের কারিগর। শব্দের নিঃশব্দ তর্জনী তুলে তারা সৃষ্টি করেন ফুলের বাগান, ফলের বাগিচা, ফসলের মাঠ।

একজন কবি তার সৃষ্টি প্রতিভার কল্পলোক বিহারী স্পর্শে ভাষাকে বিদীর্ণ ও বিচিত্র প্রকাশে করেন মঞ্জরিত। তার সৃষ্টিকাজ মূলত এক মননশীলতার নদী। জীবন বিন্যাসের ছন্দ মধুর রূপায়ণে কুলু কুলু নাদে যা উধাও সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলে। কবির এই কারিগরি দৈবশক্তিজাত, অভিজ্ঞতা রসে মিশ্রিত অনন্ত এবং নিরাবয়ব। কিন্তু কোন কবির সৃষ্টিই তার চারপাশের চক্রায়িত সমালোচনার গন্ডিমুক্ত নয়। পাত্রভেদে উপভোগের রস ও প্রকৃতি ভিন্ন হতে পারে। সময়ের সৃষ্টিশীল পরিবর্তনে কবি ও কবিতার পুনর্বিচারও সম্ভব এবং সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু এতসব বিভিন্নতার মধ্যেও এমন কিছু গুণাবলী সপ্রকাশ যা সেই কবির বিশিষ্ট চারিত্র্য-লক্ষণ সূচিত করে এবং সাহিত্যের ইতিহাসে এই লক্ষণই তাকে বিশেষ ভাবমূর্তিতে প্রোজ্জ্বল করে। এই যে চারিত্র্য-লক্ষণ তা হয় দেখা দেয় কবির ভাষায় কিংবা দর্শনে অথবা শৈলীতে। এসব কিছুই অপূর্বতা ও চমৎকারিত্বে এত অভিনব হয়ে ওঠে যে, তখন মনে হয় এসব কিছুই আগে ছিল অনুপস্থিত।

ইকবাল এই মাত্রার কবি। তাঁর কবিতার শিকল ভাঙ্গা গানে শুধু উর্দু সাহিত্যের পুরনো এসরাজ ভেঙ্গে পড়েনি। বিশ্ব সাহিত্যের শান বাঁধানো পাথর ঘাটায় নতুন দিনের সানাইও বেজে উঠেছে। এই যে কবি ইকবাল মর্মের আলোয় যিনি চোখ ফিরিয়েছেন বিশ্বাশ্রিত সত্যে। নিস্তরংগ ক্লৈব্যের মধ্যেও যিনি এনেছেন পুষ্প পত্রের ইশারা, যুগ ও রুচির অতি অনিবার্য রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে তারও কবিতা পুনর্বিচারের দাবীদার। কবির সাথে তার কবিতার অভেদ্যতা, কবির সাথে তার সমাজের নিবিষ্ট সংলগ্নতাই কাম্য। জীবনশিল্পী ইকবালের.জীবন ও তাঁকে পরিবৃত মানুষ, সমাজ ও ধর্মের অবিচ্ছিন্নতা প্রচন্ডভাবে স্ফুটনোন্মুখ, ইকবাল কবিতায় আপন বিশ্বাসের উচ্চারণ ঘটিয়েছেন, প্রমুক্ত আলোতে গোচরীভূত হবে সে বিশ্বাস ছাপিয়ে তাঁর চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে কেমন মিলিত হয়েছে সাধারণ নিষ্পেষিত মানুষ পরিণতিতে জীবনবাদী এই কবির অন্তর্গত সত্তায় অস্তিত্ব লাভ করেছে অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ কালের প্রবাহে মুক্ত ও মমতাময়ী জীবনের জ্যোৎস্না। একথা সত্য, ইকবালের কবিতার শৈলী, দর্শন ও বিশ্বাসের বিস্তার অতি সংহত। মানবীয় উপাদান ও সৃষ্টিধারায় পরিপূর্ণ।

এতদসত্ত্বেও তার কবিতার প্রতি কোন কোন সমালোচকের খন্ডিত বিচার তার প্রতি নির্বিবেচক দৃষ্টিভঙ্গির ফসল ছাড়া আর কি হতে পারে! এটা সম্ভবত তার সমালোচকরা তাকে বুঝতে

ভুল করেছেন কিংবা তার প্রতি নিরপেক্ষতার দৃষ্টি কবুল করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। ইকবালের সৃষ্টিধারায় এমনি যে অনাকাঙ্ক্ষিত কতগুলো ভাসমান শ্যাওলা জমা হয়েছে তার আশু বিদূরণ একান্ত প্রয়োজন। আর এটাই হবে ইকবালের পুনর্মূল্যায়নের একটি প্রধান মৌলিক দিক। ইকবাল কাব্য বিবেচনায় এই অশুভ ও ক্লেদপূর্ণ বৃত্তের একটি তালিকা দিচ্ছি।

১. বাংলাদেশের পটভূমিতে ইকবালের উপযোগিতাঃ বিষয়টি মীমাংসিত হলেও বিতর্কের উদ্ভব বাংলাদেশের অভ্যুদয়কালে। রাজনৈতিক বৈরিতার রাহু ইকবাল চর্চার শুভাশুভ দিগন্তে প্রসারিত এবং পাকিস্তানের সাথে আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ভাঙনের মওসুমে সুযোগ অন্বেষণকারী আত্মবিক্রিত সুবিধাবাদীরা এই মূঢ়তার সংক্রান্তি নির্গমন করেছেন। জ্ঞানী, ধ্যানী ও বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি ইকবালের পরিচয় ও প্রভাব বিমলিন হবার নয় এবং বাংলাদেশে ইকবাল আছেন ঘরে ঘরে, প্রাণে প্রাণে। তাঁর কালাম, স্মৃতি ও শিক্ষার আলো হৃদয়বীণায় সুর ছড়িয়ে চলেছে অহর্নিশ।

২. ইকবাল কাব্যে প্রগতিশীলতাঃ ইকবাল কি প্রগতিশীল কবি! তার কাব্যের শরীরে এই নৈর্ব্যক্তিক দুনীরিক্ষ বিশেষণ আরোপ করা কি যথার্থ, যিনি জীবনকে দেখেছেন বহু বিচিত্রতায়, গতিময়তার একটি ফুল্ল ফসলরূপে। উচ্চ মানবিক ও ধ্যানশীলিত উপলব্ধির মসৃণ মখমল হলো তাঁর কবিতা– জীবনাচরণের বহু প্রসারী দিগন্তের রূপালী কারুকাজ খেলা করেছে তাঁর কবিতার শরীরে। অতি প্রগতির ভন্ডামি থেকে তাই তাঁর কবিতা অনিবার্যভাবে মুক্ত।

৩. ইকবালের ইসলামী মোহাচ্ছন্নতাঃ বলা হয়ে থাকে ইকবাল এই এক মোহাচ্ছন্নতায়, এই এক যাপিত বিশ্বাসে কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কবিতায় দেশ, মানুষ তার সমস্যা লুপ্ত। যেখানে ইসলামের পৃথিবী বড় বেশি উচ্চকণ্ঠ ও কোলাহলময়। এর তাৎপর্য অনির্ণিত নয়, কারণ ইকবাল দেশকে ভালবেসেছেন কিন্তু দেশের পূজাকে ঘৃণা করেছেন। আরও একটি দিক লক্ষণীয়, এ অঞ্চলে নাস্তির ধারণা যত বেশি ব্যাপ্ত হয়েছে ইকবাল তত সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন। কারণ ধর্মকে যারা ঘৃণা করেন, যারা মনে করেন ধর্ম হল মধ্যযুগীয় পাপ তাদের কাছে ইকবাল কতটুকু গ্রহণযোগ্য সেটি প্রশ্নসাপেক্ষ। কিন্তু পোড়াবারুদ আর কাস্তের অনুবর্তীরা একটি জিনিস বিস্মৃত হন, পৃথিবীতে ধর্মই মানুষের প্রথম মানবিকতার শিক্ষক আর ইকবালের কাছে ইসলামের এই তাৎপর্যই অধিকতর প্রাণময় ও গতিসঞ্চারী (Living and dynamic)। আরও একটি দিক ভাববার আছেঃ সাহিত্যের যদি জাতপাত না থাকে আর ধর্মকে নিয়ে যদি বিশ্বের সেরা সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে তবে ইকবাল কেন উপেক্ষণীয় হবেন?

২

পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা বলে ইকবালের পরিচিতি সত্য হলেও অপ্রসারী। প্রকৃত অর্থে মুসলিম ভারতের দ্রষ্টা কবি তিনি এবং একই কারণে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বেরও ইংগিতদাতা

তিনি। ইকবালের বিপক্ষে প্রচারণাকারীরা বলে থাকেনঃ ১৯৩০ সালে এলাহাবাদের মুসলিম লীগ অধিবেশনে দেয়া তার বক্তৃতায় উল্লেখিত মুসলিম ভারত পরিকল্পনায় সুদূর বাংলাদেশের কোন ইশারা নেই।

এটি একটি নির্বিবেচক প্রলাপ। কবি যখন এই ধারণা ব্যক্ত করেন তখন সমগ্র ভারতে এটি প্রায় সুদূরপরাহত চিন্তা এবং ভারতে মুসলিম অস্তিত্বের জন্য কওমের নেতৃত্বের কাছে তিনি এই প্রস্তাবনা করেছিলেন মাত্র। এলাহাবাদের দেয়া তাঁর বক্তৃতায় ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত পাঁচটি প্রদেশ সমন্বয়ে যে রাষ্ট্রটির ধারণা তিনি দিয়েছিলেন তা ছিল পারস্পরিক সাহচর্যে সংগ্রথিত একটি অঞ্চল এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির নিবিড়তা লাভকারী। ইকবাল হয়ত ভেবে থাকবেন যুগপৎভাবে মুসলিম কওমিয়াৎ ও ওয়াতানিয়াৎ হিসেবে এ অঞ্চলটির অভ্যুদয় সহজতর হবে। কিন্তু সেই পরিপ্রেক্ষিত ও পটভূমি বিচার করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশ ছিল একটি বিচ্ছিন্ন একক মুসলিম জনপদ, যার পক্ষে স্বাধীন ও সার্বভৌম হিসেবে অস্তিত্ব লাভ সম্ভব হলেও সহজ নয় মোটেও। ধারণা করতে পারি, কবির কাছে বাংলাদেশ তাই তখনকার মত ছিল অনুচ্চারিত। কিন্তু স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ধারণা যত এগিয়ে এল এবং একই সূত্রে কবিও যত বেশি ভাবতে লাগলেন তখন তিনি লিখলেন সেই ঐতিহাসিক চিঠি–কায়েদে আযমের কাছে মৃত্যুর আগে ব্যক্ত কবির বাংলাদেশ ভাবনা যা লাহোর প্রস্তাব গ্রহণেরও তিন বছর আগে দেয়া–

"শিমালে মাগরেবী হিন্দুস্তান আওর বাঙ্গাল কো হিন্দ আওর বেরুনে হিন্দ কি দোসরী আকওয়াম কি তারাহ হক্কে খোদ এখতিয়ারী সে কেঁউ কর মাহরুম কিয়া জা সেকতা হায়।"

এই যে কবির অভিব্যক্তি যা শুধু ভারতের উত্তর-পশ্চিম কিংবা পূবীয় মুসলমানদের জন্যই সঞ্চিত রইল না সারা দুনিয়ার অধিকারহারা মুসলমানের জন্যই উজ্জীবিত হয়ে উঠল। বাঙ্গালী মুসলমান কবির মনোভাবনায় স্থান পায়নি–একথা তাই সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য বিবেচনা করা যেতে পারে।

ইকবালের সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগও এই পটভূমিতে। বাঙ্গালী মুসলমানের জাতি হিসেবে স্বকীয়তার সাধনা যখন চলছে, আত্মপরিচিতি ও আত্মআবিষ্কারের মর্মজ্বালা যখন তাদের ধমনীতে রক্তের ফোয়ারা তুলেছে ইকবাল তখন এলেন জীবন জাগার নতুন কাসিদা হাতে। ইকবালের সাথে আমাদের ভাষার দূরত্ব, রুচির দূরত্ব এমনকি ভূগোলের দূরত্বও অনেকখানি। এতদসত্ত্বেও ভাববার মত একটা বিষয়, তাকে আমাদের কখনো দূরের মনে হয়নি; দূরাগত অপসৃত তো নয়ই।

ইকবাল কাব্যে বিশ্বাসের জ্বালা আছে, ধর্মের স্থির সত্যের যে প্রশান্ত নিরাবরণ প্রকাশ ঘটেছে তা আমাদের অনুভূতিতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে এবং ইতিহাসের একটি ক্রান্তিকালে রূপান্তরকালীন সময়ে জাতি হিসেবে আমাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার শক্তি যুগিয়েছে।

এ কথা কারো অপরিজ্ঞাত নয়, ভারত বিভাগের ফলশ্রুতিই বাংলাদেশ এবং এই যে বিভাগ–ইতিহাসে যা রক্তরাঙা হিসেবেই চিহ্নিত, এর মূলে শুধু একটি রাজনৈতিক বিবাদই ক্রিয়াশীল ছিল না, একটি প্রায় সমুচ্চারিত সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বও ছিল অন্যতম প্রধান কার্যকারণ। ১৯৩০ সালের মুসলিম লীগ অধিবেশনে ইকবাল যে দ্বিজাতিতত্ত্বের তথ্য প্রকাশ করলেন তাই ছিল ভারত বিভাগের অংকুর এবং উপমহাদেশে মুসলমানদের স্বাজাত্যবোধের উন্মেষ আর মুসলিম সভ্যতার পুনরুত্থানের আকাঙক্ষার দলিল।

এই যে দ্বিজাতিতত্ত্ব, এর পরিণাম ও লাভালাভের খতিয়ান হয়ত বিচার্য হতে পারে বিভিন্ন বলয় থেকে। ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক ও প্রকরণে, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী এই ঐতিহাসিক সচেতনতা, ভারতীয় মুসলমানের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে অন্য এক জাতীয় ঐক্য ও তত্ত্বের মধ্যে মুক্তির প্রশ্রয় খোঁজা। বাঙালী মুসলমানের নির্যাতিত মনকেও একদিন কম্পমান করেছিল। বিহবল বাঙ্গালী মুসলমানদের জাগরণ প্রত্যাশায় এই ঐতিহ্যিক অনুপ্রেরণা। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ তাদের স্বকীয়তা ও স্বস্থতা ফিরিয়ে আনবার সাধনায় ব্রতী হয়েছিল। আজ যদি বাংলাদেশ ইতিহাসের এই ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে কিংবা এই পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ফলশ্রুতি আহরণে পুরোপুরি ব্যর্থ হয় তবে তার ঠিকানা নির্দিষ্ট হবে এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে। বিভাগ–পূর্ব কংগ্রেসের সেক্যুলার আইডিয়া কিংবা আকবর ও কবীরের এ্যাসিমিলেটিভ কালচারের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের উপস্থিতি নেই। নেহরু ও গান্ধী যে ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন তার চিত্র আজ স্পষ্ট অনার্য দলিত হিংসায় উন্মত্ত বর্ণাশ্রিত ভারত। ইকবাল তাই বাস্তব বুদ্ধির খাতিরে প্রচলিত অবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ভারতের কোন ধর্মাবলম্বী যখন আপন বিশ্বাস ও আদর্শের স্খলন ঘটাতে রাজি নয় তখন বৃহত্তর পরিবেশে সম্মিলিত ভারতীয় হবার আকাঙক্ষা অলীক স্বপ্নমাত্র। ইকবালের পথ ধরে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব তাই শুধু একটি রাষ্ট্রনৈতিক পরিকল্পনা নয়, আদর্শিক পরিকল্পনাও বটে। প্রস্তাবে উল্লেখিত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে ভিন্ন ভিন্ন INDEPENDENT STATES -এর উল্লেখ রয়েছে বাংলাদেশ তারই একটি। কবি ইকবালের এই বিপ্লবী আইডিয়া বাঙ্গালী মুসলিম জনগোষ্ঠীর জীবনে ক্রিয়া করেছিল এবং তার জাতীয়তাবাদী ধ্যান–ধারণা এবং ইসলামী সংস্কৃতি বিষয়ক চিন্তা–ভাবনা ও কবিকৃতি শুধু বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছিল তা–ই নয়; স্বকীয়তা ও আত্মবিকাশের পথে এগিয়ে দিয়েছিল বহুদূর।

ইসলামের জীবনী শক্তিতে বিশ্বাসী ইকবাল মুসলমানদেরকে ইসলামের সারবান সত্য ও কোরআনের অমোঘ বাণীর অনুসরণ করবার কথা বলেছেন। আহবান করেছেন তিনি—মুস্তফার প্রতি যিনি ভালবাসা পোষণ করেন ভূভাগ ও জলভাগ তার আস্তিনে জড়ানো। আযাদ বাংলাদেশের পটভূমিতে ইকবালের উপযোগিতা বোধহয় এখানেই।

আধুনিক ইতিহাসে ইসলামী আদর্শের প্রেক্ষিতে ভারত বিভাগ ও স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন একটি বিরলপ্রভা বিপ্লবী ঘটনা যা থেকে বাংলাদেশ কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন থাকেনি। তেমনি জাতিগঠনে ধর্ম যে অতি আবশ্যিক উপাদান–এ কথাও ইকবাল জোরের সাথে বলেছেন। অতি অনিবার্যভাবে বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনে ও মননে ইসলাম তার অঙ্গীকার ও প্রত্যয় নিয়েই উন্মেষিত। ইসলামেই সমাহিত তার অনুভব, আকুতি, ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার। বাংলাদেশে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ও প্রেরণার দীর্ঘ মিছিলে বুদ্ধিবাদী ইকবালের আহবান তাই সমভাবে ক্রিয়াশীল। অতীতের মত বাঙালী মুসলমানের ভবিষ্যৎ পথ নির্মাণেও ইসলামী আদর্শ হবে তার তেজের তলোয়ার এবং চারিদিকের অপ্রেম ও নির্মানবিকতার প্রত্যুত্তর। ইকবাল এই বিপ্লবের কান্ডারী এবং সেই সূত্রে বাঙ্গালী মুসলমানের এই বিপ্লববাদেরও অগ্রনায়ক।

৩

ইকবালকে যখন প্রগতির বিপক্ষে দাঁড় করানো হয় তখন স্বাভাবিকভাবে প্রগতিশীলতার সমর্থক মহিমা আমাদের কাছে ম্লান মনে হয়। জীবনের বহু বিচিত্র এবং অনন্ত সৃষ্টিশীলতার ভাষ্যকার যে কবি তার মনন ও ঋদ্ধচিত্তের তৃতীয় স্তরে বসে নব আবিষ্কারের নেশা আমাদেরকে স্পর্শ করে।

এটা বলা অসঙ্গত হবে না, ইকবাল আজ দ্বিমুখী সমস্যার সম্মুখীন। তাঁর ভক্তের সংখ্যা যেমন সুপ্রচুর, তেমন তার অপরিণত সমালোচকের সংখ্যাও নগণ্য নয়। ইকবালের দুর্ভাগ্য তাঁর ধ্যান ঋদ্ধ মননের কাছাকাছি আবেগ নিরাসক্ত খাঁটি সমঝদারের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল অন্ধ ভক্ত যারা সর্বতোভাবে প্রগতির বিপক্ষে এবং নতুন সৃষ্টি ও নির্মাণেরও বিরোধী সচেতন কিংবা অবচেতন অস্তিত্বে কবির বাণীর তাৎপর্য ও গতিময়তাকে স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সংকীর্ণতার চোরাগলিতে ঠেলে দিচ্ছে, অন্যদিকে একশ্রেণীর প্রগতিজীবী উন্যাসিক বুদ্ধিবাদীর দল তাঁকে চিহ্নিত করেছে প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে। তাদের বিবেচনায় ইকবালের কবিতা পলায়নী মনোবৃত্তিসম্পন্ন (POETRY OF ESCAPE)। ধরে নেয়ার যথেষ্ট কারণ আছে তারা তাদের এই অভিযোগ উথাপন করেছেন কবির বিশিষ্ট চিন্তার অনুসৃতি থেকে। তাদের ধারণা, ইকবাল এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের কবি এবং তার কবিতা সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বিরচিত হওয়ার পরিবর্তে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্যই নিবেদিত হয়েছে। তিনি এমন এক সংস্কৃতির পুনরাবর্তন করেছেন যা ইতিহাসের গর্তে চাপা পড়ে আছে। পাশাপাশি তিনি তার সম্প্রদায়ের এমনকি বিশ্ব মানবেরও কল্যাণ প্রার্থনা করেছেন এমন এক গ্রন্থে যা মধ্যযুগীয় ধূলায় পরিকীর্ণ।

দুই দিগন্তের দুই বিপরীত বলয়ের পরিচালিত বৈরিতা থেকে এই মহান কবিকে মুক্ত রাখতে হলে প্রয়োজন তার জীবন দৃষ্টি ও জীবন ভাবনার সুনির্দিষ্ট মূল্যায়ন, পাশাপাশি আধুনিক সমস্যা

ও সংক্রান্তির প্রেক্ষিতে তার দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্বিচার। কিন্তু এর চাইতেও যেটি সবচেয়ে জরুরী তা হলো প্রগতির একটি সংজ্ঞা নিরূপণ যার সাম্যাবস্থা তর্কাতীত। ভাবলেশহীন সর্বপ্রকার আবেগের অতীত যে প্রেক্ষিত ও মানদন্ডে আমরা এই মহান কবি, ঋষি ও ধ্যানীকে বিবেচনায় আনতে পারি। স্বীকার করবার উপায় নেই এটি একটি কঠিন প্রক্রিয়া এবং প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ বিশ্বাস ও প্রতীতিকে প্রগতিশীল বলে দাবি করতে পারে এবং তার বিশ্বাসের বলয় বহির্ভূত যারা তাদেরকে প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে চিহ্নিত করাই স্বাভাবিক। একজন আধুনিক ইকবাল গবেষকের মতে প্রগতির জন্য প্রয়োজন তিনটি বৈশিষ্ট্যের–

........the three qualities which genuine ~Progressivism~ Postulates-a faith in the ultimale goodness of human nature and the Consequent belief that life is worth living and striving for; a breadth of outlook and sympathy which refuses to be bound by racial, geagraphical and sectarian differences and an active identification of the self with the Causes of social justice and a willingness to strive for them to the best of ones ability,

(Progressive trends in Iqbal's thought -K.G. Saiyidain)

প্রগতিবাদী হবে সে–ই যার মননের প্রসারতা ও অনুভূতির প্রাবল্যে ধরা দেবে সমাজ ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সমস্যা ও বিচ্যুতি। প্রগতির স্বার্থে ব্যক্তির সংকীর্ণ প্রাকারবদ্ধ চেতনার অন্তর্ধানই আবশ্যক। কিন্তু অবশ্যই সেটি যেন পরিণত না হয় কাগুজে দর্শনে (VISUALIZATION) কিংবা মানবিকতায়। উপরন্তু শেষ বিচারে বিস্রস্ত মানুষের দুঃখ সুখের সমভাগী হওয়াই বড় কথা এবং তাদের প্রয়োজনে দ্রুত উৎকর্ষিত সাড়া ও সেবা প্রদানের মধ্যে তার অন্তর্গত চেতনা ও কল্যাণকামিতার একটি প্রোজ্জ্বল রূপ পরিগ্রহ করবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, এই প্রসারী মনন ও জীবনানুভূতি যেন কোনক্রমেই বাধাগ্রস্ত না হয় সম্প্রদায়ের কিংবা ভূখন্ডের বেড়াজালে; বরং মানবিকতার এই পরিচর্যা চলবে বিশ্বজুড়ে বাধাহীন নির্মোহ স্রোতের কুলুকুলু ধ্বনি তুলে। প্রগতি মানেই এক অর্থে মননের চর্চা। কল্যাণকামিতার মেলবন্ধন। (ALL true Progress is a Progress in Charity) যদি তা–ই হয় প্রগতিবাদী হবেন সেই নগরের অধিবাসী যার তোরণদ্বারে প্রবেশাধিকার তাদের জন্যই সীমাবদ্ধঃ সংস্কৃত ঋদ্ধ। দরাজ দস্ত ও মুক্ত প্রসারী জীবনের উদ্বন্ধন যাদের লক্ষ্য। স্বীকার করি, পৃথিবীর নানা স্থানে চলছে নানা রকম গতিবিন্যাস, প্রগতির ভিন্ন ভিন্ন উৎকর্ষ সাধন। উৎপাদনের অগ্রগতি, বিজ্ঞানের দ্রুতগতি এবং মারণাস্ত্রের অশেষ গতি ও প্রগতির নানা রূপ ও প্রকৃতি বটে, কিন্তু তাতে আছে নির্মানবিকতার সারমেয় যার প্রসারী দন্ত মানবতার জমিনে খুন ও অশ্রুর ক্রীড়া কেলিতেই উল্লাসী। যদি কোন দিন (এবং ইতিহাসে যার উপমা ভূরি ভূরি) এমনি ক্রুর পিশাচের হাতে ন্যস্ত

হয় ক্ষমতা। পৃথিবীর গতি যদি টেনে ধরে অজান্তেই তাহলে সেদিন আবার দেখব বৈজ্ঞানিক কারুকার্য–যা আধুনিক সভ্যতার অবলম্বন তাহবে মানবতার অশ্রু ও কারুণ্যের নিষ্প্রাণ ছবি। সত্য বটে, প্রযুক্তি যদি মানবিকতার চর্চা ব্যতীত অনিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে তবে তা বিশ্বমানসের জন্য বিষবৃক্ষের ফল উৎপাদন ব্যতীত আর কি করতে পারে। অনিবার্যভাবে প্রগতির দাবিদার যে কেউই হোক না কেন তাকে এই প্রসারী জীবনবোধের অঙ্গীকার করতে হবে। প্রয়োজন হবে তার কল্যাণ–কামিতার অনুজ্জ্বল দীপালোকিত ঘর উজ্জ্বল দীপমালায় সজ্জিত করা এবং সেই ঘরে ভূগোলের বন্ধনছিন্ন বিশ্বজনীনতার উদার হাওয়া প্রবেশ করানো। প্রগতির বিপক্ষে ক্রিয়াশীল শক্তি হচ্ছে অনুদার, সংকীর্ণ চিত্ত দৃষ্টিহীন জীবনবোধ। গোষ্ঠীপ্রীতি আর সহিষ্ণুতা বর্জিত মূল্যমান এক কথায় যা কিছু বিভাজিত, খন্ড খন্ড করে মানবতাকে পরিণতিতে হিংসায় উন্মত্ত। সাংঘর্ষিক চিত্রমালায় পরিপূর্ণ এক পৃথিবীর চেহারা প্রকটিত করে আমাদের সামনে। অন্যদিকে যে শক্তির অপূর্বলীলা ও কারুকার্যে গতিময়তা ও আন্দোলনের প্রানদ আচড়ে প্রসারিত হয় জীবন ভাবনা, ভেঙ্গে পড়ে সংস্কার ও বুদ্ধিহীনতার দেয়াল এবং চিরায়ত মানবিক ক্রিয়াকর্মের হয় উজ্জীবন আমরা বলতে পারি তাই ঋদ্ধ সংস্কৃতি ও প্রগতিবাদীতার ঠাসবুনুনীর রসদ যোগায়। মানবতার জন্য আল্লাহর এই অনন্ত কল্যাণ–কামিতার (Purpose of God for man) বিপক্ষে দাঁড়াবার মত বড় কোন অপরাধ এ বিশ্বে নেই।

প্রগতিবাদীর এই কেন্দ্রীয় অনুভব ও অনুসিদ্ধান্তের পাশাপাশি প্রয়োজন সামাজিক ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জেহাদ পরিচালনা করা। মানবতার ইতিহাস দুঃখ বিস্রস্ত, বেদনা করুণ নৈরাজিক রক্তধারায় পরিপূর্ণ। সেই দুঃখ স্রোতের মোকাবেলায় এ যাবৎ চলছে শুধু সীমাহীন তিতিক্ষার পরীক্ষা, সমাজকর্মী, ধর্মনেতা ও রাজনৈতিক যোদ্ধা একযোগে, একধ্যানে এগিয়ে চলেছেন মজলুমের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায়; ইনসাফের মেঘমুক্ত নির্মল আকাশের সন্নিধানে। কিন্তু তবুও এ পীড়ন রুদ্ধ হয়নি। ধনী শোষণ করছে গরীবকে, পুরুষ নারীকে, অত্যাচারের স্টীমরোলার আছে অধিকতর শক্তিশালী পীড়ক জাতির হাতে কিভাবে গরীব দুর্বল জাতিসমূহকে ধূলি মাটিতে নিঃশেষ করে দেয়া যায়। বড় বড় যুদ্ধ যা ইতিহাসে খুন ও অশ্রুর দরিয়া সৃষ্টি করেছে মাত্র তার উদ্দেশ্য শুধু মানবতার বিশেষ অংশের স্বাধীনতা হরণ। ধর্ম যুদ্ধ বিভিন্ন সময়ে যা খোদা প্রেমের নামে নিছক মানবপীড়নের রাহুগ্রস্ত বরকন্দাজ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সেকালের দাসপ্রথা একালের শ্রেণী সংগ্রাম যা কি–না পুঁজিবাদী নৈরাজ্যের বিষফল এবং সম্পদ কুক্ষীগতকরণের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া–এসব কিছুই ইতিহাসে বেইনসাফী ও জুলুমের এক সামাজিক মুখ ব্যাদান করে আছে। আশার কথা এই, সামাজিক দানবের মোকাবেলায় যুগে যুগে আমরা কল্যাণ–কামিতার বহুপ্রসারী মননেরও প্রশ্রয় পেয়েছি এবং তারা সেই ক্ষুদ্র জনতা যারা জুলুম ও বেইনসাফীর বিরুদ্ধে ক্ষুরধার তরবারী শাণিত করেছেন। যে কোন অর্থেই তাদেরকে আমরা প্রকৃত প্রগতিবাদী হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। আধুনিকতার বেদনাবিধুর অনালোকিত দিকটি বোধ হয় এখানেইঃ কারিগরী ও বাণিজ্যিক প্রসার এবং স্ফীতির সাথে

কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারী বিশেষ গোষ্ঠী ও ব্যক্তির অভ্যুদয় ঘটেছে যাদের কারণে পৃথিবী আজ বিভাজিত। ধনী ও দরিদ্রে, শোষক ও শোষিতে। তাই প্রগতিবাদীর নিশ্চিত লক্ষণ হচ্ছে মরিচা ধরা, জুলুমবাজ সামাজিক গঠন কাঠামো উপড়ে ফেলে নতুন পৃথিবী নির্মাণের প্রতিভূ হওয়া।

সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য যা প্রগতিবাদীর চারিত্র্যবিন্যাস ও উপস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে তা হলঃ এক অনির্বাণ বিশ্বাসের দাবদাহন যা শুধু তাকেই পীড়ন করে না। তার থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি সমাজের প্রতিকেন্দ্রে, জীবনের প্রতি স্পন্দনে আগুন ধরিয়ে দেয়। জীবনে বিশ্বাস, মানুষে বিশ্বাস, মানুষের অনন্ত কল্যাণ সম্ভাবনায় বিশ্বাস এবং তারই পাশে মিথ্যা আর জালজুয়াচুরির উপর সত্য ও ন্যায়ের চিরদিনের বিজয়ে আশাবাদ পোষণ করাই হল প্রগতিবাদীর মর্মরিত অনুভব ও অনুধ্যান। এ বিশ্বাস নৈর্বক্তিক নয়। নৈরাশ্যবাদীর দুর্নীরিক্ষ কুয়াশাচ্ছন্ন আশাবাদও নয়, জীবনের তাপদগ্ধ মসলিনের আলোতে দেখা বর্ণমুখর গন্ধমুখর চিত্রাবলী। প্রগতিবাদীর নেই সংশয়। মরুরূক্ষ কাঠিন্য আর দানবিক পেলবতা নিয়ে যে জীবনের বাস্তবতা তাতেও নেই উপেক্ষা। বিশ্বাস তার এমনি প্রকটিত জীবনের গভীরতা ও উত্তাপের আশ্লেষে তা এমনই অজেয়, নৈরাশ্য ও বেদনার কাদাজল। অবহেলা আর অশ্রুর দরিয়া পার হয়ে যায় সে নিমেষে। প্রগতির এই বহু পল্লবিত বৃক্ষ শাখার তলে দাঁড়িয়ে আমরা এখন নির্মাণ করব ইকবালের সৌরভীকুঞ্জ।

৪

ইকবাল কাব্যের মর্মরিত বীণায় কিসের ছন্দ বেজে উঠেছে। কবিতা যদি হয় ভাষার ভিন্নতার বিন্যাস এবং সেই বিন্যাসের নিভৃতে যদি থাকে জীবনের অবিচ্ছিন্ন অসীমতা এবং অনন্ত উৎসের অবগাহন তবে ইকবালের পুনর্বিচারের ক্ষেত্রে এই পটভূমি অবশ্যই স্মরণীয়, কারণ এর মধ্যে যথার্থ পরিমাপের লক্ষণাবলী উপস্থিত, কবিতার মধ্যে মানুষ খুঁজে পায় তারই অন্তর্গত সত্য, তার দুঃখ-বেদনা, জয়-পরাজয়, আশা-নিরাশার ইতিবৃত্ত। এক যুগে লোক কবিতার গজদন্ত মিনারে উঠে জীবনবিচ্ছিন্ন আনন্দলোকের সৃষ্টি করত; সেই পৃথিবীতে প্রবেশাধিকার ছিল না পীড়িত মানবতার। মানব সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে। জাতির সাংস্কৃতিক ও রুচিবোধের রূপান্তরের স্রোতে সে যুগ হয়েছে বাসী। যে যুগের কবি ও কবিতার পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্বিন্যাস করার জন্য নতুন প্রস্তাব এসেছে এবং বর্তমান প্রজন্মে কবিতার নিরীক্ষণ শুরু হয়েছে নতুনভাবে। কবিতা আজ মানুষের কণ্ঠলগ্না প্রেয়সী, জীবন জীবিকার সংগ্রামে ক্ষুধা ও প্রেমের নিয়তবাহী ঝড়ে কবিতা এক ঝলমলে প্রোটেট।

এ কথা সত্য কবি তার কবিতা সৃষ্টি করেন মনের গহীনে। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন প্রত্যক্ষভাবে তিনি যে সমাজের অংশীদার তার থেকে। কবির কবিতা তার সমাজের

বিচিত্র বৈশিষ্ট্য ও রূপ প্রকাশ করবে–এটাই স্বাভাবিক। লিখন শৈলীর অফুরন্ত সমৃদ্ধির সাথে জাতির একটি সাধারণ প্রবাহ তাতে ফুটে উঠবে। তবে মহৎ কবির শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণিত হবে তার কবিতার আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে। ক্ষুদ্রতাকে অভিমুখীন করতে হবে উৎকর্ষিত জীবন বৃক্ষের দিকে, জাতিগত লাঞ্ছনা ও সংগ্রামের ইতিবৃত্ত দুঃখ–সুখ আর আবেগের স্রোতধারা প্রবাহিত করতে হবে বৃহত্তর মানব সংস্কৃতির সাগর সঙ্গমের দিকে এবং তিনি যদি এই কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন সাফল্যের সাথে, স্বীকৃত হবেন তিনি মহৎ জীবনবাদী কবি হিসেবে। প্রগতিবাদী কবির অঙ্গীকার বোধ হয় এখানেই। নিছক সৌন্দর্য তাত্ত্বিক উপলব্ধি নয়। জীবনবাদী বিশ্বাসের অনুসৃতি হবে তার কাম্য। পৃথিবীর দেশে দেশে যেখানে জুলুম ও বেইনসাফীর ওঙ্কার উচ্চারণ ধ্বনিত হবে কবি ছুটবেন সেই দেশে ভূগোলের সীমানা পেরিয়ে মানবতার এই লাঞ্ছনায় তিনিও শরীক হবেন প্রতিবাদের মিছিলে। নির্মানবিকতার অন্ধকার ঠেলেঠুলে নির্মাণ করবেন তিনি জীবনের বিশ্বাসের কল্যাণ–কামিতার নতুন তাজমহল।

ইকবাল এ ধারার কবি। জীবনের বহুবিচিত্রতা ও অফুরন্ত সমৃদ্ধির ঘোষক তিনি। তার কবিতা সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক, নন্দনতাত্ত্বিক কারুকর্মের এক হৃদয়ধর্মী ম্যানিফেস্টো। প্রগতি ও আধুনিকতার উপরোক্ত পটভূমিতে তিনি এক প্রত্যয়শীল জীবন্ত চরিত্র।

ইকবালের বিবেচনায় সাহিত্য হচ্ছে সেই শক্তি যা জীবনের সমগ্রতাকে সপ্রকাশ করে একক অনির্বচনীয় অনুভূতিতে। জীবনের মহৎ মানবিকতা ও ঋদ্ধ অনুধ্যানকে উজ্জীবিত করে নবস্বপ্নের দোলাচলে; একই সাথে মূর্ত করে তোলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের বহমান স্রোতধারাকে। ইকবাল তাই মনে করেন সাহিত্য শিল্পকলার উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের অনন্ত উৎসের অনুসন্ধান। অপূর্ব বৈশিষ্ট্যাশ্রয়ী ভাষায় তিনি কেমন প্রকাশ করেছেন জীবনের সেই নিগূঢ় মর্মার্থ–

জানি তুমি বুদ্ধিমান তীক্ষ্মদৃষ্টি সন্দেহতো নাই,
বাস্তবের জ্ঞান তবু তোমাতে কি জাগিয়াছে ভাই?
উদ্দেশ্য শিল্পের হবে অন্তহীন প্রমুক্ত জীবন
ভস্মমুখী স্ফুলিঙ্গের জন্য নয়, কাব্য কুঞ্জবন।
ওগো বৃষ্টি, ফলাইবে শুক্তিগর্ভে কেন সে মুকতা?
যদি সে না আনে হৃদে সমুদ্রের দুরন্ত মত্ততা।
সে নয় কবিতা বন্ধু গান তাহা নয় কভু নয়
শুষ্ক হয় ফুলবন যে বাতাসে সে কি গো মলয়?
অলৌকিক কর্ম বিনা জাগে নাক জাতির জীবন,
মুসার আঘাত যাতে নাই তাহা কবিতা কেমন?
(অনুবাদ ঃ মনিরউদ্দীন ইউসুফ)

যে কবিতার প্রাণ স্পর্শে আলোড়িত হয় না হৃদয়, সমুদ্রে ওঠে না ঝড় –ইকবাল প্রশ্ন করেছেন সেই কবিতার কুঞ্জবনে কি প্রয়োজন মানুষের। চাই সে কবিতা যার অপূর্ব জীবনী শক্তিতে উত্থান ঘটবে মৃত মানবতার নৈরাশ্য ও জড়তার প্রাচীর ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়বে। কবিতা আর নয় জীবন বিচ্ছিন্ন ড্রয়িংরুম বিহারিণীর বিলাসী উপকরণ। কবিতা এখন জীবনের ঝলমলে তেজীয়ান বৃক্ষ। কর্মের সহিষ্ণুতার ও সংগ্রামের নির্ভেজাল প্রতীক। আসরার–ই–খুদী কবির সেই জীবনবাদিতারই ঝকঝকে নুড়ি পাথর–

গোলাব তুলেছো তুমি ইরানের শত গুলবাগে
দেখেছো ইরানে, হিন্দে অপরূপ সৌন্দর্য বিথার,
মরুভূর খরোত্তাপ অনুভব কর একবার।
প্রাচীন খর্জুর সুরা একবার কর তুমি পান,
তোমার শিয়রে তার তপ্ত বক্ষ হোক উপাধান
সমর্পণ কর তনু আজ তার উত্তপ্ত হাওয়ায়।
রেশম বিলাসী তুমি, ঠাঁই নাও অমসৃণ কার্পাস শয্যায়।
পুষ্পের কোমল পর্ণে নৃত্য করিয়াছ তুমি বংশ পরম্পরা,
কোমল শিশিরে ওষ্ঠ সিঞ্চন করেছ তুমি ওগো রক্তাধরা,
জ্বলন্ত বালুর পরে ছুঁড়ে ফেল আজ আপনারে, ডুবে যাও,
ডুবে যাও জমজমের পুণ্য উৎসধারে।
বুলবুলের মত তুমি কেঁদে যাবে কতকাল কান্না ব্যর্থতার
কতকাল রবে তুমি বিলাসী বাসিন্দা বাগিচার।

বাঁধো নীড় পর্বতের উন্নত শিখরে
বিদ্যুৎ–বজ্রাগ্নি ঘেরা সুদুর্গম উচ্চতার শীর্ষে বাঁধো নীড়,
ঈগলের নীড় ছেড়ে আরো উর্ধ্বে আরো উর্ধ্ব স্তরে,
যেন যোগ্য হতে পার জেহাদের–এই জিন্দেগীর
তোমার তনু ও আত্মা দগ্ধ হতে পারে যেন এই
প্রাণ বহ্নির উপরে।
(অনুবাদঃ ফররুখ আহমদ)

বছরের পর বছর ধরে প্রাচ্যের মানুষ গোলামীর বিষফল ভক্ষণ করে চলেছে। তারা হারিয়েছে জীবনের গৌরব। লুপ্ত এখন তাদের সৃষ্টির অঙ্গীকার। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবন বিন্যাসে অনুপস্থিত তাদের ভূমিকা। এই অবক্ষয় ও বদনসিবী শুধু তাদের রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্র নেতাদের আক্রান্ত করেনি। কবি, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের মনন ও বোধেও ভাঙন ধরিয়ে

দিয়েছে। তারা এখন জঙ্গে আযাদীর মাঠে ইনসাফের জন্য, ইনসানিয়াতের জন্য খুন ঝরাতে রাজি নয় একটুও। গোলামী ও ভীরুতাকে আকর্ষণীয় ও উদ্দীপক করে তোলাই তাদের সাহিত্য ও শিল্প-কলার উদ্দেশ্য-

দার্শনিক, কবি ও বুদ্ধিজীবী
আটক এখন সবাই গোলামীর জিঞ্জিরে
যদিও এ যুগ নয় শূন্যতার।
কিন্তু এই ভাল মানুষের দল
যারা ছিল একদিন বুদ্ধির ইজারাদার
তাদের উদ্দেশ্য আজ একটি।
(কিসেই উদ্দেশ্য?) সিংহকে পরামর্শ দেয়া
হরিণীর মত পলায়ন এবং তার সাহসকে
গুপ্ত রাখা বিস্মৃতির অন্ধকারে।
যদিও তারা ভান করে সমস্যা সমাধানের (ধর্ম,
দর্শন ও শিল্পকলার) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা
নিয়োজিত গোলামের সমুখে গোলামীকে আকর্ষণীয় করার।

এমনি যে কবি জীবনের সৌরভ সুন্দর কল্যাণের কথা বললেন, মানুষের অন্ত সাফল্যের ইংগিত করলেন হৃদয়গ্রাহী ভাষায়, বললেন মানুষের চিত্তোত্থানের কথা কি করে তাকে প্রগতিহীনতার পক্ষে প্রত্যয়ন করা সম্ভব। যার কবিতা গোলামী ও ভীরুতার বিরুদ্ধে বর্ষমুখ, দুনিয়ার তাবৎ দুর্গত দীন-দুঃখীর সপক্ষে যার লেখনী ঝলসে ওঠে তরবারীর মত, বাজের সমুখে যিনি ভাঙ্গিয়ে দেন চটকের ভয় কিংবা যে কবি জালিমের শস্যাদি পুড়িয়ে দেয়ার আহবান জানান যেখানে নেই মজলুমের অংশীদার, তিনি কি করে প্রতিক্রিয়াশীল হতে যাবেন। খোদার ফরমান কবিতায় তিনি যখন ভবিষ্যৎ বিপ্লবের সম্ভাবনার কথা বলেন-

ওঠ, দুনিয়ার গরীর ভুখারে জাগিয়ে দাও,
ধনিকের দ্বারে ত্রাসের কাঁপন লাগিয়ে দাও।।
কর-ঈমানের আগুনে তপ্ত গোলামী খুন,
বাজের সমুখে চটকের ভয় ভাঙ্গিয়ে দাও।
ঐ দেখ আসে দুর্গত দীন দুখীর রাজ,
পাপের চিহ্ন মুছে যাও, ধরা রাঙিয়ে দাও।।
কিষান মজুর পায় না যে মাঠে শ্রমের ফল
সে মাঠের সব শস্যে আগুন লাগিয়ে দাও।
স্রষ্টা ও তার সৃষ্টির মাঝে কেন আড়াল?
মধ্যবর্তী মোল্লাকে আজ হাকিয়ে দাও।।

(অনুবাদঃ ফররুখ আহমদ)

কবির এই বিশ্বাস আরো প্রখর হয়ে ওঠে যখন তিনি ডাক দেন সাধারণ মানুষের পরিবর্তে সাহিত্য ও শিল্পের রূপকারদের যারা জীবনেরই ভাষ্যকার, যাদের তুলিতে উঠে আসে জীবনের সত্য। কবি মনে করেন মহৎ শিল্পের কখনো উদ্ভব ঘটে না সস্তা বিলাসিতা ও পলায়নী আবেগের মৃত্তিকায়। তার জন্য চাই খুন ও অশ্রুর কাদাজলে মানবিকতার উত্থান। জীবনের যে সহজীয়া প্রবৃত্তি তার মধ্যে আছে শুধু শিল্পের অপমৃত্যু। কবি তাঁর বিশ্ববিশ্রুত মসজিদে কর্ডোবা (MOSQUE OF CORDOVA) কবিতায় মহৎ শিল্প ও শিল্পীর মূল্যায়ন করেছেন–

প্রেম থেকে জানি অস্তি তোমার ওগো মসজিদ কর্ডোভার,
ক্ষয় নাই যার, নাইতো বিলয়, অতীত অথবা অধুনা আর।
হোক তসবীর অথবা পাথর।
বেনুকার সুর অথবা গান
হৃদয় রক্ত কনায় শিল্প হয় জীবন্ত হৃদি সমান।
শিলাকে যে করে জিন্দা দিল, সে জিগরের তাজা কাতরা খুন
হৃদয় রক্তে জাগে অসহন বেদনা দহন, সুর আগুন।
হৃদয় জাগানো প্রেরণা তোমার, হৃদয় জ্বালানো আমার গান
তুমি শুধু ডাকো, আমি খুলে যাই সকল হৃদয় তিমির ম্লান।

(অনুবাদঃ ফররুখ আহমদ)

কবির বিপক্ষীয় সমালোচকরা তাই যখন প্রতিক্রিয়াশীল কিংবা প্রগতির বিপক্ষে দাঁড় করান তখন ইকবালের এই বিশ্ববীক্ষার সামনে এ সমালোচনা মনে হয় অপরিণত। সত্য বটে ইকবালের কবিতা প্রগতির যে বাণী বহন করে এনেছে তার সাথে মিশ্রিত আছে ধর্মের মোহমুগ্ধ স্বস্থতা এবং তিনি তার প্রেরণার উৎসমূল করেছেন ইসলামকে। কিন্তু অনুদার এই সমালোচকের দৃষ্টি হল আচ্ছন্ন। তাদের ধারণা ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট যা কিছু তাই অপরিচ্ছন্ন এবং প্রতিক্রিয়াজাত এবং তার বিপক্ষে দাঁড়ানোই প্রগতি ও সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। প্রগতির নামধারী এ ভন্ড প্রতারকের উদ্দেশ্যে ইকবালের নিম্নোক্ত বাণীই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি যা তিনি লিখেছিলেন ১৯১৬ সালে প্রাচীন এক আরবী কবির কবিতা প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যা বলেছিলেন তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন ইকবালের এ উক্তি এমন সময় দেয়া যখন ভারতে নাস্তি নির্ভর প্রগতিবাদী আন্দোলন দানা বাঁধেনি মোটেও এমনকি ইউরোপেও এ আন্দোলন তখন মাটি খুঁজে পায়নি পুরোপুরি–

"The ultimate end of all human activity is life glorious, powerful, dxuberant, All human art must be subordinated to this final furpose and the value of every thing must be determined in reference to its life

yielding Capacity, The highest art is that which awakens our dormant will-force and nerves us to face the trials of life manfully. All that brings drowsiuess and makes us shut our eyes to Reality around, on the mastery of which alone life depends, is a message of decay and death There ahould be no opium eating in art, The dogma of Art for the sake of Art is a clever invention of decadence to Cheat us out of life and power.

৫

ইকবালের কবিতায় স্বদেশিকতার দৃষ্টান্ত প্রচুর। এমনকি তাঁর কবি জীবনের প্রথম পর্বে বিরচিত কবিতার সুর প্রধানত দেশপ্রেমের দাবদাহনে নিষিক্ত। কিন্তু হৃদয়হীন সমালোচকের অপ্রসারী দৃষ্টি থেকে আদৌ বিমুক্ত থাকতে পারেননি তিনি। বলা হয়ে থাকে ইকবালের পরিণত বয়সের কবিতায় দেশ এবং তার সমস্যা উপেক্ষিত এবং ইসলামী আদর্শের মত ধর্ম–দর্শন দ্বারা কবলিত। এই সমালোচনার দু'টি দিক স্পষ্ট। প্রথমত, ইকবাল জাতীয়তা ও দেশ–প্রেমের আধুনিক দেবতার নির্মাল্য রচনা করতে অস্বীকার করেছেন এবং দ্বিতীয়ত, মানবতার প্রতি তাঁর আহবান নিছক ইসলামী আদর্শের ব্যঞ্জনায় সিক্ত হয়ে আছে।

প্রকৃত অবস্থাটা কি? ইকবাল কাব্যের গভীর দৃকপাত করলেই নজরে আসবে এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কবি তার প্রিয় জন্মভূমির প্রতি কোন অনুরাগ পোষণ করেননি। কবির পরিণত বয়সের রচনাবলীতেও স্বদেশের প্রতি উদ্দীপক ও সাড়া জাগানো কবিতার প্রশ্রয় যথেষ্ঠ পরিমাণে বিদ্যমান যা তাঁর দেশপ্রেমেরই ঋদ্ধ অংগীকার। কিন্তু একটি পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট যে, তার প্রথম জীবনের কবিতায় স্বদেশের বহিরাংগিক চিত্রাবলীই মূর্তিমান। কিন্তু বয়সের পরিণতির সাথে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা যত প্রসারিত হতে থাকে, মানব সভ্যতার চরম লক্ষ্য যখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর চিন্তার দিগন্তে, ইকবালের কাব্য ও দর্শনের অন্তর্গত বিশ্বাস ও ক্ষুরধার উপলব্ধি তখন ভূগোলের নির্দিষ্ট সীমানায় আবদ্ধ হতে অস্বীকৃতি জানায়। সভ্যতার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের গতিপ্রবাহকে আত্মস্থ করে ইকবাল মানবিকতার চিরন্তন সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জেহাদকে অধিকতর কর্মপ্রবণ করবার লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করেন। স্বদেশের প্রতি ইকবালের অনুরাগ এই বৃহত্তর মানবিক চেতনার আঙ্গিকে বিচারের দাবীদার এবং তিনি এখন বিশ্বাসের এই অন্তর্গত মূল্যমানকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে উৎসাহী। স্বদেশের বহিরাংগিক চিত্র, মৌসুমী হাওয়ার পরিবর্তন, নদ–নদী শ্যামলিমার মাধুকরী দৃশ্য এখন তাঁর কাছে গৌন। নিঃসন্দেহে ইকবালের এই রূপান্তর স্বদেশের প্রতি তাঁর অতি উৎকর্ষিত মনোভঙ্গির দৃষ্টান্ত, কেননা এ পর্যায়ের কবিতায় উন্মোচিত হয়েছে বিশ্বসভায় স্বদেশের গৌরবমন্ডিত স্থান যা কি–না আযাদী অর্জন ব্যতীত সম্ভব নয়।

ইকবাল যখন পরাধীন ভারতের নাভিশ্বাসের কথা বলেন তখন তাঁর বিশ্বাসের জ্বালা ও পদ চিন্তার মনিকাঞ্চন প্রবল প্রভা ও দীপ্ত মাঙ্গল্যে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে–

কে জানে ভারতের ভবিতব্য–
ফিরিঙ্গি রাজ প্রাসাদের যা আজ উজ্জ্বলতম রত্ন
এই যে চাষী কবর উদগারিত মুর্দার মত,
কে জানে তার রহস্য কোথায় গুপ্ত–
শরীর ও আত্মা উভয়ই নিষ্পেষিত বন্ধকী দেনায়
গৃহ এবং গৃহকর্তা অনুপস্থিত–
পশ্চিমের গোলামীতে তোমরা আছ বেশ
আমার অনুযোগ তোমাদের বিরুদ্ধে
পশ্চিমের বিরুদ্ধে নয়।।
–(জরবে কালীম)

ভারতে ঔপনিবেশিক শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে ইকবালের এই কঠোর বাক্য উচ্চারণ একটি কিংবা দ'ুটি নয়। তাঁর কাব্যে ও সৃষ্টিকর্মে এই প্রতিবাদ ধ্বনি বারে বারে ঘুরেফিরে এসেছে সেই শক্তি ও ক্রিয়াকান্ডের বিপক্ষে যা কি–না জনগণের সামাজিক ও মানবিক অগ্রগতিকে অবরুদ্ধ করে। তাঁর পরিণত বয়সের রচনা 'পচ সে বায়াদ করদ' উন্মোচিত হয়েছে এক জাগ্রত প্রাচ্যের দৃশ্য। পশ্চিমী দুঃশাসন নিক্ষেপ করে প্রাচ্য তার অন্তর্গত শক্তি আবিষ্কার ও মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে নবযাত্রা শুরু করেছে, ইকবাল তাঁর এই কাব্যে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন ভারতের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গোত্রীয় কলহের প্রতি যা কি–না দেশটির সামাজিক বুনিয়াদ অস্থির করে তুলেছে। সেই সুযোগ গ্রহণ করে সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের মৃত্তিকায় তাদের প্রাসাদ নির্মাণ করছে–

ও হিমালয়, আটক ও গঙ্গানদী
আর কতকাল তোমরা থাকবে বল বর্ণ ও গন্ধহীন
এই মাটির পলিতকেশ সন্তানেরা বুদ্ধিভ্রম
তরুণেরা বঞ্চিত ইশকের দীপ্তি থেকে
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়ই বিমুক্ত;
কিন্তু আমরা আটক গোলামীর জিঞ্জিরে
অন্যেরা আমাদের মৃত্তিকায় নির্মাণ করছে তাদের প্রাসাদ
মানবতা ভারতে রাহুগ্রস্ত বিভেদ আর বৈরিতায়
পুরনো বিবাদ উসকে উঠেছে নতুন করে।
যতক্ষণ না পশ্চিমের কোন দেশ স্বেচ্ছায়
বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের ঘেরাটোপে মধ্যস্থতাকারীর
ভূমিকা পালন করছে

উন্মোচিত হবে না এই রৌদ্র চমকিত পানি
ও মরবচকার পার্থক্য
বিপ্লব চাই আজ সব নিরীর্যতা ঝেড়ে ফেলার জন্য।

যে কবি স্বদেশের বেদনা ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে এমনি মর্মরিত হয়েছেন, হৃদয়ের রক্তে যার উন্মোচিত হয়েছে স্বদেশী চিত্র–কি করে আমরা তাকে দেশপ্রেমবর্জিত কবি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। কবির জরবে কালীমে শুয়ায়ে উমীদ (আশার কিরণ) কবিতার উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় মনে করি, যেখানে তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন মাতৃভূমির অনালোকিত তসবীরের বুকে আশার কিরণ সম্পাৎ করবার আশ্চর্য বর্ণনাভঙ্গি ও নাটকীয় সংলাপের মধ্যে এ কবিতা, কবি ও শিল্পীদের জন্য এক বিপ্লবী ম্যানিফেস্টো যারা জীবনকে দেখতে চান বহু বিচিত্রতায়। বহু বর্ণের সম্মিলনে। কবিতার মূলগত ধারণা ব্যক্ত হয়েছে উপমা উৎপ্রেক্ষার ছলে। কোন এক সময় সূর্য পৃথিবীর অধিবাসীদের নীচতা ও বিকৃতি দর্শনে বিরক্ত হয় এবং সে তার তাবৎ কিরণকে এই দুঃখ জ্বালার এঁদো ডোবা থেকে ফিরে আসার আহবান জানায়। পৃথিবী জোড়া ছড়ানো ছিটানো সমস্ত কিরণ এ আহবানে সাড়া দেয়, শুধু একটি মাত্র অস্থির, উন্মুখর প্রোজ্জ্বল কিরণ, যে মনস্থির করেছিল প্রাচ্য এবং বিশেষত হিন্দুস্তানের দুঃখ ও জিল্লতির অপসারণ করবার , সূর্যের আহবান প্রত্যাখ্যান করে। এই অমিততেজ কিরণের ভাষ্য এ রকমঃ

উদ্ধত কিরণ এক হূর–চক্ষুসম দীপ্তিমান,
বিশ্রান্তি আরাম ভোলা বিচঞ্চল পারদ সমান
কহিল সে, জ্যোতির্ময় বক্ষ হতে দাওগো বিদায়,
দিগন্তে আবার নামি, ফিরিব–না না উজলি হায়,
প্রাচ্যের প্রতিটি কণা, দূর করি হিন্দের আঁধার,
জাগাব সকলে ভেঙ্গে রুদ্ধ যত স্বপ্নের দুয়ার।
প্রাচ্য দেশ–আশা কভু জন্ম নিবে এরি ধূলি হতে,
ইকবালের অশ্রুরাশি বয় হেথা প্লাবনের স্রোতে,
এদেশেরি ধূলি মেখে চাঁদ–তারা উজ্জ্বল মহান,
প্রতি ধূলিকণা এর মুক্তাসম বহু মূল্যবান,
দার্শনিক কভু সেই জন্মেছিল এ মাটির পরে
যাদের চিন্তার ফলে থই জাগে জ্ঞানের সাগরে।
যে বীণা জাগিয়েছিল প্রাণে প্রাণে গভীর চেতনা,
মন্দিরের দ্বারে দেখ, শুয়ে আছে হতাশ ব্রাহ্মণ,
মসজিদ মিম্বর তলে কাঁদিতেছে মুসলিমের মন।
ত্যাজনা পশ্চিম কিংবা বিমুখ না হও প্রাচ্য পর,
প্রকৃতি–ইংগিতে তুমি প্রতিটি রজনী কর ভোর।
(অনুবাদঃ মনির উদ্দীন ইউসুফ)

ব্যতিক্রমী এই কিরণ ইকবাল নিজেই; প্রাচ্যের দিগন্তে যিনি এনেছিলেন আলো ঝলোমলো রঙিন দিনের স্বপ্ন। তাঁর ছিল একাধারে বিশ্বদৃষ্টি এবং বিশ্ববীক্ষণ। ইকবালের অন্তর্গত চেতনায় ধরা পড়েছিল দেশপ্রেম যা স্বদেশের কল্যাণ–কামিতা ও উৎকর্ষ বিধানের লক্ষ্যে প্রণোদিত আর জাতীয়তাবাদ হচ্ছে এক ধরনের বিষবৃক্ষ যার উৎপাদিত ফল রাজনৈতিক কার্যক্রম ও প্রচারণার মধ্যে শান্তি, স্বাধীনতা ও ইনসাফের হন্তারক হিসেবে সতত ক্রিয়াশীল। ইকবাল ছিলেন মানবতাবাদী একই সাথে আন্তর্জাতিকতাবাদী, তাই কার্যত তিনি জাতি রাষ্ট্রের ধারণা অস্বীকার করেছেন। ইসলামের উদার শিক্ষা এবং রক্ত, বর্ণ ও গোত্রের অলীক পূজাপাঠ পরিত্যাগপূর্বক ইসলামের নবী যে মানবতার অবিভাজ্যতা ও একক অস্তিত্বের কথা বলেছেন ইকবাল তার থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করেছেন। ইকবাল এই বিশ্বাশ্রিত সত্য উপলব্ধিতে নিছক নিঃসঙ্গ একলা চলার পথিক নন। বর্তমান কালের বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিবাদী মনীষার ধারণাও ইকবালের সমার্থক, যদিও তাদের চিন্তা–ধারণা ও বিশ্বাসের বিস্তৃতি বিভিন্ন বলয় অভিমুখীন এবং সেটাই সংগত ও স্বাভাবিক তথাপি পরিণতিতে তারা সকলেই একমত হয়েছেন বর্তমানকালে জাতীয়তাবাদের নির্মানবিক চেতনা নৈতিক ও জাগতিক কল্যাণের প্রতিবন্ধক এবং রাজনৈতিক হানাহানি ও আগ্রাসনের উপযোগিতা নির্মাণে সহায়ক। সভ্যতার অনিরুদ্ধ গতি প্রবাহ তা টিকিয়ে রাখতে হলে জাতীয়তাবাদের অবচেতনা বিলোপ অবশ্যম্ভাবী ও জরুরী। সত্যিকার অর্থে যিনি প্রগতিবাদী একথা অবশ্যই স্বীকার করবেন কারিগরী ও অর্থনৈতিকভাবে পরস্পর নির্ভরশীল আধুনিক পৃথিবীতে এই দানবিক চিন্তার শিকড় উপড়ে ফেলার জন্য চাই বিশ্ববিক্ষা, দেশপ্রেমের ঊর্ধ্বে দেশাতীত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের চর্চা।

ইকবালের সাথে অন্যান্য চিন্তাবিদের পার্থক্য স্বকীয় বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে। বার্টান্ড রাসেল, এইচ জি ওয়েলস, বার্নাড'শ কিংবা যোয়াড এবং রাজনৈতিক দল যেমন সমাজবাদীরা মানব সমাজের জাতীয়তাবাদ–নির্ভর এই খন্ডিত চেতনাকে আঘাত করেছেন এবং বলেছেন, ক্রমহ্রাসমান দূরত্বের আধুনিক পৃথিবীতে যখন পারস্পরিক সম্পর্কের বুনিয়াদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন জাতীয়তার বিষক্রিয়ায় নতুন করে উদগত হবে শ্রেণী সংঘর্ষ, বাণিজ্যিক বিরোধ, যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ যা কি–না মানবতার সার্বিক বিপর্যয় সূচনা করবে। ইকবালের বিবেচনা ধর্মাশ্রিত ও নৈতিকতাজাত, আধ্যাত্মিক ও মানবিক চেতনা সমৃদ্ধ। তাঁর কাছে সকল ব্যবস্থাই অনুপযোগী যার বুনিয়াদ বৈরিতা ও জুলুমের মৃত্তিকায়, যা কি–না মানব সমাজের ভবিষ্যতকে সংশয়াচ্ছন্ন করে তুলবে। তিনি তাঁর এই বক্তব্য তুলে ধরেছেন বিশ্ববিখ্যাত মাদ্রাজ বক্তৃতায় অসামান্য বলিষ্ঠতা ও যৌক্তিকতার সাথে–

Both nationalism and atheistic socialism,

at least in the present state of human adjustments, must draw upon the psychological forces or hate , suspicion and risentuent which tend to

impoverisl the soul of man and close up his hidden sources of Spiritual energy. Neither the technique of medieval mysticism nor nationalism nor athistic socialism Can Cure the ills of a dispairing humanity,

Surely the present moment is one of great Crisis in the history of modern Culture, The modern world Stands in need of biological renewal. And religion, which in its higher manifestations is neither dogma nor Priest-hoọd, nor ritual, Can alone ethically Prepore the modern men for the burden of thr great responsiblity which the advancement of modern science necessarily imloves, and restore to him that attitude of faith which makes him Capable of winning a Personality here and retaining it here after.

দর্শনের এই ঋদ্ধ অনুভব প্রাণ ফিরে পেয়েছে তার কবিতার ছন্দে, নব নব আঙ্গিক ও সৌকর্যে। যেমন–

ফিতরাতের উদ্দেশ্য কি
আর কিবা রহস্য ইসলামের মর্মরিত বিশ্বাসে?
মানবতার প্রতি শ্রদ্ধ, এবং ইশকের অনিরুদ্ধ প্রবাহ,
অবলুপ্ত কর রক্ত ও বর্ণের জাতীয়তা
হারিয়ে যাও মিল্লাতের মাহফিলে।
মুছে দাও এই পার্থক্য
তুরান, পারস্য বা আফগানের ভেদরেখা।
অন্যত্র
লোভ মানবতাকে বিচ্ছিন্ন করেছে কলহমান দলে
উচ্চারণ কর প্রেমের বাণী
শিক্ষা দাও উখওয়াতের ভিত্তি।
কেন এই বিভেদের আয়োজন
হিন্দ, তুরান, আফগান এবং খোরাসান?
তোমরা উপকূলের অধিবাসী
দৃষ্টিকে সীমাহীন রাখো।
তোমাদের ডানায় ভর করেছে বর্ণ ও গোত্রের ধূলি
হারেমের পাখী
উর্ধ্বচারণের পূর্বে ঝেড়ে ফেল তোমার ধূলি ধূসরিত ডানা।

ইকবাল জোরের সাথে উল্লেখ করেছেন জাতীয়তাবাদ এবং পুঁজিবাদ ও তার অবৈধ উপজাত সাম্রাজ্যবাদ ইউরোপকে করেছে নগ্নিকা। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণ এখন ধুঁকছে আসন্ন বিপর্যয়ের অপেক্ষায়–

মানুষ আজও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের উপাচার;
এ কেমন বেদনার্ত চিত্র
মানুষ, মানুষেরই খাদক
সভ্যতার আলোরাশি,
মুগ্ধ করেছে মানব আঁখি
তার অজ্জনস্পর্শে
কিন্তু এ হলো মিথ্যার শৈল্পিক নির্দেশ
পশ্চিমের জ্ঞানপাপীরা গর্বিত বিজ্ঞানের
কিন্তু এ হলো লোভ ও রক্তমিশ্রিত
যুদ্ধের ক্ষুরধার তরবারী
রাজনীতির যাদু সভ্যতাকে ধারণ করতে পারে না
অন্তর যার যুক্ত পুঁজিবাদী পাপের সাথে।

ইবালের অপরিণত সমালোচনার কুয়াশা এর পরেও কি অভেদ্য রয়ে যাবে যে, তিনি দেশপ্রেমিক নন। ইকবাল যে বিশ্ববীক্ষার কথা বলেছেন তা অবশ্য আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে এবং জাতিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কল্যাণ–কামিতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইকবালের আরো এক দল সমালোচক আছেন যাদের ভাষ্য–মানবতার সমস্যাকে তিনি ধর্মের ঠুলি পরে অবলোকন করেছেন এবং কার্যত তাই তিনি তার সৃষ্টি–কর্মের আবেদনকে বিশ্বমানবতার পরিবর্তে নিছক মুসলিম উম্মার কাছে সীমিত করে ফেলেছেন। এ কথা সত্য, ইকবাল তার কাব্য ভাবনার গভীর নির্দেশ পেয়েছেন ইসলামে শাশ্বত মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে। কিন্তু একথা উচ্চারণ কি যথার্থ এটি তার কাব্যের শিল্পিত মূল্যকে ক্ষুণ্ন করেছে কিংবা তার বিশ্বজনীন আবেদনের হানি ঘটিয়েছে একটুও। ইকবাল তাঁর অসাধারণ মনীষা ও প্রজ্ঞা দীপ্তিতে ইসলামের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশ্বসমাজের কাছে এবং আরো বিশেষ করে মুসলিম সমাজের কাছে তুলে ধরছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল কিংবা সমার্থক কিছু অভিধায় চিহ্নিত করা ন্যায়ত সম্ভব?

অনুদার সমালোচকরা একটি কথা বিস্মৃত হন বিশ্বের সব বড় কবি, লেখক কিংবা চিন্তাবিদরা প্রেরণা গ্রহণ করেছেন নিজ সমাজ থেকে; যে বলয় ও সংস্কৃতির পরিমন্ডলে তিনি বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। একথা সত্য সৃষ্টিধর্মী ও বিকাশমান মনীষা কখনো অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না স্বসমাজের সাথে শিকড় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এবং একমাত্র এই পটভূমিতে নিজস্ব সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও জীবন চেতনাকে আত্মস্থ করেই মনীষার বিকাশ সম্ভব এবং তখনই তার মধ্যে উজ্জীবিত হয় সৃষ্টিধর্মী মৌলিকত্ব, কেবলমাত্র তখনই সম্ভব হয়ে ওঠে। চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির নতুন দিগন্তকে আমন্ত্রণ জানানো এবং কল্যাণকর উপযোগিতার বুনিয়াদ নির্মাণ।

ইকবাল এ দু'টি শর্তকেই পূরণ করেছেন সাফল্যের সাথে। প্রথমত তিনি ছিলেন বড় মাপের ইসলামী চিন্তাবিদ কোরআনী জীবন-দর্শন ও রাসূল (সঃ)-এর আদর্শবাদকে তিনি মূল্যায়ন করেছেন গভীর অন্তরঙ্গিতায়। দ্বিতীয়ত আধুনিক বিজ্ঞানের বহু প্রসারী জীবন -ধারা ও পদ্ধতির সাথেও তাঁর ছিল সমান পরিচয় । অতি অনিবার্যভাবে তাই তাঁর ব্যাখ্যাত ইসলাম নিবীর্য অতীতের ভারবাহী শকট নয়। ইসলাম তাঁর কাছে মানবমুক্তির প্রশ্রয়, মানবপীড়নের হাতিয়ার নয়। ইকবালের ব্যাখ্যাত ইসলামে চিন্তার ক্লৈব্য নেই, নেই অসহিষ্ণুতার উত্তাপ। আছে মুক্ত প্রসারী জীবনের দ্যোতনা। ইসলাম তাঁর কাছে প্রচলিত অর্থের কোন ধর্ম নয় যা মানুষের অন্তরে নিরুদ্বেগ পৃথিবীর এক অলীক স্বপ্ন উজ্জীবিত করে এবং জীবন সংগ্রামে মানুষকে পশ্চাদপসরণে উৎসাহিত করে। ইসলাম তাঁর কাছে সেই ধর্ম নয় যা মানুষের কাছে আফিম হিসেবে বিবেচিত। ইসলাম তার কাছে মুক্ত মানুষের জীবন বিশ্বাস, গতি ও সংগ্রামের প্রতীক, বিশ্ব জয়ের আলেখ্য। ইকবাল তাই বিক্ষুব্ধ হয়েছেন নিবীর্য আত্মার প্রতীকে যারা আজও ধর্মের কান্ডারী সেজে বসে আছে-

হে ক্ষমতা বঞ্চিত আল্লাহর সন্তানেরা!
যাও নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে
প্রার্থনা কর নিভৃত গুহা কন্দরে।
যাও!
আবিষ্কার কর ইসলামের নতুন শৈলী
যেখানে শিক্ষা দেয়া হয়
বিনয়ের জাল জুয়াচুরি
গোলামীর কাছে আত্মসমর্পণ
আর নৈরাশ্যের চিরন্তন উপযোগিতা
মুল্লারা ভাবছেঃ
এই হল মুক্ত ইসলামের ছবি
কেননা এই দেশে তারাই
সালাতে নেতৃত্ব দেয়ার অধিকারী।

ইকবালের কাছে ইসলামে বিশ্বাসী মানুষ শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির (POWER AND VISION) কার্যকরী উপমা। আধুনিক বিশ্বে শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির বিচ্ছেদ, ধর্ম ও বিজ্ঞানের বৈরিতা, জ্ঞান ও বোধির অসংযোগের ফলে সৃষ্টি হয়েছে কারুন্দ ও ব্যর্থতার এক মহাদুর্বিপাক। ইকবালের ব্যাখ্যাত ইসলাম এই অসংগতি থেকে মুক্ত। তাঁর ধর্মে উজ্জীবন ঘটেছে ন্যায় প্রেমবোধ, ভ্রাতৃত্ব ও মানবতার। বিজ্ঞানী ও পূজারীর ঔদ্ধত্য নেই এ সমাজে।

এমনি যে গতিময় শক্তিমান জীবন-দর্শনের ব্যাখ্যাদানকারী কবি তিনি কেন উপেক্ষিত হবেন অনুদার জীবন চেতনাবাহীদের হাতে । যারা তাঁর কাব্যের এমনিতর মানহানি করতে চায়। ধর্মে

নেয়ার যথেষ্ট কারণ আছে তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই এ প্রচারণার জন্ম দিয়েছে, কেননা তারা জানে ইকবালের ব্যাখ্যাত আদর্শ কখনো ম্লান হবার নয়। যদি তার কাব্যের শিল্পকেও উপজীব্য হিসেবে ধরি তবে একথা মেনে নেয়া যায় না তাঁর কবিতার অন্তর্গত বাণী বিশ্বজনীন আবেদন সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে এই কারণে যে, তিনি তার অনুপ্রেরণার উৎস করেছেন ইসলাম ও তার সংস্কৃতিকে। তাহলে পৃথিবীর তাবৎ সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে একই কথা ওঠাই স্বাভাবিক। এটা কি করে বলা সম্ভব শেক্সপীয়র কিংবা গ্যাটের সৃষ্টিকর্ম কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি অথবা তাঁদের স্ব স্ব শিল্প নৈপুণ্য যথেষ্ট গুণমান-সম্পন্ন বিবেচিত হয়নি। এ কারণে যে, তারা যথাক্রমে ইংরেজী ও জার্মান সংস্কৃতির অনুবর্তন ও অনুপ্রাস সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয়েরই সাহিত্য কর্ম খ্রীষ্টী ধর্মবিশ্বাসের জারকর-সে মিশ্রিত হয়ে আছে। উর্দূতে ইকবাল স্মৃতিবার্ষিকী প্রকাশনার লগ্নে বাবায়ে উর্দু মৌলভী আব্দুল হকের কাছে লেখা প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রুর একটি চিটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে-

I think it is unfair to describe Iqbal as the poet of Islam only, as ot restricts unnecessarely the scope of his influence, It is true that he has written a great deal about Muslim Philosophy .Muslim Culture and Muslim. achlievements. But no one has ever sought to limit the appeal of Moltons Poetry by Calling him the poet of Christianity or the appeal of kalida's poetry by Calling him the poet of Hinduism; nor have the followers of other religions ever beli Hled their greatness on this account. If Iqbal writes of the great deeds of Muslim history and of Muslim Cultural achievements, is there any reason why non-Muslims should Value him any the less on that account.

সভ্যতার নিরন্তর বিবর্তনের ফলে পৃথিবীর মানুষ আজ পরস্পর সংলগ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পারস্পরিক সংলগ্নতা ও আত্মীয়তার পরিধি ক্রম সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে দিনে দিনে। মানবতার এই প্রসারণ ক্রিয়াকে সংহত করতে হলে চাই সাহিত্যে এবং শিল্পে উৎকর্ষিত জীবনের চর্চা। ইকবাল কাব্যের অন্তর্গত বাণী নির্মোহ দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে স্বীকার করবার যথেষ্ট কারণ আছে আধুনিককালের জীবনবাদী ও প্রগতিশীল সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁর অবদান উধাও সমুদ্রের মতই ব্যাপক ও বিস্তৃত। মানবিকতার কল্যাণ-কামিতায় তাঁর কবিতা চিরদিনের, চিরকালের বিপ্লবী অংগীকার। মানুষকে তিনি ভাল বেসেছিলেন। তাঁর অন্বেষা ছিল মানুষ ও বিশ্বজগত। বিশ্বজগতের মুখোমুখী বলদর্পী মানুষ। কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ বলেছেন-ইকবালের কবিতার শেষ কথা হলঃ মানুষের কথা, মানুষের বিশ্বের কথা, মানুষের একক মর্যাদার কথা। এই মূল্যবোধ ও বিবেচনাই কবি ইকবালের কাব্য কর্মকে শেষ বিচারে উৎরে দিয়েছে শাশ্বত-কালের যাত্রায়।

ইকবালের কাব্যদর্শন ও আমাদের জাতীয় মানস

মোঃ মোরশেদ আলী

নদীর পানি যেমন সার্বজনীন, কবির কবিতাও তেমনই সার্বজনীন। ইকবালের কবিতার সার্বজনীনতাকে আমরা এদেশীরা কিন্তু আজকাল ভুলতে বসেছি। এমন এক সময় ছিল যখন এদেশে ইকবাল দিবস গুরুত্বের সাথে উদ্‌যাপিত হত। আলোচনা পর্যালোচনা হত। ইকবালের উপর পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা বের হত। কিন্তু এখন সে কার্যক্রম নেই বললেই চলে। আমরা ইকবাল হলের নাম বদলিয়ে জহুরুল হক হল রেখেছি। অনেক রাস্তার নাম ইকবাল রোড থাকায় সেগুলোও বদলিয়ে দিয়েছি। কেন জানি আমাদের মাঝে এক আত্মঘাতী প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আর এই প্রবণতার শিকার হয়েছে আল্লামা ইকবালের মত অনেক কবি-সাহিত্যিক অথচ ইকবালের কাব্যদর্শন আমাদের জাতীয় চেতনায় দিক-নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করতে পারে। আমাদের জাতীয় জীবনে কোরআান-সুন্না'র আলোক ধারায় অবগাহনের জন্য যে উদ্দীপনা দরকার তা ইকবালের কবিতায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে। তিনি কোরআন-সুন্না'র মর্মবাণীকে অনুরাগে সিক্ত করে কবিতার ডালিতে সাজিয়ে আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। কোরআন বুঝবার জন্য তাঁর কবিতা কাব্য-তাফসীরের কাজ করেছে। কবিতায় কাব্যিক সুষমাকে অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি আমাদের আনন্দলোকে কোরআনী জীবনবোধকে উপস্থাপন করেছেন। আমরা তার কবিতার পথ বেয়ে জীবন দর্শন ও জাতীয় জাগৃতির সঠিক ঠিকানায় উপনীত হই।

ফররুখ আহমদ সাত সাগরের মাঝি আল্লামা ইকবালের নামে উৎসর্গ করেছেন। উৎসর্গ পত্রে তিনি কবিকে ইসলামী সংস্কৃতির রূপকার হিসাবে বর্ণনা করেছেন। মূলত সাত সাগরের মাঝির কাব্য দর্শন ইকবালের কাব্য দর্শনেরই ফলশ্রুতি।) কবিকে ইসলামী সংস্কৃতির রূপকার হিসেবে বর্ণনা করার মাঝে সমাজ-সংস্কৃতি এক বিরাট সত্য লুকিয়ে রয়েছে। সমাজ সংস্কৃতির বলতে একটা জাতির জীবন বোধের যে ব্যাপকতর দিকটার কথা বলা হয়-ইকবালের কবিতায় তার সবগুলোই রূপায়িত হয়েছে। কোরআন-সুন্নায় রাজনৈতিক জীবন দর্শনকে তিনি এমন সুগভীর অনুভবের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন যে, তাতে জাতির ঘুমন্ত নয়ন পুনরায় নিদ্রা ভুলে জেগে উঠেছে। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেনঃ "ধর্ম আর রাজনীতি আলাদা হলে বাকী থাকে চেঙ্গিজী নীতি।" তিনি তাঁর কবিতায় ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে হযরত জুনায়েদ বোগদাদীর (রঃ) প্রসঙ্গ এনেছেন, আর রাজনীতির প্রতিনিধি হিসেবে পারস্য রাজ আরদেশীর প্রসঙ্গ এনেছেন। তিনি স্পষ্টত ব্যক্ত করেছেন, জুনায়েদী আর আরদেশীর সম্মিলনের মাঝেই ইসলামের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

জাতির মুক্তি সম্পর্কে ইকবালের কবিতায় এক স্বচ্ছ দৃষ্টি কোণের সন্ধান পাওয়া যায়। এ দৃষ্টিকোণ পঞ্চাশ বছর আগে যেমন জাতিকে পথ দেখিয়েছে। আজকের দিনেও পথ দেখাতে

পারে। জাতির বিবেককে নাড়িয়ে দেয়ার মত ইকবালের দুটো কাব্যের নাম হল 'শেকোয়া ও জওয়াবে শেকোয়া'। মুসলমানরা যখন স্বাধীনতা হারিয়ে নৈরাশ্যের অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছিল ইকবালের কাব্য-তরি তখন তাদের নির্দিষ্ট বন্দরের দিকে পথ দেখিয়েছে। আর সে পথ প্রদর্শনের আবেদন ছিল অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। এ আবেদনকে অনুভব করার জন্য আমরা কবি গোলাম মোস্তফা অনূদিত কয়েকটি চরণ পাঠকদের খেদমতে পেশ করছিঃ

"সারা দুনিয়ায় জ্বলিছে আগুন পাবে নাক কেউ পরিত্রাণ

এ আগুনে আজ পুড়িতেছে যত ক্ষেত খামার ও গুলিস্তান

থাকে যদি আজ তোমাদের মাঝে ইব্রাহিমের সেই ঈমান

এ আগুন তবে হইবে আবার স্নিগ্ধ শীতল ফুলবাগান।" (জওয়াবে শেকোয়া)

আল্লামা ইকবাল সারা জীবন মিল্লাতের কানে আশাবাদের বাণী শুনিয়ে গেছেন। আর এখানেই ইকবালের সার্থকত। নৈরাশ্যের মহামারী যখন তখন জাতিকে গ্রাস করতে পারে আর সে মহামারীতে কোরআন-সুন্না'র পীযুষধারায় সিক্ত ইকবালের কবিতা জাতির বিবেকে মহৌষধের ভূমিকা পালন করতে পারে। একটা কবিতায় কবি কামনা করেছেনঃ

"হে রব! এই মুসলিমদের মনে জিন্দা তামান্না দান কর।"

জীবন্ত আকাঙ্ক্ষা বক্ষে ধারণ করে মুসলিম মিল্লাত আবার বিশ্ব নেতৃত্বের আসন খুঁজে নিক-এটাই ছিল ইকবাল কাব্যদর্শনের মূল সুর। এ জন্যে 'আসরারে খূদী কাব্যে তিনি মুসলিম-মানসের আত্মশক্তির (খূদীর) উদ্বোধন কামনা করেছেন। কবির দৃষ্টিতে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই মুমিন এই আত্মশক্তির অধিকারী হতে পারে। ভাগ্য সম্পর্কীয় জটিল চিন্তার গ্রন্থী তিনি এভাবে সহজেই উন্মোচন করেছেনঃ

"ব্যক্তিত্ব বিকাশ তব কর এইভাবে

যেন ভাগ্য লেখার আগে

বিধাতা এসে জিজ্ঞাসে

বলত বান্দা এতে তোমার অভিপ্রায় কি আছে?

ইকবালের খূদীর ধারণা আজ বিশ্বের গোলামী মানসিকাতাসম্পন্ন মুসলিম জাতির জন্য অন্যতম প্রতিষেধক। আজকের দিনে মুসলিম জাতির বিত্ত আছে। কিন্তু পরানুকরণের অন্ধকারে তারা 'স্বাধীন চিত্ত' হারিয়ে ফেলেছে। আজ তারা আল্লাহর খলিফা হওয়ার পরিবর্তে পাশ্চাত্যের খলিফা হওয়ার ভূমিকা পালন করছে। তাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি পাশ্চাত্যের ব্যর্থ মতবাদের ফসিলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আবার ইকবাল তাঁর কবিতায় কোরআন-সুন্না'র

রাজনৈতিক সত্যকে বাস্তবায়নের গুরুত্ব গভীরভাবে ব্যক্ত করে গেছেন। তার 'ইবলিসের পরামর্শ সভা' শীর্ষক কবিতায় তিনি সমাজ বিকাশের বৃহত্তর সংগ্রামকে পরিত্যাগ করে নিজেদের মধ্যে শুধু খানকায়ী মেজায় পোক্ত করাকে বিপজ্জনক বলে বর্ণনা করেছেন।

ইকবাল আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর সেই জিহাদী চেতনা ও ইসলামী বিশ্ববোধের ফসল আজো আমাদের কাছে আছে। আজ সে ফসল চয়ন করে তরুণ প্রজন্মের কাছে তাঁর চিন্তাধারা পৌছানোর দায়িত্ব আমাদের সবাইকে পালন করতে হবে। বৃহত্তর মুসলিম ঐক্যের পটভূমিতে সে দায়িত্ববোধের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক। আজ সারা বিশ্বে জুলুমতন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে মুসলিম উম্মাহ বেরিয়ে আসতে চায়। কেননা সে জানে "ইসলাম জিন্দা হোতা হায় হার কারবালা কে বাদ"। প্রত্যেক কারবালার পরেই ইসলাম নবজীবন লাভ করে। তাই নির্যাতনের কাঁটাতার পেরিয়ে জাতিকে তার পথ করে নিতে হবে।

রাশিয়ার পতনের পর মধ্য এশিয়ায় মুসলমানদের মধ্যে জাগরণ এসেছে। জাগরণ এসেছে বসনিয়া-হার্জেগোভিনায়। আলজিরিয়া, কাশ্মীর এবং ফিলিস্তীনের জুলুম নিপীড়ন মুসলিম মিল্লাতকে তার পথ থেকে সরাতে পারবে না। এক সুদূর বিশ্ববোধ তাদেরকে এক কাতারে দাঁড় করায়ে দেবে। ইকবালের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তারাও গাইবে।।

چین و عرب ھمارا، ھندوستان ھمارا
مسلم ھین ھم، وطن ھے ساراجھان ھمارا

অর্থাৎ, "চীন ও আরব আমাদের হিন্দুস্তান আমাদের

মুসলিম আমরা সারা দুনিয়া আমাদের।"

ইকবাল কাব্যের এই মর্মবাণীকে শুধু ঐতিহ্যের মাপকাঠিতে পরিমাপ করলে চলবে না। এ মর্মবাণী, মিল্লাতের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আন্তর্জাতিক মুক্তির মেনুফ্যাস্টো ঘোষিত হয়েছে। চীন, আরব ও হিন্দুস্তানে এককালে মুসলমানদের শান্তির পতাকা উত্তোলিত হয়েছে। আজ সে-সব জায়গায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না থাকায় মানবতা পদদলিত, সাধারণ মানুষ নির্যাতিত। মানবতার মুক্তির অভিপ্রায়ে আবার সে-সব স্থানে ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও শান্তির বাণী ছড়িয়ে দিতে হবে। সারা দুনিয়ায় একমাত্র ইসলামই পারে বিশ্ব নেতৃত্বের শূন্য আসনকে অলঙ্কৃত করতে। পুঁজিবাদী ফেতনা যেখানে অপারগ, শিরকের অন্ধকারে মানবতা যেখানে মুমূর্ষু তাওহীদ কি আমানত বা তাওহীদের আমানত বক্ষে বহনকারী মুসলিম মিল্লাতই সেখানে পারে কাঙ্ক্ষিত শান্তির স্বর্ণ-দুয়ারে মানব জাতিকে পৌছে দিতে। ইকবালের কবিতা আমাদেরকে সে চেতনায় উদ্দীপ্ত করুক। সমস্যা সংকুল আজকের বিশ্বে এটাই কাম্য।

ইকবালের দশটি কবিতা
আবদুল মান্নান তালিব অনূদিত

জ্ঞান ও প্রেম

জ্ঞান আমাকে বললো, প্রেম তো পাগলপনা
প্রেম বললো, জ্ঞান শুধু আন্দাজ ও ধারণা।
হে আন্দাজ ও ধারণার দাস, হয়োনা গ্রন্থকীট!
প্রেম আপাদমস্তক উপস্থিতি
আর জ্ঞান সবটুকু আবরণ।
প্রেমের উষ্ণতায় জীবন্ত পৃথিবীর সংগ্রাম
জ্ঞান বিধাতার গুণাবলীর সোপান
প্রেম তাঁর সত্তার উলংগ প্রকাশ,
প্রেম শান্তি ও স্থায়িত্ব, প্রেম জীবন ও মৃত্যু

জ্ঞান জিজ্ঞাসা আর প্রেম তার নিরব জবাব।
ফকিরি ও দীনের বাদশাহি প্রেমের অলৌকিক
শক্তির প্রমাণ,

প্রেমের তুচ্ছ দাসানুদাস
রাজমুকুট ও হীরার মালিক।
প্রেম বাসস্থান ও বাসিন্দা,
প্রেম কাল ও পৃথিবী
প্রেম আপাদমস্তক বিশ্বাস
আর বিশ্বাসই দ্বার উন্মোচন।
প্রেমের ধর্মে বিশ্রাম নেই, মনজিল নেই কোনো
তুফানের তাণ্ডব আছে,
সমুদ্রের কিনারার স্বাদ নেই জেনো।
প্রেম পথে উচ্ছসিত বিদ্যুৎ স্ফুরণ
প্রেমপথে পাওয়ার সব রুদ্ধ দ্বার
জ্ঞান যে কিতাবের সন্তান প্রেম তার মাতা।

ফিরিংগী—মুগ্ধ

[এক]

তোমার অস্তিত্ব পুরোপুরি ফিরিংগীর প্রকাশ
কেননা তাদের কারিগরের হাতে গড়া তুমি,
কিন্তু তোমার এ মাটির দেহ পিঞ্জর খুদীশূন্য
তুমি শুধু অস্ত্র শূন্য স্বর্ণাভ খাপ।

[দুই]

আল্লার অস্তিত্ব নেই তোমার দৃষ্টিতে
তোমার অস্তিত্ব নেই দৃষ্টিতে আমার,
অস্তিত্ব কি? খুদীর সারবস্তুর প্রকাশ
নিজের চিন্তা করো— অপ্রকাশ প্রতিভা তোমার।

নামায

পোশাক বদ্‌লে ওরা প্রতি যুগে আসে বারবার
যদিও আদম বৃদ্ধ, যুবক এখনো লাত ও মানাত
একটি সিজ্‌দা এই, যাকে তুমি কঠিন ভেবেছো
হাজার সিজ্‌দা থেকে মানুষকে দিয়েছে নাজাত।

কাফের ও মুমিন

খিজির বললো আমাকে কাল এক সমুদ্র তটে
প্রতিষেধক খুঁজছো তুমি ফিরিংগী জহরের?
একটি তত্ত্ব জানি আমি তীক্ষ্ণ তরবারি বটে
উজ্জ্বল শাণিত আর গতি বিদ্যুতেরঃ

পৃথিবী পৃষ্ঠে হারিয়ে যাওয়া কাফেরের পরিচয়
মুমিনের মাঝে পৃথিবী বেমালুম গুম হয়ে যায়।

মুমিন

[দুনিয়ায়]

বন্ধুদের মহফিলে সে কোমল রেশমের মতো
হক ও বাতিলের সংগ্রামে সে ইস্পাত কঠিন

আকাশের সাথে তার মহাপ্রতিদ্বন্দ্বিতা
মাটির তৈরি হলেও মৃত্তিকার নয় সে অধীন।

চড়ুই আর কবুতর শিকারে প্রলুব্ধ নয় সে
জিব্রীল ও ইস্রাফীলের শিকারী মুমিন।

[জান্নাতে]
ফেরেশ্‌তারা বলে ঃ হৃদয় প্রলুব্ধ করে মুমিন
মুমিন মিশুকে নয়– অভিযোগ হুরীদের নয় অর্থহীন।

তকদীর

[ইবলিস ও আল্লাহ]
ইবলিস ঃ
হে খোদা! আদমের সাথে আমার ছিল না শত্রুতা,
আহা! সে জীবন কয়েদির মতো
নিকট, দূর আর বিলম্ব ও দ্রুত
তবুও দম্ভোক্তি তোমার সামনে ছিল অসম্ভব
আমার সিজ্‌দাটির তোমার ইচ্ছার বুকে হয়নি উদ্ভব।

আল্লাহ ঃ
এ রহস্য জানলে কখন
বিদ্রোহের পূর্বে, না পরক্ষণ?
ইবলিস ঃ
এ রহস্য জেনেছি পরে
হে খোদা! তাজাল্লি তোমার সৃষ্টিরে পূর্ণ করে।
আল্লাহ (ফেরেশতাদের সম্বোধন করে) ঃ
নিম্নমুখী স্বভাব তার
শিখিয়েছে এ যুক্তি অসার,
তাই তো বলে তোমার ইচ্ছার বুকে
ছিল না সিজ্‌দা আমার,
তাই তো অক্ষমতা নাম দেয়

সে তার স্বাধীনতার,
জ্বলন্ত অগ্নিকে ধূম্রজাল বলা
জালিমের কাজ।

লক্ষ্যবস্তু

স্পিনোজা ঃ
জীবনের পথে দৃষ্টি নিবদ্ধ প্রাজ্ঞ মানুষের
জীবনটা কি? বর্তমান, আনন্দ, আলোক ও অস্তিত্ব।

প্লেটো ঃ
মৃত্যুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রাজ্ঞ মানুষ
আঁধার রাতের বুকে স্ফুলিংগের প্রকাশই জীবন।

জীবন–মৃত্যু নয় কোনো চিন্তার ব্যাপার
খুদীর দৃষ্টির লক্ষ্য বিন্দু খুদী ছাড়া আর কিছু নয়।

রহস্য জ্ঞান

যে জ্যোতির্বিদ দৃষ্টি রাখে
আকাশ নিসীমে
জানে না তার আপনার খুদীর পর্যায়।
আকাশের উর্ধ্বে
যে নিরীক্ষণ করলো খুদীকে
সে জানে রহস্য
দিবারাত্রির বিশ্ব জাহানের,
সে জানে রহস্য
দৃষ্টির শ্রী আর শ্রীহীনতার,
সে জানে রহস্য
অন্তরের হালাল হারামের।

নারী

নারীর অস্তিত্বেই রঙ্গিন বিশ্ব জাহানের ছবি
তারি সুরে উত্তপ্ত জীবনের হৃৎপিন্ড

তার এক মুঠো মাটি সম্মানিত সপ্তর্ষির চেয়েও
কেননা সব সম্মান ঐ সিন্দুকের মূল্যবান মোতির।

প্লেটোর থিওরী লেখার সামর্থ্য হয়নি তার একথা ঠিক
কিন্তু তারি অগ্নিশিখায় জন্ম নিল প্লেটোর স্ফুলিংগ।

নারী স্বাধীনতা

এ বিতর্কের সুরাহা নেই আমার কাছে তবুও
নিশ্চিত আমি ঃ এটি বিষ ওটি মধু,
প্রয়োজন কি মন্তব্যে, আমি হই আরো বিরাগভাজন,
সভ্যতার বরপুত্ররা ইতিপূর্বেই বিক্ষুব্ধ আমার প্রতি,
নারীর অন্তরদৃষ্টিই এ রহস্য ভেদ করুক
অক্ষম বিজ্ঞজনেরা, নিশেষ তাদের শক্তি।

মূল্যমান ও সৌন্দর্যের নিরিখে গুরুত্ব বেশী কার
নারী স্বাধীনতা অথবা মুক্তামালার?

নারীর সংরক্ষণ

একটি জীবিত সত্য নিহিত আমার বুকে,
যার শিরায় প্রবহমান শীতল রক্ত সে
তা বুঝবে কেমন করে!
পর্দা অথবা শিক্ষা
নতুন হোক বা পুরাতন
অক্ষম সবাই,
নারিত্বের সংরক্ষণ ও লালন
সম্ভব একমাত্র পুরুষের হাতেই।
যে জাতি পায়নি এ জীবন্ত সত্যের সন্ধান
তার সূর্য শিখা ম্লান হয়ে যাবে অচিরেই।

কাদিয়ানী মতবাদ সম্পর্কে ইকবাল-নেহরু পত্রালাপ

আবু খালিদ অনূদিত

কলিকাতার Modern Review পত্রিকায় কাদিয়ানীদের সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর তিনটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন গ্রুপের মুসলমান আমার কাছে চিঠিপত্র লিখতে থাকেন। কতিপয় পত্র-লেখক কাদিয়ানীদের সম্পর্কে ভারতীয় মুসলমানদের মনোভাব সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার জন্য এবং এ ব্যাপারে তারা যে ন্যায় পথে আছেন তা প্রমাণ করার জন্য আমাকে অনুরোধ জানান।

আবার কয়েকজন পত্র-লেখক কাদিয়ানী সমস্যা সম্পর্কে আমি কি মত পোষণ করি তা জানানোর জন্য অনুরোধ করেন। আমার মতে যে-সব দাবী সম্পূর্ণ সত্য-আমি সর্ব প্রথম তা পূর্ণ করব। অতঃপর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যে সব প্রশ্ন উথাপন করেছেন তার উত্তর দেব। আমার আশংকা হচ্ছে এই বক্তব্যের কোন কোন অংশ খুব সম্ভব পন্ডিতজীর জন্য সুখকর হবে না। আমার পরামর্শ, তিনি যেন ঐ সব অংশ এড়িয়ে যান। তাহলে অযথা তার সময় নষ্ট হবে না।

এ কথা বলবার প্রয়োজন রাখে না যে, আমার মতে প্রাচ্যের বরং সারা বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহের মধ্যে এটা অন্যতম সমস্যা।

এ ব্যাপারে পণ্ডিতজী যে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন সে জন্য আমি তাকে মোবারকবাদ জানাই। আমি মনে করি, ইসলামী দুনিয়ার বর্তমান আধ্যাত্মিক অশান্তি অনুধাবন করার জন্য ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই অশান্তির বিভিন্ন দিক এবং সম্ভাব্য প্রভাব রয়েছে। এ জন্য আমাদের দাবী হচ্ছে ভারতের চিন্তাশীল রাজনৈতিক নেতা এ সমস্যাটি সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য হৃদয়ের দরজা উন্মুক্ত করে দেবেন। কারণ এই (কাদিয়ানী) সমস্যাটি বর্তমান সময় মুসলমানদের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করে চলছে। আমি পণ্ডিতজী অথবা তার বিবৃতি পাঠকারীদের কারো কাছে গোপন রাখতে চাই না যে, পণ্ডিতজীর বিবৃতি আমার মনে যথার্থই বেদনার সৃষ্টি করেছে। যেমন বেদনা সৃষ্টি করেছিল স্পিনোজার *

---

* স্পিনোজা (Benedict de Spinoza) সপ্তদশ শতকের একজন প্রখ্যাত ইউরোপীয় দার্শনিক। তিনি পর্তুগীজ, ফরাসী ও জার্মান ভাষাসহ মহাদেশের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ ভাষাগুলোই জানতেন। তিনি ১৬৩২ সালের ২৪ শে নভেম্বর এক ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৭৭ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ হল্যাণ্ড প্রদেশের রাজধানী হেগে (Hague) মারা যান। তিনি (Ethica) গ্রন্থে বাইবেলের পুরাতন নিয়োগের সমালোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'আল্লাহর কোন দৈহিক আকৃতি নেই' এ সমর্থনে বাইবেলে কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া তিনি ফেরশতার অস্তিত্ব, আত্মার অমরত্বকে অস্বীকার করেন। তার মতে বাইবেলের আদি পুস্তকের রচয়িতা পদার্থবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্বে তাদের (অর্থাৎ স্পিনোজা ও তার সহযোগীদের) চেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলেন না। তার এ বক্তব্য আমাস্টার্ডামের ইহুদীদের ক্ষিপ্ত করে তোলে। এখানকার ইহুদী কর্তৃপক্ষ ঘুষ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাকে এরূপ মত ব্যক্ত করা থেকে বিরত রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করে। ১৩৫৬ সালে ইহুদী কর্তৃপক্ষ তাকে সমাজচ্যুত করে এবং সিভীল কর্তৃপক্ষ তাকে নির্বাসন দেয়।

বক্তব্য আমাস্টার্ডামের ইহুদী সমাজের মনে। কারণ তিনি নিজে ইহুদী হওয়া সত্ত্বেও ইহুদীদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আকিদা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আমাস্টার্ডামের অভ্যন্তরে ইহুদীরা ছিল সংখ্যালঘু। অতএব স্পিনোজাকে একজন পথভ্রষ্ট ইহুদী আখ্যা দেয়ার ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত ছিল সম্পূর্ণ নির্ভুল, কেননা তার মতবাদ ইহুদী জাতীয় বিশ্বাসের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছিল। অনুরূপভাবে ভারতীয় মুসলমানরা কাদিয়ানী আন্দোলনকে ভারতের মুসলমানদের সামাজিক জীবনের জন্য ভয়ংকর সাব্যস্ত করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। কাদিয়ানী আন্দোলন সমগ্র ইসলামী দুনিয়াকে কাফের ঘোষণা করেছে এবং কাদিয়ানীরা মুসলমানদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করে চলেছে। স্পিনোজার আধিভৌতিক দর্শন ইহুদীদের সামগ্রিক জীবনের জন্য এতটা ভয়ংকর ছিল না। আমি মনে করি, ভারতের মুসলমানরা যে বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে আছে সে সম্পর্কে তারা মূলতই সঠিক ধারণা রাখে। অন্য যে কোন দেশের মুসলমানদের তুলনায় প্রমাণ করে মুসলমানরা বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলো সম্পর্কে অধিক সচেতন। আমার মতে, মুসলমান সর্বসাধারণের এই বোধশক্তি সম্পূর্ণ ঠিক। এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, ভারতীয় মুসলমানদের মনে এর ভিত্তি অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত। যারা এই ধর্মের ব্যাপারে সহিষ্ণুতা ও উদারতার কথা বলে তারা এ শব্দটির ব্যবহারে সীমাহীনভাবে অসতর্ক। বরং আমার সন্দেহ হচ্ছে তারা উদারতা ও সহিষ্ণুতার অর্থই বোঝে না।

কাদিয়ানী মতবাদ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই ছিল যে, এটা একটা নতুন ধর্ম মতের প্রবর্তন করেছে। আমার এ বর্ণনা কাদিয়ানী এবং পণ্ডিতজী উভয়কে সমস্যায় ফেলেছে। এর কারণ হচ্ছে, তারা উভয়ে (কাদিয়ানী এবং পণ্ডিতজী) ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ঐক্য ও একমুখীনতার সম্ভাবনাকে বিশেষ করে ভারতের অভ্যন্তরে মোটেই পছন্দ করে না। যদিও উভয়ের এই অনুচ্ছেদের কারণসমূহ ভিন্নতর। এটা সুস্পষ্ট যে, উত্তর ভারত ও পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের মাঝে আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়াটা ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের কাছে মোটেই পছন্দনীয় নয়। আমার মতে, তারা ভ্রান্তির শিকার হয়ে মনে করে হিন্দু জাতীয়তাবাদের খাতিরে দেশের অন্যসব তাহযীব–তমদ্দুনকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।

অথচ তাদেরই সহযোগিতায় এখানে ব্যাপক এবং স্থায়ী সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা যে নিয়ম পন্থার পৃষ্ঠপোষকতার ভিত্তিতে যে জাতীয়তা অস্তিত্ব লাভ করবে তার ফলে পারস্পরিক তিক্ততাই সৃষ্টি হবে। এ কথাও পরিষ্কার যে, কাদিয়ানীরাও অনুরূপভাবে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক জাগরণে ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। কেননা তারা অনুভব করে যে, যদি ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বেড়ে যায় তাহলে কাদিয়ানীরা রাসূলে আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত থেকে নিজেদের

হিন্দুস্থানী নবীর নতুন উম্মতের সৃষ্টি করার যে ষড়যন্ত্র এঁটেছে তা নিশ্চিতরূপেই এলোমেলো হয়ে যবে। আমি ভারতীয় মুসলমানদের সতর্ক করে দিতে চাচ্ছিলাম যে, ভারতের অভ্যন্তরে তাদের ইতিহাসের যে নাজুক সময় অতিবাহিত হচ্ছে এ সময় তাদের পারস্পরিক ঐক্য একান্ত প্রয়োজন। আমি তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে দিলাম যেগুলো সংস্কারের ছদ্মবেশে মাঠে নেমেছে। আমার এই প্রচেষ্টা পণ্ডিতজীকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে। পণ্ডিতজীর এই ভূমিকা অত্যন্ত দুঃখজনক। যা–ই হোক, পণ্ডিতজীর বক্তব্যের জের টানতে আমি আর চাই না। যে সব লোক কাদিয়ানীদের সম্পর্কে মুসলমান সর্বসাধারণের মনোভাব বিস্তারিতভাবে জানতে চেয়েছেন, আমি তাদের উপকারের জন্য ড্যুরান্টের "দর্শনের কথা" বই থেকে একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি। এর ফলে সাধারণ শিক্ষিত লোকদের সামনে কাদিয়ানীদের ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ড্যুরান্ট সাহেব স্পিনোজার মত প্রখ্যাত দার্শনিককে ইহুদী সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া সম্পর্কে ইহুদীদের দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র কয়েকটি লাইনে পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যক্ত করেছেন। আগ্রহী পারসিকগণ যেন একথা মনে না করেন যে, আমি এই উদ্ধৃতি পেশ করে অযথা স্পিনোজা এবং আহমদী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে তুলনা করার প্রয়াস পাচ্ছি। জ্ঞান–গরিমা এবং চরিত্র ও নৈতিকতার দিক থেকে এই দু'জনের মধ্যে আসমান–জমিন ফারাক। স্পিনোজা কখনো দাবী করেননি যে, তিনি কোন নতুন সংগঠনের কেন্দ্রবিন্দু এবং যে ইহুদী তার উপর ঈমান আনবে না, সে ধর্ম থেকে বিচ্যুত বলে গণ্য হবে। অতএব স্পিনোজার ধর্মত্যাগী ঘোষণা করার ব্যাপারে ইহুদীদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত ড্যুরান্টের উদ্ধৃতি–কাদিয়ানী মতবাদের ক্ষেত্রে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে কয়েকগুণ বেশি সামঞ্জস্যশীল। ড্যুরান্ট বলেছেনঃ

"তা ছাড়া ইহুদী বিশেষজ্ঞদের রায় ছিল যে, আমাস্টার্ডামের ইহুদীদের এই ক্ষুদ্র দলকে বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করার জন্য 'ধর্মীয় ঐক্য' এবং একতাই হল একমাত্র উপায়। খুব সম্ভব এই ঐক্য অটুট রাখার জন্য তাদের ধর্মীয় অখন্ডতাই ছিল সর্বশেষ হাতিয়ার। ইহুদী জাতীয় লোকেরা দুনিয়ায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার আর কোন উপায় ছিল না। যদি তাদের নিজস্ব কোন রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় আইন অথবা নিরপেক্ষ কোন সংজ্ঞা থাকত তাহলে এর মাধ্যমে তারা নিজেদের অভ্যন্তরীণ ঐক্য এবং বহির্বিশ্বে আস্থা অর্জন করতে পারত এবং খুব সম্ভব তারা অধিক সহিষ্ণু ও উদার হতে পারত।"

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীন দুটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এক· আল্লাহ এক· (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), দুই· মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

দুনিয়াতে মানব জাতিকে জীবনযাপনের সঠিক পদ্ধতি শেখানোর জন্য বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন এলাকায় যে সব নবী–রাসূলের আগমন ঘটেছিল তিনি এই ধারায় সর্বশেষ নবী।

ইরানে বাহাইদের বিরুদ্ধে যে সব কারণে সেখানকার মুসলমানরা খড়গহস্ত ঠিক একই কারণে ভারতীয় মুসলমানরা কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে চরম ভাবাপন্ন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, কাদিয়ানীদের বই পুস্তকে প্রকাশ্যভাবেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুফরীর ফতোয়া দেয়া হয়েছে। এখানে বলা দরকার যে, আহমদী আন্দোলন দু'টি গ্রুপে বিভক্ত। একটি হচ্ছে কাদিয়ানীদের গ্রুপ, অপরটি লাহোরী গ্রুপ। কাদিয়ানী গ্রুপ আহমদী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতাকে (গোলাম আহমদ) একজন পূর্ণাংগ নবী বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু লাহোরী গ্রুপ আকীদাগতভাবে অথবা পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য করে কাদিয়ানী মতবাদকে মধ্যম সুরে পেশ করে থাকে। তবুও দুই গ্রুপের মধ্যে যে বিষয়টি নিয়ে বিবাদ তা হচ্ছে-"কাদিয়ানী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতার নবুওয়তকে অস্বীকার করলে কেউ কাফের হবে কি-না?" কাদিয়ানীদের এই অন্তর্দ্বন্দ্বে কোন গ্রুপের মত ঠিক তার পর্যালোচনা করা আমার উদ্দেশ্যের জন্য জরুরী নয়। আমি মনে করি এবং কারণও সামনে অগ্রসর হয়ে পেশ করব যে, এমন নবীর ধারণা যার অস্বীকৃতি ইসলামী মিল্লাত থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। বিচ্ছিন্ন করে দেয়-কাদিয়ানী মতবাদের মূল ভিত্তি। ইসলামের খতমে নবুওয়াতের ধারণার সামাজিক সাংস্কৃতিক মূল্যমানের বিস্তারিত আলোচন আমি অন্য এক জায়গায় করেছি। এর অর্থ খুবই সোজা। যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ইসলাম বলা হয় তা পূর্ণাঙ্গ ও চিরন্তন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর এমন কোন ইলহাম আসা মোটেই সম্ভব নয় যা অস্বীকার করলে কেউ কাফের হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি এই ধরনের ইলহামের দাবী করবে সে-ই ইসলামের শত্রু সাব্যস্ত হবে। যেহেতু কাদিয়ানীদের আকীদা হচ্ছে-এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ইলহামের অধিকারী ছিল-এ জন্য তারা ইসলামী দুনিয়াকে কাফের সাব্যস্ত করে। স্বয়ং কাদিয়ানী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার দাবী হচ্ছে ইসলামের পূতঃপবিত্র নবীর রূহানী শক্তি যদি পরবর্তী স্তরের নবীর সৃষ্টি না করে তাহলে এই রূহানিয়াতকে অকৃতকার্য ও ব্যর্থ মনে করতে হবে।

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজের নবুওয়াতকে ইসলামের মহান নবীর নবুওয়াত ও রূহানী শক্তির পক্ষে সাক্ষ্য হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু আপনি যদি তাদেরকে এই প্রশ্ন করেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূহানিয়াত কি একাধিক পয়গাম্বরের জন্ম দিতে পারে? তাহলে তারা এর না-সূচক উত্তর দেবে। এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে মুহাম্মদ (সঃ) সর্বশেষ নবী নন (নাউযুবিল্লাহ) সর্বশেষ নবী হচ্ছি আমি (মির্যা গোলাম আহমদ)।

কাদিয়ানী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণভাবে মানব জাতির ইতিহাসে, বিশেষ করে এশিয়া মহাদেশের ইতিহাসে খতমে নবুওয়াতের ইসলামী চিন্তা দর্শনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। তার মতে খতমে নবুওয়াতের অর্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন উম্মত তার সমান যোগ্যতা ও মর্যাদাসম্পন্ন নবী হতে পারবে না।

তার নবুওয়াতের মধ্যে অপূর্ণতার চিহ্ন রয়ে গেছে। তার এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, তিনি নিজে নবুওয়াতের দাবী করার উদ্দেশ্যে ইসলামের এই মহান পয়গম্বরের বিশেষত্বকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছেন–আর এর নাম দিয়েছেন তাখলিকী রূহানিয়াত। এরই সাথে সাথে তিনি রাসূলুল্লাহর সর্বশেষ নবী হওয়ার ব্যাপারটি অস্বীকার করেন। কেননা তথাকথিত এই রূহানিয়াতের সৃষ্টি শক্তি মাত্র একজন নবীর সৃষ্টি অর্থাৎ কাদিয়ানী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এভাবে এই নতুন নবী নিঃসাড়ে সেই মহান পয়গম্বরের সর্বশেষ নবী হওয়ার উপর আক্রমণ চালান, যাকে তিনি নিজের রূহানী পূর্ব পুরুষ বলে দাবী করেন। কাদিয়ানী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলেন, আমি হচ্ছি ইসলামের মহান নবীর বুরুয (অবতার)। এ ভাবে তিনি প্রমাণ করতে চান যে, তিনি রাসূলুল্লাহর বুরুয হওয়ার প্রেক্ষিতে তার শেষ নবী হওয়া মূলত রাসূলুল্লাহর শেষ নবী হওয়া।

মনে হয়, যেন ব্যাপারটি এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে রাসূলুল্লাহর শেষ নবী হওয়ার বিরোধিতা করা হয় না। তিনি নিজের শেষ নবী হওয়া এবং রাসূলুল্লাহর শেষ নবী হওয়াকে একই বস্তু ঘোষণা করে খতমে নবুওয়াতের চিরন্তন ও বিশ্বজনীন অর্থ থেকে চোখ বন্ধ করে নিয়েছেন।

তবুও একথা পরিষ্কার যে, "বুরুয" শব্দের অর্থ "পূর্ণাঙ্গরূপে সাদৃশ্য" হলেও এতে তার কোন ফায়দা হবে না। কেননা বুরুয আর যা–ই হোক মূল থেকে পৃথক হবে। শুধু অবতারের ক্ষেত্রে মূলের সাথে যুক্ত হবে। সুতরাং বুরুয শব্দের অর্থ যদি রূহানী বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সাদৃশ্য মনে করা হয় এই প্রমাণ অর্থহীন। কিন্তু আমরা যদি আর্য মতবাদ অনুযায়ী বুরুয শব্দের অর্থ 'অবতার' করি তাহলে প্রকাশ্য এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু সাথে সাথে এটাও প্রকাশ হয়ে পড়বে যে, এ অবতারবাদের প্রস্তাবক হচ্ছে এক অগ্নি উপাসক, যে নিজের মুখোশ পরিবর্তন করে নিয়েছিল।

এখন আমি কাদিয়ানী মতবাদের তত্ত্ব আলোচনায় আসছি। ধর্মের তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে এর উৎসের উপর আলোচনা করা খুবই চিত্তাকর্ষক হবে। এ প্রসঙ্গে ইসলাম–পূর্ব মজুসী (অগ্নি উপাসক) দর্শন কি করে ইসলামী তাসাউফের মাধ্যমে কাদিয়ানী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতার উপর আছর করেছে তাও আলোচনায় এসে যাবে। কাদিয়ানী মতবাদের গূঢ় রহস্য মধ্যযুগের তাসাউফ ও ধর্ম–তত্ত্বের গর্তের মধ্যে লুকিয়ে আছে। উপমহাদেশের আলেমগণ এটাকে একটা ধর্মীয় আন্দোলন মনে করে তাকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য ধর্মীয় অস্ত্র প্রয়োগ করেন। আমি মনে করি, এই আন্দোলনের মূলোৎপাটনের জন্য এই পন্থা উপযুক্ত ছিল না। এ কারণে আলেমগণ এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে আংশিকভাবে কৃতকার্য হয়েছেন। আহমদী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যে সব ইলহামের দাবী করেছেন, সতর্কতার সাথে যদি তার মনোস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে খুব সম্ভবমূল ব্যক্তির সাথে অভ্যন্তরীণ জীবনে একটি দিক জনসমক্ষে নিয়ে আসার জন্য এটি একটি কার্যকরী পন্থা হবে।

সাধারণ লোকদের জন্য এর আরো একটি কার্যকর পন্থা আছে। অর্থাৎ, ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় চিন্তা–দর্শনের ইতিহাস অন্তত ১৭৯৯ সাল থেকে দৃষ্টির সামনে রাখতে হবে এবং এর আলোকে আহমদী ধর্মের রহস্য অনুধাবন করতে হবে। ১৭৯৯ সাল ইসলামী দুনিয়ার ইতিহাসে সীমাহীন গুরুত্বের দাবীদার। এই বছর টিপু সুলতান শহীদ হন এবং তাঁর শাহাদাতবরণ করার সাথে সাথে ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিপ্রত্তি ও আশা–আকাঙ্ক্ষার সবগুলো আলোকবর্তিকা নিভে যায়। একই বছর নাওয়ারীপের যুদ্ধে তুরস্কের প্রতিরোধ শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি টিপু সুলতানের শাহাদাতের তারিখ লিখেছে, সে খুব প্রশস্ত দৃষ্টির অধিকারী ছিল। এই তারিখ তার কবরের দেওয়ালের ওপর খোদিত আছেঃ

ذهب عن الروم و الهند كاملا ـ

(তুরস্ক এবং ভারতের শৌর্য বীর্য সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে গেলো)।

এভাবে ১৭৯৯ সালে এশিয়া মহাদেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক পতন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। এই পতনের ফলশ্রুতিতে বর্তমান সময়ের ইসলাম জন্ম নেয় এবং সাথে করে অসংখ্য সমস্যা নিয়ে আসে। মুসলিম জনগণের গভীর ধর্মানুরাগকে কেবল একটি জিনিসই নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করতে পারত, তা ছিল আসমানী সনদ বা প্রতিনিধিত্ব।

তাদের নির্ভেজাল আকীদা–বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করার জন্য ইসলামী ভিত্তি অন্বেষণ করা প্রয়োজন মনে করা হল।

অদ্ভুত সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত ধর্মীয় মূলনীতিগুলোর রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন মনে করা হল। আহমদী ধর্ম এই ইসলামী ভিত্তি সরবরাহ করল। স্বয়ং আহমদী ধর্মের লোকদেরও দাবী হচ্ছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জন্য এটা ছিল সবচেয়ে বড় খেদমত এবং এই খেদমত তারাই করেছে। রাজনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন ধর্মীয় মতবাদের ইসলামী ভিত্তির জন্য যে নবুওয়াত দাবী করা হচ্ছে তার অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি নবুওয়াতের এই দাবীদারের মতবাদ গ্রহণ না করবে, সে সম্পূর্ণরূপে কাফের হয়ে যাবে এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম।

আহমদীদের সাধারণ বিশ্বাস হচ্ছে, মসীহ (ঈসা আঃ) একজন সাধারণ মানুষের মতই মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তার পুনরাবির্ভাবের অর্থ হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হওয়া যিনি রূহানী দিক থেকে ঈসার অনুরূপ হবেন। আমার মতে, এটা ছিল গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবুওয়াত দাবীর প্রথম পদক্ষেপ। যে দেশ তাহযীব–তমুদ্দুনের প্রাথমিক পর্যায় অবস্থান করছে,

যেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক মূর্খ, যেখানে নির্বোধসুলভ সু–ধারণা বিরাজ করছে– সেখানে কোন ব্যক্তির খোদায়ী ইলহামের দাবীদার হওয়া, তা অস্বীকারকারীকে কাফের বলা, কোন পরাধীন দেশে এরূপ রাজনৈতিক প্রতারণাপূর্ণ ধর্মমত আবিষ্কার করা এবং এর জন্য একটি দল গঠন করা সহজ কাজ। কেননা রাজনৈতিক গোলামীই তাদের কাম্য। পাঞ্জাবের সরল প্রকৃতির কৃষক যারা শত শত বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তারা অস্পষ্ট ধর্মীয় পরিভাষার ষড়যন্ত্র জালে জড়িয়ে পড়ে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সব ধর্মের লোকদের এক হয়ে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন এবং তিনি যেটাকে ভারতীয় জাতীয়তা মনে করছেন তার প্রকাশ ও প্রচারে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবী জানাচ্ছেন, এই বিদ্রুপাত্মক পরামর্শের মধ্যে আহমদী মতবাদকে একটি সংস্কার আন্দোলন মনে করা হয়েছে। পণ্ডিতজীর জানা নেই, ভারতের ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত আহমদী মতবাদের মধ্যে একান্ত গুরুত্বপুর্ণ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা নিহিত রয়েছে। আমি আগেই বলে এসেছি, ইসলামের ধর্মীয় চিন্তার ইতিহাসে আহমদী মতবাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভারতের অভ্যন্তরে বর্তমান রাজনৈতিক গোলামীর জন্য ইলহামী ভিত্তি সরবরাহ করা, নিরেট ধর্মীয় সমস্যাকে বাদ দিয়ে। শুধু রাজনৈতিক ভিত্তিতে পণ্ডিতজীর মত ব্যক্তিত্বের পক্ষে ভারতীয় মুসলমানদের রক্ষণশীলতার সমালোচনা করা মোটেই শোভা পায় না। তিনি যদি আহমদী মতবাদের নিগূঢ় তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত থাকতেন তাহলে আমার কোনই সন্দেহ নেই যে, তিনি সমস্যাসংকুল ভারতে আসমানী ইলহামের দাবীদার একটি ধর্মীয় আন্দোলন (কাদিয়ানী মতবাদ) সম্পর্কে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশংসার যোগ্য মনে করতেন। আগ্রহী পাঠকদের কাছে পরিষ্কার করে বলতে চাই যে, আজ ভারতে ইসলামের গন্ডদেশে কাদিয়ানী মতবাদের যে পান্ডুরবর্ণের আবির্ভাব হয়েছে তা এ দেশের মুসলমানদের ধর্মীয় চিন্তার ইতিহাসে কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। যে চিন্তা দর্শন শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছে তা আহমদী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গোলাম আহমদের জন্মেরও অনেক পূর্বে ধর্মীয় আলোচনা ও বিতর্কের মধ্যে প্রতীয়মান হয়েছিল। আমি এ কথা বলতে চাই না যে, আহমদী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং তার সহযোগীরা বুঝে–শুনেই নিজেদের কর্মসূচী তৈরী করেছে, বরং আমি বলতে চাই, আহমদী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা অবশ্যই কোন অদৃশ্য আওয়াজ শুনে থাকবেন। তবে এ আওয়াজ কি চিরঞ্জীব আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, না জনসাধারণের আধ্যাত্মিক দেউলিয়াত্বের সুযোগ নিয়ে উঠেছে– তা সৃষ্ট আন্দোলনের ধরন এবং এই আওয়াজ শ্রবণকারীদের চিন্তা–ভাবনা ও আবেগের ধরন থেকেই বোঝা যাবে।

মানব জাতির ইতিহাস আমাদের বলে দিচ্ছে যে, যখন কোন জাতির মধ্যে জোয়ারের পর ভাটা শুরু হয় তখন তাদের এই পতনই ইলহামের উৎসে পরিণত হয়। কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, পীর, আউলিয়া প্রভৃতি এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। সাথে সাথে আহবানকারীদেরও

এমন একটি দল তৈরী হয়ে যায়, যারা যাদুকরী বক্তব্যের মাধ্যমে মানুষকে তার সমস্ত কদাকার পোশাক পরিধান করাতে উঠেপড়ে লেগে যায়। বিভ্রান্তির শিকার হয়ে যারা তাদের যাদুজালে আটকে পড়ে এরা তাদের বিচারবুদ্ধিকে চিরতরে খতম করে দেয়। যারা আসমানী সনদের ভিত্তিতে রাজনৈতিক পরিবেশ–পরিস্থিতিকে সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত জিনিস মনে করে সে জাতির ক্ষয়িষ্ণু সংকল্পের আগমন করে নেয়াই যথেষ্ট।

আমি মনে করি, যে–সব উপাদান কাদিয়ানী মতবাদের নাটকে অংশগ্রহণ করেছে তা ছিল অধপতনের হাতের সাদামাটা হাতিয়ার। ইরানেও এ ধরনের নাটক অভিনীত হয়েছিল। কিন্তু ভারতে কাদিয়ানীরা ইসলামের জন্য যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল–ইরানে সে ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। রাশিয়াবাসীদের (বাহায়ী) সহিষ্ণুতার দরজা খুলে দিয়েছিল এবং আশেকাবাদে তাদের প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করার অনুমতি দিয়ে ছিল। অনুরূপভাবে বৃটিশ সরকার কাদিয়ানীদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করেছিল। তাদেরকে ওকিং–এ প্রথম প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করার অনুমতি দিয়ে ছিলেন। তাদের এই সহযোগিতা এশিয়া মহাদেশে ইসলামের জন্য কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করে। ইসলামের গঠন–প্রকৃতি সম্পর্কে আমার যে ধারণা রয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে বিন্দু পরিমাণও সন্দেহ নেই যে, ইসলামের জন্য এভাবে যে সমস্যা সৃষ্টি করা হয়েছে–তা থেকে সে অধিকতর পবিত্র হয়ে বের হয়ে আসবে।

যুগের হাওয়া বদলে যাচ্ছে। ভারতের পরিস্থিতি নতুন দিকে মোড় নিচ্ছে। দেশের মধ্যে গণতন্ত্রের নতুন ধারার প্রসার ঘটেছে। এটা নিশ্চয়ই কাদিয়ানীদের চোখ খুলে দেবে। তারা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারবে যে, দ্বীপের মধ্যে যে নতুন জিনিস তৈরী করেছে তা সম্পূর্ণই অনর্থক। আহমদী মতবাদ সেমিটিক এবং বেদান্ত দর্শনের একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এই মতবাদ অনুযায়ী ধর্মের পুনরুজ্জীবনের অর্থ এই নয় যে, ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ জীবন প্রাচীন ইসলামী তাসাউফের মূলনীতি অনুযায়ী সংশোধন করা হবে; বরং গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মাওহুদের শূন্যস্থান পূর্ণ করে সাধারণ মানুষের অপেক্ষায় পরিসমাপ্তি ঘটাতে চেয়েছিলেন। জনগণকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করা এই মসীহ মাওহুদের উদ্দেশ্য নয়; বরং তাদেরকে পরাধীন গোলাম হিসাবে পতনের হাতে তুলে দেয়া ছিল তার উদ্দেশ্য। তার এই কর্মতৎপরতার মধ্যে চরম স্ববিরোধিতা বর্তমান রয়েছে। অর্থাৎ, আহমদীরা একদিকে ইসলামকে নিজেদের জন্য ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছে, অপরদিকে এর শিকড় কাটতে তৎপর রয়েছে।

সৌজন্যেঃ মাসিক পৃথিবী

ইকবালেরঐতিহাসিক লাহোর ভাষণের ওপর যৎকিঞ্চিৎ

মোহাম্মদ রূহুল আমীন

লাহোরে নিখিল-ভারত মুসলিম সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩২ সালের ২১ মার্চ। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এ সম্মেলন বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। উক্ত সম্মেলনে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন আধুনিক বিশ্বে ইসলামের মর্মবাণীর সার্থক ব্যাখ্যাকার, ইসলামী রেনেসাঁস আন্দোলনের পুরোধা ডঃ আল্লামা স্যার মুহাম্মদ ইকবাল। সম্মেলনে আল্লামা ইকবাল মুসলিম মিল্লাহ তথা ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের বিধর্মী হায়েনার নাগপাশ থেকে মুক্তির দিক-নির্দেশনায় বিশ্লেষণধর্মী ভাষণ প্রদান করেন। তিনি মুসলমানদের চোখে আঙুল দিয়ে প্রতিটি সমস্যার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। ইকবাল মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, অতীত কীর্তি গাথার প্রতি আকৃষ্ট করার সফল প্রয়াস পান।

তিনি যে ভাষণ প্রদান করেন তার শিরোনাম ছিলো- 'ঐক্য, সংহতি, সংগঠন'। প্রদত্ত ভাষণে ইকবাল প্রাচ্যের অনগ্রসরতা এবং পাশ্চাত্যের নির্ভীক পদচারণার কারণ ব্যাখ্যা করেন। দীর্ঘ বক্তৃতার শেষে ইকবাল মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের জন্য দিক-নির্দেশ করেন ৫টি প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে। এ পর্যায়ে আমরা ইকবালের প্রস্তাব ৫টি উপস্থাপন করার প্রয়াস পাবো।

প্রথম প্রস্তাব ঃ আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, বর্তমানে যাঁরা রাজনৈতিক সংগ্রামে ভারতীয় মুসলিমদের কার্যকলাপের পথনির্দেশ করছেন বলে মনে করা হয়, তাঁদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে এখনো এক ধরনের বিশৃংখলা রয়েছে। এই পরিস্থিতির জন্য অবশ্য জাতির উপর দোষারোপ করা চলে না। দেশের যে সব ব্যাপারের সাথে পরিণামে মুসলিম জনগণের ভাগ্য জড়িত রয়েছে, তার জন্য আত্মত্যাগের মনোভাব তাদের মধ্যে মোটেই নেই। আমি যা বলছি, সাম্প্রতিক ইতিহাস তার যথেষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে। দোষ যা কিছু, তা আমাদের, তাদের নয়। জাতিকে যে পথনির্দেশ দেওয়া হয়, তা সব সময়েই স্বাধীনভাবে পরিকল্পিত নয় এবং তার ফল হচ্ছে কখনো সংকট মুহূর্তে আমাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাঙন। এই কারণেই এসব প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক সংহতির জীবন ও শক্তির পক্ষে অপরিহার্য প্রয়োজনীয় ধরনের শৃঙ্খলা সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারে না। এই দোষের প্রতিকারের জন্য আমি প্রস্তাব করছি যে, সমগ্র দেশব্যাপী প্রাদেশিক ও জেলা শাখাসহ ভারতীয় মুসলিমদের একটিমাত্র রাজনৈতিক সংস্থা থাকা প্রয়োজন। আপনারা তাকে যে কোনো নাম দিতে পারেন। অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে এই যে, তার গঠনতন্ত্র এমন হওয়া প্রয়োজন হবে, যাতে যে কোন

রাজনৈতিক চিন্তাধারাসম্পন্ন দলের ক্ষমতা লাভের ও তার নিজস্ব আদর্শ ও পদ্ধতি অনুযায়ী জাতির পথনির্দেশ করার সম্ভাবনা থাকে। আমার মতে, ভারতে ইসলামের সর্বোত্তম কল্যাণের জন্য ভাঙনের সম্ভাবনা রোধ করার এবং আমাদের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে পুনরায় সংহত ও শৃঙ্খলানুসারী করার এ–ই হচ্ছে একমাত্র পন্থা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব ঃ আমি প্রস্তাব করি যে, অবিলম্বে এই কেন্দ্রীয় সংস্থার অন্ততঃপক্ষে ৫০ লাখ টাকার একটি জাতীয় তহবিল সংগ্রহ করা প্রয়োজন। নিঃসন্দেহে আমরা এক কঠিন সময় অতিবাহন করে চলেছি, কিন্তু আপনারা নিশ্চিত জেনে রাখবেন যে, ভারতের মুসলিম জনগণকে যদি বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়, তা হলে তারা আপনাদের ডাকে সাড়া দিতে পশ্চাৎপদ হবে না।

তৃতীয় প্রস্তাব ঃ আমি এই কেন্দ্রীয় সংস্থার নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশের অধীনে দেশব্যাপী তরুণ সংগঠন ও সুসজ্জিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের প্রস্তাব করছি। তারা বিশেষ করে আত্মনিয়োগ করবে সমাজসেবা, রীতি–নীতির সংস্কার, জাতির ব্যবসায় সংক্রান্ত সংগঠ এবং শহরে ও পল্লীতে অর্থনৈতিক প্রচারের কার্যে। এই অর্থনৈতিক প্রচার বিশেষ করে করতে হবে পাঞ্জাবে, যেখানে মুসলিম কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের প্রচুর ঋণের বোঝা ভূমি বিপ্লবের কঠোর প্রতিষেধকের জন্য প্রতীক্ষা করতে পারে না। ১৯২৫ সালে চীনে যখন চাষী সংগঠন গড়ে উঠেছিলো, এখানকার পরিস্থিতিও তেমনি ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে বলে মনে হয়। সাইমন রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে, চাষী তার সম্পত্তির 'একটা বিশেষ অংশ' রাষ্ট্রকে দিয়ে দিচ্ছে। রাষ্ট্র তার পরিবর্তে নিঃসন্দেহে তাকে দেয় শান্তি ও নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। কিন্তু এসব আশীর্বাদ প্রাপ্তির মোট ফল দাঁড়িয়েছে কেবলমাত্র এক ধরনের বৈজ্ঞানিক উপায়ে কর আদায়, যান্ত্রিক উপায়ে প্রস্তুত পণ্য দ্বারা গ্রাম্য অর্থনীতির ধ্বংস সাধন এবং উৎপন্ন ফসলকে বাণিজ্যের আওতাভুক্ত করা, যার ফলে চাষীকে প্রায় সব সময়েই মহাজন ও ব্যবসায়ী দালালদের শিকারে পরিণত হতে হচ্ছে। বিশেষ করে পাঞ্জাবে এটা একটা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমি আশা করি, প্রস্তাবিত তরুণ সংগঠন এ সম্পর্কে প্রচার কার্যের বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং পাঞ্জাবের চাষীদেরকে বর্তমান দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের ব্যাপারে সাহায্য করবে। আমার মতে, ভারতে ইসলামের ভবিষ্যৎ বহুলাংশে নির্ভর করবে পাঞ্জাবের মুসলিম চাষীদের স্বাধীনতার উপর। জীবনের দীপ্তি বৃদ্ধির জন্য এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কর্মের নতুন জগৎ তৈরী করার উদ্দেশ্যে ঈমানের অগ্নির সাথে মিলিত হোক তারুণ্যের অগ্নিশিখা। এই সম্প্রদায় বলতে কেবল নিছক বর্তমান ও গণনা করার মতো নর–নারীর একটি সমষ্টি বুঝায় না। বাস্তবিক পক্ষে জীবন্ত বাস্তব হিসেবে তার জীবন ও কার্যকলাপকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় না তার অন্তর্নিহিত সত্তার গভীরে ঘুমন্ত অজ্ঞাত অসীম প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করে।

চতুর্থ প্রস্তাব : আমি ভারতের সবগুলো বড়ো বড়ো শহরে পুরুষ ও মহিলাদের সাংস্কৃতিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করি। এইসব শিক্ষা কেন্দ্রের রাজনীতির সাথে কোনো সম্পর্ক থাকবে না। মানব জাতির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ইসলাম ইতিমধ্যে কি কি কৃতিত্ব অর্জন করেছে এবং এখনো তার কি কি কৃতিত্ব অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট অনুভূতি সঞ্চার করে আমাদের তরুণ সমাজের অন্তরের ঘুমন্ত উদ্যমকে সুসংহত করাই হবে তাদের প্রধান কাজ। একটি জাতিকে বিচ্ছিন্ন খণ্ড জীবনের সমষ্টি হিসেবে নয়; বরং অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতিসম্পন্ন সুনির্দিষ্ট সমগ্র হিসেবে উপলব্ধি করার ও তার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করার মতো ব্যক্তিমনের বিশালতা আনয়ন করার উপযোগী নতুন কর্তব্য পেশ করেই কেবলাত্র একটি জাতির প্রগতিশীল দলসমূহকে জাগ্রত করে তোলা যায়। একবার এই শক্তিকে জাগ্রত করা গেলে তারা আনয়ন করে নতুন সংঘাতের নব নব উদ্যম এবং সেই অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার অনুভূতি যা– ভোগ করে প্রতিরোধ ক্ষমতাও বয়ে আনে নতুন সত্তার প্রতিশ্রুতি। এইসব শিক্ষা কেন্দ্র একক উদ্দেশ্যের অনুসারী আমাদের শিক্ষা–প্রচেষ্টাসমূহের সংযোগ বিধানের উদ্দেশ্যে পুরানো ও নতুন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে চলবে। এখনই আমি একটি প্রস্তাব আপনাদের সামনে পেশ করতে পারি। অন্যবিধ রাজনৈতিক সমস্যার চাপে হার্টগ কমিটির অন্তবর্তী রিপোর্ট এখন স্পষ্টত সবাই ভুলে গেছে। তাতে নিম্নলিখিত যে সুপারিশ করা হয়েছিলো তাকে আমি ভারতীয় মুসলিমদের পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করি :

'এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, যেসব প্রদেশে ধর্মীয় অসুবিধার দরুন মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষার অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়েছে, সেখানে উক্ত সম্প্রদায় যাতে শিশুদেরকে সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঠায়, তার অনুরূপ ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে সরকারী ব্যবস্থা মিতব্যয় ও যোগ্যতা– উভয় দিক দিয়ে লাভবান হবে এবং উক্ত সম্প্রদায়কে শিক্ষার পশ্চাৎপদ অবস্থার ফলোদ্ভূত বাধা ও কলংক থেকে মুক্তি লাভের সহায়তা করা হবে।'

'আমরা পূর্ণরূপে অবহিত যে, এই ধরনের ব্যবস্থা কার্যকর করা সহজসাধ্য নয় এবং অন্যান্য দেশে তাতে যথেষ্ট বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে। ---- কিন্তু আমাদের মতে বাস্তব পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টার উপযুক্ত সময় এসে গেছে।' [২০৪–২০৫ পৃষ্ঠা]

পুনরায় বিশেষ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে রিপোর্টের ২০৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে :

'সুতরাং সরকারী পদ্ধতির মধ্যে বর্তমানে ও সম্ভবত আগামী কিছুকালের জন্য যদি এমন বিশেষ ব্যবস্থা করা যায়, যাতে মুসলিম সম্প্রদায় জাতীয় জীবনে ও জাতীয় অগ্রগতিতে পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ করতে পারে, তা হলে তা আমাদের মতে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক অথবা সুষ্ঠু

শিক্ষাসংক্রান্ত নীতির সাথে অসামঞ্জস্যমূলক হবে না। এরূপ কোনো বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই বলতে পারলেই আমরা খুশী হতাম এবং আমরা আশা করি, এরূপ ব্যবস্থা অবাঞ্ছিত, কিন্তু যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের বর্তমান পশ্চাৎপদ অবস্থা ও পৃথক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত স্বল্প সম্ভাবনায় তাদেরকে সীমাবদ্ধ রাখার বিকল্প পন্থা হিসেবে এই ধরনের ব্যবস্থার প্রয়োজন, সেই কারণে জাতীয় নীতির ব্যাপক যুক্তিতে উক্ত বিকল্প পন্থাকে যুক্তিসংগত বলে গ্রহণ করতে আমরা কুণ্ঠাবোধ করছি না।'

প্রস্তাবিত শিক্ষা কেন্দ্রসমূহকে অথবা তাদের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত নিখিল ভারত মুসলিম সম্মেলনকে অবশ্যই দেখতে হবে, যাতে এই সব সুপারিশ কার্যে পরিণত করা হয়। কারণ, এই সুপারিশ আমাদের সম্প্রদায়ের বর্তমান প্রতিবন্ধক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার ভিত্তিযুক্ত।

পঞ্চম প্রস্তাব ঃ আমি একটি ওলামা পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করি। তার ভিতরে এমন সব মুসলিম আইনজীবীও থাকবেন, যাঁরা আধুনিক আইন সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেছেন। আমার ধারণা হচ্ছে ইসলামী কানুন সংরক্ষণ ও প্রয়োজন হলে আধুনিক অবস্থার আলোকে তার পুনর্ব্যাখ্যা দান এবং তার সাথে তার মৌলিক নীতির সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখা। এই প্রতিষ্ঠানকে অবশ্য শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি লাভ করতে হবে, যাতে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন সংক্রান্ত কোনো বিল এই পরিষদের পরীক্ষার পর্যায় অতিক্রম করার পূর্বে উপলব্ধি ছাড়াও আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, আধুনিক দুনিয়ার মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের-ইসলামী আইন-সাহিত্যের অনন্ত মূল্য ও পুঁজিবাদী দুনিয়ার পক্ষে তার তাৎপর্য এখনও উপলব্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে, যে পুঁজিবাদী দুনিয়ার নৈতিক মান দীর্ঘকাল পূর্বে মানুষের অর্থনৈতিক আচরণের নিয়ন্ত্রণ-সীমা অতিক্রম করে গেছে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আমার প্রস্তাবিত পরিষদ অন্তত এদেশে ইসলামের স্বাভাবিক নীতির গভীরতর উপলব্ধি এনে দেবে।

ঐতিহাসিক তাৎপর্যবহ এই সম্মেলন এবং ইকবাল প্রদত্ত অনন্য সুন্দর বক্তৃতা। ৫টি প্রস্তাবের মধ্যেই ইকবাল মুসলমানের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক দিকগুলো ধারণ করেছেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবে ইকবাল তদানীন্তন সময়ে একটিমাত্র রাজনৈতিক সংস্থার প্লাটফরমে সমুদয় রাজনৈতিক দলকে একতাবদ্ধ হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবার পথ-নির্দেশ করেন। আর এ কেন্দ্রীয় সংস্থার জন্য সে সময় ৫০ লাখ রূপী সংগ্রহ করার পরামর্শ দেন।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ১৯৩২ সাল এবং ১৯৯৩ সাল- সে ৫১ বছরের ব্যবধান। বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে আমরা দাঁড়িয়ে। জোর কদমে আগত একবিংশ শতাব্দী। দার্শনিক ইকবালের এ প্রস্তাবগুলোকে বর্তমান প্রেক্ষাপটের নিরীখে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার আশু প্রয়োজন অতিঅবশ্যই আছে।

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ইকবালের ভাষণ

ছালেহ্ আহমদ

১৯৩২ সালে আল্লামা ইকবাল রমযানের শেষে ঈদুল ফিতরের দিন লাহোরের শাহী মসজিদে একটি খোৎবা বা ভাষণ প্রদান করেন। এ ব্যাপারে তাঁর বন্ধু-বান্ধব এতই নাছোড় হয়েছিলেন যে, তিনি 'না' করতে পারেননি। ভাষণটি হ্যান্ডবিল আকারে ছেপে বিলিও করা হয়। এ ভাষণটি ১৯৪০ সালে মীর্জা আবদুল হামীদ ইসলামিয়া কলেজের মুখপত্রে সন্নিবেশিত করেছিলেন। এখানে আমরা ভাষণের সারসংক্ষেপ উপস্থাপনের প্রয়াস পাবো।

আল্লামা সর্বাগ্রে রোযা সম্পর্কিত কুরআনুল কারীমের বিখ্যাত আয়াত উপস্থাপনের পর বলেনঃ "নিঃসন্দেহে মুসলমানদের মাঝে ঈদ উপনীত হয়েছে। এর মধ্যে মুসলমানদের যে আনন্দ লুক্কায়িত রয়েছে তা হচ্ছে তাদের মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য করার সুযোগ ঘটেছে। অর্থাৎ আল্লাহর দাসত্বের প্রতিটি দিক পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন করতে হবে। — মুসলিম ব্যতীত বিশ্বে আর কোন্ জাতি আছে, যারা আল্লাহর আনুগত্যের বেলায় মুসলমানদের চাইতে বেশী আনন্দিত হতে পারে?— আজকের ঈদকে বলা হয় 'ঈদুল ফিতর'। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঈদ উদযাপনের জন্যে ঈদের মাঠে সম্মিলিত হবার নির্দেশের সাথে সাথেই ঈদুল ফিতরের ছাদকা আদায় করারও নির্দেশ দিয়ে ছিলেন।-এটাও জেনে রাখা দরকার যে, রোযা রমযান মাসের সাথে সম্পৃক্ত করা হলো কেন? একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইসলাম মানুষের ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনাচারের ভেদ সামনে রেখেই ' সিয়ামের' জন্য সংযোগ পরম্পারাকে আবশ্যক মনে করেছে। — কুরআনে ঘোষিত হয়েছে–

تلك حدود الله فلا تقربوها ، كذالك يبين الله واياته للناس لعلهم يتقون ۔

অথাৎ এটা আল্লাহর সীমা, তোমরা এর কাছেও যেয়ো না। এভাবেই আল্লাহ তাঁর নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন, আশা করা যায় তারা বিরত থাকবে।

সিয়াম-সাধনার মাধ্যমে দীন-হীন, নিঃস্ব-গরীবদের সাথে সহমর্মিতা করার অনুভূতিটুকুন জাগ্রত করাই যথেষ্ট নয়। ঈদের দিন গরীবদের দু'চার দিনের খাদ্য দিয়ে দেয়াও যথেষ্ট নয়। রোযার মাধ্যমে সেই পদ্ধতি উদ্ভাবন উদ্দেশ্য যে, দৃঢ়ভাবে জাগতিক ধন-সম্পদ দ্বারা উপকৃত হওয়ার প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, যাতে করে উত্তরাধিকার বন্টন এবং যাকাত দ্বারা মুসলিম মিল্লাহর ধন-সম্পদে এক ধরনের সাম্য সৃষ্টি হবে।

রোযা রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরবর্তী সাংবৎসর এমনিভাবেই একে-অন্যের সহমর্মিতায় এগিয়ে আসবে এবং পরস্পর ভাই ভাই হিসেবেই বসবাস করবে।

আজ থেকেই আমাদের সবার সংকল্প হওয়া উচিত জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের যে উদ্দেশ্য কুরআন নির্ধারিত করে দিয়েছে, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিফলিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

[ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ চোগতাঈর 'ইকবাল কী ছোহবাত মেঁ' গ্রন্থ থেকে]

ইকবালের শিক্ষা–দর্শন *

ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

جهان تازه کی افکار تازه سے هے نمود
که سنگ، وخشت سے هوتے نہیں جهان پیدا !!

[মৌলিক চিন্তার ফলেই সৃষ্টি হয় নয়া জাহান,
ইট–পাথরে জন্ম হয় না জাহান।]

ইকবাল–দর্শনের মূল সুর হলো–আত্মশক্তির উদ্বোধন। তিনি জীবনের যত দিক নিয়ে তাঁর কাব্যে আলোচনা করেছেন, সর্বত্রই 'খুদী' তথা আত্মশক্তির বিকাশের সবক দিয়েছেন। তাঁর কাছে যে কর্ম আত্মশক্তির জন্য ফলপ্রসূ, তা–ই ভাল, আর যা ক্ষতিকর, তা–ই মন্দ। সমাজের জটিলতা ও সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে মানুষের মেধা ও ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি ঘটবে–এটাই তাঁর খুদী–দর্শন। তাঁর শিক্ষা–দর্শন এর ব্যতিক্রম নয়। শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হোক–এটাই তাঁর মতে শিক্ষার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

ইকবালের উক্তি হলো–মানুষের স্বভাবে আল্লাহ্ অসীম ক্ষমতা আমানত রেখেছেন। এই উপ্ত ক্ষমতার উন্মেষ ঘটাতে হবে কখনো বা প্রাকৃতির বাধা–বিপত্তির সাথে লড়াই করে, কখনো বা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ঘাত–প্রতিঘাতের বেড়াজাল অতিক্রমের মধ্য দিয়ে। প্রকৃতির ধর্ম ও নিয়ম জানার জন্য বিজ্ঞান শিখতে হবে, নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সূত্র খুঁজতে হবে। প্রকৃতির ভ্রূকুটির উপর প্রভুত্ব অর্জন করার ফলে যে আত্মশক্তি সঞ্চিত হবে, তা নিয়োজিত করতে হবে মানবতার সেবায়। সামাজিক জীবনের ঝড়–ঝঞ্ঝা পেরিয়ে যে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তা কুড়ানো যাবে, সেই পুঁজি লাগাতে হবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে, অনাবিল শান্তিময় জীবন গড়ার কাজে।

ইকবালের মতে, ঐ কার্যসাধনের প্রক্রিয়া হলো এমন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা, যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেধা ও মৌলিকত্ব সৃষ্টি হয, শিক্ষিতদের মধ্যে আন্তরিকতা ও কর্মপ্রেরণা

---

* প্রবন্ধটি ১৯৯১ সালের ২৮ নভেম্বর ইকবালের ১১৪তম জন্মবার্ষিকীতে 'আল্লামা ইকবাল সংসদ' আয়োজিত হোটেল সুন্দরবনের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সেমিনার ও সুধী সমাবেশে পঠিত হয়।

জাগে তাদের চরিত্র পূত-পবিত্র হয়, তাদের মনে খোদাভীতি ও ধর্মীয় অনুভূতির সঞ্চার হয়। ইকবাল "তালিব-এ-ইল্‌ম্" (শিক্ষার্থী) শীর্ষক কবিতায় শিক্ষার্থীদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেনঃ

خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے
که تیرے بحرکی موجوں میں اضطراب نہیں
تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ که تو
کتاب خوان ھے مگر صاحب کتاب نہیں

[হে শিক্ষার্থী, দোয়া করছি-আল্লাহ্ তোমায় ঝড়ের সাথে পরিচিত করে দিন।

তুমি সাগর বটে, কিন্তু সাগর-লহরে নাই কোন উত্তালতা।

তুমি বই মুখস্থ করার কাজে লিপ্ত, তোমার নাই কোন অবসর,

তুমি বই-পাঠক বটে, কিন্তু বই আত্মস্থ করতে পারনি।]

ইকবাল লক্ষ্য করলেন, শিক্ষার্থী-যুবকদের অন্তরে কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই, ন্যায় প্রতিষ্ঠার চিন্তা-চেতনা নাই। তারা গলদ্‌ঘর্ম হয়ে তোতার ন্যায় বই কণ্ঠস্থ করছে। তাই তিনি তাদের জন্য দোয়া করলেন-তাদের চিন্তা সাগরে ঢেউ খেলে যাক, বান ডাকুক, উচ্চ ধ্যান-ধারণা ও কর্ম-প্রেরণা জাগ্রত হোক, গ্রন্থকারের লালিত ভাবটুকু তাদের অন্তরেও প্রতিবিম্বিত হোক।

ইকবাল মনে করতেন, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অবাধ ও অসংযত যুক্তি প্রয়োগ-প্রীতি তাদের কর্ম-জীবনে ভাল ফল বয়ে আনে না। এতে তাদের চিন্তায় ভারসাম্য, স্থিরতা ও সংঘবদ্ধতা হ্রাস পায়, একই নীতি ও একই ধারায় অবিচলিত থাকার স্বভাব থাকে না। তাদের মধ্যে যথেচ্ছাচারিতার প্রবণতা জাগে। চিন্তার এই অসংঘবদ্ধতা ও অতিআযাদী কর্মক্ষেত্রে তাদেরকে সন্দিহান, অধীর ও প্রশ্নসর্বস্ব করে রাখে। আরো পরিষ্কার কথায়-- তরুণ শিক্ষার্থীরা এখন আগেকার মত যা-তা মানতে রাজী নয়। তারা প্রত্যেকটি কথার পেছনে যুক্তি খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু, তারা যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে কর্ম-জীবনে প্রবেশ করে, তখন তাদের ধ্যান-ধারণা অসংঘবদ্ধই থেকে যায়। তারা কোন বিষয়ে ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা করতে পারে না। জটিল বিষয় নিজেরা যথাযথ বোঝে না, অপরকেও বোঝাতে পারে না। ইকবাল দুঃখ করে বলেন, বুদ্ধির এই অতিস্বাধীনতায় তারা কী আনন্দ পেতে পারে? তারা তো কেবল সন্দেহের আবর্তে আপতিত থাকে। ফলে, তাদের কর্মক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যায়। ইকবাল এখানে বোঝাতে

চেয়েছেন, অনভিপ্রেত সন্দিগ্ধতা ফলদায়ক নয়। এর পরিণাম অশুভ। শিক্ষার্থী ও শিক্ষিতদের এরূপ অবিরাম অনিশ্চয়তায় ভোগা উচিত নয়। ইকবালের ভাষায় ঃ

مدرسہ عقل کو آزاد توکرتا ھے مگر
چھوڑ جاتا ھے خیالات کو بے ربط ونظام !

[বিদ্যালয় বিবেককে স্বাধীন করে বটে,

কিন্তু চিন্তাধারাকে করে দেয় অসংলগ্ন।]

ইকবাল যেমন শিক্ষার্থীদের উপদেশ দিয়েছেন, তেমনি শিক্ষকদের দায়িত্বের উপরও আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন, পথহারা সূর্য-ছায়া যেমন বদখ্শানস্থ পদ্মরাগ-মণির (Ruley) লালন করতে পারে না, তেমনি আদর্শচ্যুত শিক্ষকগণও শিক্ষার্থীদের সত্যিকার প্রশিক্ষণ দিতে পারেন না। ইকবাল দুঃখ করে বলেন, শিক্ষকগণ গতানুগতিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ। তাঁরা গবেষণা ও পরিশ্রম করেন না। সত্য উদঘাটনে তাঁরা সচেষ্ট নন। সুতরাং তাঁরা শিক্ষার্থীদের যথার্থ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে অপারগ। তাঁদের গতানুগতিক দৌড় -ঝাঁপ অর্থহীন। ইকবাল "আসাতিযাহ" (শিক্ষকমন্ডলী) শিরোনাম যুক্ত কবিতায় বলেনঃ

دنیا ھے روایات کے پھندوں میں گرفتار
کیا مدرسہ کیا مدرسہ والوں کی تگ و دو !

[শিক্ষা-জগত গতানুগতিকতার ফাঁদে আবদ্ধ,
বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের দৌড়-ঝাঁপে কি লাভ?]

ইকবালের ভাষ্য মতে, শিক্ষার নৈতিক উদ্দেশ্য হলো- মানুষের মধ্যে সত্যিকার মানবাত্মা প্রতিষ্ঠিত করা। যে শিক্ষাই মানুষ লাভ করুক না কেন, মানা নাই। কিন্তু শিক্ষায় এমন একটা ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীদের মনে ভাল চিন্তা, ভাল প্রেরণা তথা সত্যিকার মনুষ্যত্ব বরণের জন্য সদা একটা আসন মুক্ত থাকে। ইকবাল সত্যিকার মানবাত্মাকে তাঁর কাব্যিক ও রূপক ভাষায় "আযীয মেহমান" (প্রিয় অতিথি)-রূপে অভিহিত করেছেন। তিনি "মেহমান-এ-আযীয" শীর্ষক কবিতায় বলেনঃ

چاھیے خانہ دل کی کوئی منزل خالی
شاید آجائے کھیں سے کوئی مھمان عزیز !

[মনের ঘরে একটা আসন শূন্য রাখা চাই,

কোন দিক থেকে এসে পড়তে পারে প্রিয় অতিথি।]

যার মধ্যে তাওহীদ একবার বদ্ধমূল হয়, ইউরোপীয় শিক্ষা তার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না। সে যে কোন দেশে শিক্ষা লাভ করতে পারে। তবে, তাকে অবশ্যই স্বধর্মে ও আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হতে হবে।– এই কথাগুলো ইকবাল তাঁর সন্তান–জাবীদকে সম্বোধন করে বলেছিলেন। ''জাবীদ্–সে'' (জাবীদের প্রতি) শিরোনামযুক্ত কবিতায় ইকবাল বলেনঃ

جوهرمیں هو لا اله توکیا خوف
تعلیم هوگو فرنگیانه !

[স্বভাবে যদি তাওহীদ হয় বদ্ধমূল, তবে ভয় কি?

যদিও হয় শিক্ষা ফিরিঙ্গী দেশীয়।]

ইকবালের এখানে পুঁথিগত বিদ্যার কোন মূল্য নাই, যদি তা বাস্তবরূপে রূপায়িত না করা হয়। ইসলামে শুধু জ্ঞান লাভ করাই যথেষ্ট নয়, লব্ধ জ্ঞানের উপর বিশ্বাসও স্থাপন করতে হবে, তা কাজেও লাগাতে হবে। ইকবালও তা–ই চেয়েছিলেন। উপমহাদেশে প্রচলিত ইউরোপীয় শিক্ষা–পদ্ধতির প্রতি ইকবাল অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি এর নিছক লোকায়তধর্মী চরিত্রের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি মনে করতেন, খৃষ্টানরা যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করে রেখেছেন, তা এ দেশের ধর্ম ও চরিত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বৈ কিছু নয়। তাঁদের উদ্দেশ্য হলো–– এখানকার লোকের ধর্ম ও চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়া। ইকবাল ''দ্বীন ওয়া–তা'লীম'' (ধর্ম ও শিক্ষা) শীর্ষক কবিতায় বলেনঃ

اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم
ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف !

[গীর্জাওয়ালাদের এই শিক্ষা–পদ্ধতি

ধর্ম ও চরিত্রের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র বৈ কিছু নয়।]

ইকবাল ইউরোপীয় আধুনিক শিক্ষার কঠোর সমালোচনা করলেও মূলত তিনি ঐ শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। তবে, তিনি ঐ শিক্ষার ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা–বর্জিত চরিত্রের জন্য দুঃখবোধ করেন। তিনি তাঁর কাব্যের বিভিন্ন স্থানে বলেছেন, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তা নিয়েই আধুনিক শিক্ষার কারবার। ইন্দ্রিয়–বহির্ভূত অদৃশ্য শক্তি তথা খোদা ও আধ্যাত্মিকতার সন্ধান

এখানে মেলে না। এখানে ধর্মকে মনে করা হয় বাতুলতা। অথচ ধর্মই মানব-জীবনের সকল বিপ্লবের উৎস। ধর্মই মানব-সমাজে বিবর্তন আনতে পারে। ধর্মই জাগায় কর্মপ্রেরণা। চরিত্রের সংশোধন ধর্মীয় পরিবেশেই সম্ভব। ইকবালের ভাষায় ঃ

خوش توهين هم بهی نوجوانون کی ترقی سے مگر
لب خندان سے نکل جاتی هے فریاد بهی ساتهه
هم سمجهتے تهے که لائے گی فراغت تعلیم
کیا خبر تهی که چلا آے گا الحاد بهی
مذهب هے جسن کا نام وه هے اك جنون خام
هے جسن سے آدمی کے تخیل کو ارتعاش

[তরুণদের উন্নতিতে আমরাও আনন্দিত,
কিন্তু এর সাথে হাসি-মুখ থেকে বেরিয়ে আসে ফরিয়াদও।
মনে করতাম, আধুনিক শিক্ষা বয়ে আনবে সচ্ছলতা ও শান্তি,
কে জানতো- এর সাথে চলে আসবে নাস্তিক্যও।
ধর্মকে মনে করা হয় আস্ত পাগলামি,
অথচ এতেই চিন্তাধারায় আসে বিপ্লব।]

ইকবাল ভাবতেন, প্রচলিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রজন্ম যে ইসলামের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক রীতি-নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, শুধু তা-ই নয়। এ শিক্ষার ফলে ইউরোপীয় জাতিসমূহ যে-সব সদ্‌গুণ ও বৈশিষ্ট্যে গুণান্বিত হয়, সেগুলো থেকেও এদেশের নব্য শিক্ষিত তরুণগণ বঞ্চিত। ইকবাল আরো লক্ষ্য করেন যে, প্রচলিত শিক্ষা-সূচীতে মুসলমানের জাতীয় ইতিহাস ও জাতীয় শৌর্যবীর্যের প্রতিফলন ঘটে না। এখানকার শিক্ষায় শাহীন-বাচ্চাদের দেয়া হয় মাটির শস্যকণা আহরণের শিক্ষা। তাদেরকে উচ্চ আদর্শ থেকে সরিয়ে কেবল রুজি-রোজগার সন্ধানের পথ বাতলানো হয়। ইকবালের ভাষায়ঃ

یه بتان عصر حاضر که بنے هین مدرسون مین
نه ادائے کافرانه، نه تراش آذرانه
شکایت هے مجهے یارب خداوند ان مکتب سے
سبق شاهین بچون کودے دهے هین خاکبازی کا ۔

[আজকাল বিদ্যালয়ে যে পুতুল সৃষ্টি হচ্ছে, তাতে কাফেরের অভিনয়ও নাই,
ইব্রাহীমের পিতা আযরের মূর্তি তৈরীর আর্টও মেলে না।
হে খোদা, শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের প্রতি আমার অভিযোগ হলো-

শাহীন-বাচ্চাদের দেয়া হয় মাটি নিয়ে খেলা করার শিক্ষা।]

শুধু অর্থোপার্জনের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা ইকবালের নিকট অসমীচীন। কারণ, এতে শিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যাবলী বিনষ্ট হয়। তবে, শিক্ষার যথোচিত উদ্দেশ্য বজায় রেখে অর্থোপার্জন করা হলে তাতে কোন দোষ নাই। লক্ষ্যবিহীন শিক্ষার সমালোচনা করে ইকবাল 'মাদ্রাসা' শীর্ষক কবিতায় বলেছেনঃ বর্তমান যুগ তথা বর্তমান শিক্ষা যুব সমাজের জন্য মৃত্যুর ফেরেশতা-স্বরূপ। কারণ, এ শিক্ষা তাদেরকে অর্থোপার্জনের চিন্তায় বিভোর করে রেখেছে এবং তাদের রূহ্ অপহরণ করে নিয়েছে। তাদের মনে স্বাধীনতার চিন্তা নাই, উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই, জেহাদী প্রেরণা নাই, কষ্টসহিষ্ণুতা নাই। তারা জীবন-যুদ্ধের প্রতিযোগিতায় ভয় পায়। ইকবালের ভাষায়ঃ

عصر حاضر ملك الموت هے تیرا جیسن نے
قبض کی روح تری دیے کے تجھے فکر معاش !

[বর্তমান যুগ তোমার জন্য মৃত্যুর ফেরেশতা-স্বরূপ,
যা অর্থ আয়ের চিন্তায় বিভোর করে তোমার রূহ কেড়ে নিয়েছে।]

কেবল রোজগার ও জীবিকার ফিকির নিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করাকে ইকবাল অসমীচীন মনে করলেও তিনি অর্থকরী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। তিনি ধর্মসম্মত শিক্ষার সাথে শিল্প-বাণিজ্যের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করেন। এরূপ শিক্ষার অভাব লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন, প্রচলিত শিক্ষায় কেবল যে ধর্ম, চরিত্র, আধ্যাত্মিকতা ও কর্মপ্রেরণা সৃষ্টির ব্যবস্থা নাই তা নয়, এতে অর্থোপার্জন ও অর্থকরী বিদ্যারও যথাযথ ব্যবস্থা নাই। তিনি ধর্মীয় শিক্ষা ও শিল্প-শিক্ষাকে শিক্ষাব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করতেন। সার কথা হলো-তিনি চেয়েছিলেন ধর্মীয় শিক্ষা ও লোকায়ত শিক্ষার সমন্বয়ে গঠিত একটি শিক্ষাব্যবস্থা। তিনি ভাবতেন, এমন একটি শিক্ষার ফলে সাধিত হবে ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতি। তার ভাষায় ঃ

باین مکتب باین دانش چه تازی ؟
که نان درکف ندادو جان زتن برد
به پور خویش دین ودانش آموز
که تاید چون مه وانجم نگینش
بدست او اگرداری نهر
ید بیضا است اندر آستینش ۔

[এই বিদ্যালয় আর এই জ্ঞান নিয়ে এত দৌড়–ঝাঁপ কেন?
তা তোমার হাতে দেয় নি জীবিকা; তোমার কায়া থেকে কেড়ে নিয়েছে অন্তরাত্মা।
তোমার সন্তানকে শিক্ষা দাও ধর্ম ও জ্ঞান,
তার আংটিতে জড়ানো পাথর হবে চকচকে চাঁদ ও তারার মত।
তার হাতে তুলে দাও শিল্প–জ্ঞান,
হযরত মূসার ন্যায় সে তার আস্তিন থেকে বের করবে ঝকঝকে হাত।]

ইকবাল ধর্মশিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, অর্থকরী শিক্ষা– এসবই চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃতির দর্শনকে খতিয়ে দেখলে এটাই প্রতিভাত হয়ে উঠবে যে, তাঁর নিকট ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান শিক্ষাই বেশী জরুরী। তাঁর জীবন দর্শনের গোড়ার কথা হলো– আত্মশক্তির উৎকর্ষ সাধন। এই উৎকর্ষ সাধনের সর্বোত্তম পন্থা হলো– প্রকৃতির বিরূপ শক্তির সাথে চোখাচোখি করা। শক্তি প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। ঐ শক্তিকে উদঘাটন করতে হবে, বশে আনতে হবে। বশে আনতে হলে তার ভ্রূকুটির সংগে মোকাবিলা করতে হবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষা–নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির শক্তিকে বশীভূত করার সূত্র ও প্রক্রিয়া জানতে হবে। প্রকৃতির মধ্যে নিহিত খোদা–প্রদত্ত রহস্যরাজির উন্মোচন ঘটিয়ে আমাদের উপর আরোপিত খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় অর্জিত বিজ্ঞানের শক্তিকে নিয়োজিত করতে হবে মানবতার সেবায়। শক্তির এই নিয়োগ ও প্রয়োগকেই ইকবালের ভাষায় বলা হয় 'বে–খূদী'–আত্মত্যাগ ইকবালবলেনঃ

فطرت کو خرد کے رو برو کر + تسخیر مقامِ رنگ وبو کر

[প্রকৃতিকে নিয়ে আস বিদ্যাবুদ্ধির মুঠায়,
বশীভূত কর এর বিচিত্র রহস্যরাজি।]

আসুন, বিষয়ের গোড়াতে ফিরে যাই। ইকবালের শিক্ষা–দর্শনের মোদ্দা কথা হলো– আত্মশক্তির উদ্বোধন। শিক্ষা ব্যবস্থায় আত্মশক্তি অর্জনের পন্থা না থাকায় ইকবাল তাঁর 'হিন্দী মাকতাব' (ভারতীয় শিক্ষা–প্রতিষ্ঠান) কবিতায় ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। 'তারবিয়ত'––(প্রশিক্ষণ) কবিতায় তিনি উপমা দিয়ে বলেছেন, দিয়াশলাই দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হলো মান্ধাতা যুগের প্রথা। এখন সেটা দিয়ে বিজলী বাতি জ্বালানো যাবে না। ঠিক তেমনি প্রচলিত শিক্ষা দিয়ে আত্মশক্তির উন্নতি বিধান করা সম্ভব নয়। তাই, এমন শিক্ষা পদ্ধতি ও এমন সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন, যাতে আত্মশক্তির বিকাশ ঘটে এবং নব নব চিন্তার ফলে নব নব জাহান পয়দা হয়। ইকবাল সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, আত্মশক্তিই হলো জীবন। এই শক্তির অভাবে পৃথিবীর অনেক জাতি লাঞ্ছিত হয়েছে।

আমরা যদি এখনো নিজেদের শোধরাতে না পারি, তবে আমাদের দশাও তদ্রূপ হতে বাধ্য। ইকবালের ভাষায় ঃ

اگر خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات + نہ کر سکیں تو سرایا فسون و افسانہ
ہوئی ہے زیر فلك امتوں کی رسوائی + خودی سے جب ادب ودین ہوے بیگانہ

[আত্মশক্তি রক্ষার মধ্যেই জীবন নিহিত;
না করতে পারলে সব কিছুই হয়ে দাঁড়াবে অলীক।
সাহিত্য ও ধর্ম আত্মশক্তি–রিক্ত বলেই
আকাশ–তলে অনেক জাতি হয়েছে লাঞ্ছিত।]

ডক্টর ইকবাল তাঁর কাব্যধারার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে শিক্ষা সম্পর্কে কিছুই লেখেননি। এ বিষয়ে তিনি সর্বপ্রথম কলম ধারণ করেন তাঁর কাব্যের তৃতীয় পর্যায়ে। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'বাংগ–এ–দারা'র তৃতীয় ধাপের কবিতাবলীতে শিক্ষাবিষয়ক দু'–একটি কবিতা দেখা যায়। 'বাংগ–এ–দারা'র পর ডক্টর সাহেব তাঁর 'বালে জিব্রীল' কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত শে'র (Verse)–এর মধ্য দিয়ে তদানীন্তন যুগে প্রচলিত ধর্মশিক্ষাবিবর্জিত শিক্ষার সমালোচনা করেন। এছাড়া তিনি তাঁর 'যরব–এ–কালীম' কাব্যগ্রন্থে 'তালীম–ওয়া–তারবিয়ত' (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) শিরোনামে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন। কিন্তু এখানে সন্নিবেশিত অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তুর সাথে শিক্ষার আদৌ সম্পর্ক নাই। তদুপরি আমাদের জন্য অসুবিধা হলো--তাঁর শিক্ষামূলক অধিকাংশ কবিতা বৃটিশ যুগের প্রেক্ষিতে রচিত। সেই প্রেক্ষাপট বদলে যাওয়ায় তাঁর অনেক কথা আমাদের সমাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবু স্বীকার করতে হবে যে, শিক্ষা সংক্রান্ত তাঁর অনেক কবিতা এখনো আমাদের জন্য ফলপ্রসূ ও তাৎপর্যবহ।

আমাদের সমাজের গতি–প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁর শিক্ষাদর্শন থেকে যতটুকু সম্ভব ফায়দা গ্রহণ করা উচিত। অন্যান্য কবিতার ন্যায় তাঁর শিক্ষামূলক অনেক কবিতাই মুসলিম সমাজের নিরিখে রচনা করা হয়েছে। অনেক স্থলে মুসলিম তরুণদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশ হিন্দু–মুসলিম, বৌদ্ধ–খৃষ্টানের দেশ। এখানকার বিদ্যালয়সমূহে সব ধর্মের লোকই পড়াশোনা করে। তাই তাঁর শিক্ষা–দর্শন প্রয়োগ করতে হবে বিভিন্ন ধর্মের নিরিখে।

এখানকার পাঠ্যসূচীতে তিনি যে ধর্মীয় শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন বা শিক্ষাঙ্গনে ধর্মীয় পরিবেশ ও ধর্মীয় চরিত্র সৃষ্টির পরামর্শ দিয়েছেন, তা খুবই প্রশংসনীয় ও খুবই যুগোপযুগী। তবে এগুলোর বাস্তবায়ন যে কঠিন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ জন্য চিন্তাবিদদের এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে যথেষ্ট ভাবতে হবে। এখানে এ কথাটি বলে রাখা ভাল যে, ডক্টর ইকবাল ইসলামকে একটি 'প্রতিষ্ঠান' এবং বিশেষ একটি জীবন-ব্যবস্থা বলে মনে করেন। তিনি ইসলামকে মুসলমান হিসেবে নয়, বরং একজন চিন্তাবিদ হিসেবেই দেখেছেন। সেদিক থেকে শিক্ষাঙ্গনে ধর্মীয় পরিবেশ ও ধর্মীয় চরিত্র সৃষ্টির পরামর্শ কোন জটিলতার সম্মুখীন হবে না। শিক্ষার সকল স্তরে ধর্মীয় পরিবেশ বজায় রাখা সকল ধর্মাবলম্বীর জন্যই হিতকর, যা সত্যিকার বলতে গেলে আমাদের সমাজে অনুপস্থিত। ধর্মীয় শিক্ষা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্নটি কিছুটা জটিল। কোন্ পর্যায়ে বা কোন্ ধরনের শিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, তা ইকবাল পরিষ্কার করে বলেন নি। তাই, এটা আমাদের সমাজের জন্য চিন্তনীয় বিষয়। শিক্ষার চিন্তানায়কগণই এ সমস্যার সমাধান দিতে পারেন।

স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ, স্যার রস মাসউদ, মাওলানা মুহম্মদ আলী, মাওলানা আবু নসর ওহীদ প্রমুখের চিন্তাধারায় শিক্ষা ব্যবস্থার যে রূপ একটা পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা পাওয়া যায়, ইকবাল-সাহিত্যে তদ্রূপ কোন রূপরেখা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। আফগানিস্তানের বাদশা নাদির শাহের আমন্ত্রণে সৈয়দ সুলায়মান নাদবী ও রস মাসউদের সাহচর্যে ডক্টর ইকবাল ১৯৩৩ সালের অক্টোবরে কাবুল গিয়েছিলেন। কতক ধর্মীয় ও শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে বাদশাকে পরামর্শ দেয়ার জন্যে তাঁরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

ডক্টর ইকবালের শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত। আমার যা জানা আছে, তা আপনাদের সামনে পেশ করলাম। ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, আশা করি।

ইকবাল জিন্দাবাদ! বাংলাদেশ জিন্দাবাদ! খোদা হাফেয!!

রাসূলুল্লাহর (সাঃ) আদর্শ ও কল্যাণ রাষ্ট্র*

মুহিউদ্দীন খান

মানুষ যেদিন থেকে দুনিয়াতে বসতি স্থাপন করেছে, সেদিন থেকেই কোন না কোনভাবে একটা শাসন কর্তৃত্বের অধীনে পারস্পরিক সম্পর্ক ও অধিকারের সীমারেখা মেনে নিয়ে জীবনযাত্রা শুরু করেছে। ইসলামী আকীদা বিশ্বাস অনুযায়ী প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) ছিলেন আল্লাহর নবী এবং দুনিয়াতে বসবাস করার নীতিমালা তিনি সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকেই শিক্ষালাভ করেছিলেন। সে নীতিমালা বা শরীয়তই তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে রেখে গিয়েছিলেন। সে নীতিমালার প্রথম কথা ছিল, "সমগ্র মানবজাতি একই রক্তধারা বহনকারী একই জাতিসত্তার অংশ এবং একজন সৃষ্টিকর্তা তাদের 'রব' বা পালন কর্তা।"

পবিত্র কোরআন এবং ইসলামী বর্ণনাশাস্ত্র মতে, মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় নেতৃত্ব দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত নবী–রাসূলগণ। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশের আলোকে তাঁরা মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনের প্রকৃত কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন। পবিত্র কোরআন প্রথম মানব হযরত আদমের (আঃ) যে প্রার্থনাটা গুরুত্ব সহকারে উদ্ধৃত করে পরবর্তী মানব প্রজন্মকে শিক্ষাদান করেছে– দুনিয়া ও আখেরাত–এ উভয় জাহানের হাসানাত বা কল্যাণ প্রার্থনা।

মানব সভ্যতাকে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে আসার যে ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছিল প্রথম মানব এবং প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) থেকে, তা–ই পূর্ণ পরিণত রূপলাভ করেছে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) মাধ্যমে। পূর্ববর্তী নবী–রাসূলগণকে যেমন আল্লাহ্ তা'আলা খেলাফতও দান করেছিলেন, তেমনি নবী মুহাম্মদও (সাঃ) পবিত্র কোরআনের শিক্ষার আলোকে দীর্ঘ তেরো বছরের অবর্ণনীয় ত্যাগ–তিতিক্ষা ক্লিষ্ট সাধনার মাধ্যমে সৃষ্ট মাত্র ছয়শ' প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোক নিয়ে মদীনায় একটি রাষ্ট্র কাঠামো দাঁড় করিয়েছিলেন ৬২৩ খৃষ্টাব্দে। ধন, জন ও শিক্ষা–দীক্ষায় উন্নত ইহুদী সম্প্রদায় এবং বিরাট জনসংখ্যা সম্বলিত মদীনার কৃষিজীবী পৌত্তলিকদের সাথে একটি চুক্তির মাধ্যমে নতুন এ রাষ্ট্র কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। আর প্রথমে ইহুদী ও পৌত্তলিক মদীনাবাসীদের দ্বারা চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করিয়ে এ রাষ্ট্র কাঠামোর প্রতি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি আদায় করেন। ৫৪টি ধারাসম্বলিত এ চুক্তিপত্রটাই "মদীনার সনদ" নামে খ্যাত। রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের ধারণায়, মদীনার সনদই দুনিয়ার সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। এ সংবিধানের ভিত্তিতেই হযরত নবী করীম (সাঃ)

* প্রবন্ধটি ১৪১২ হিজরীর ১৯ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১–তে 'আল্লামা ইকবাল সংসদ' আয়োজিত জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে পঠিত হয়।

মদীনায় প্রথম ইস্লামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং সনদটা পরবর্তীকালে ইসলামী রাষ্ট্রে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে একটি সুস্পষ্ট নীতিমালারূপে গণ্য হয়।

হযরত নবী করীমের (সাঃ) বুনিয়াদি দায়িত্ব ছিল জনগণকে কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করা, ব্যক্তি চরিত্রের সংশোধন করত প্রতিটি অনুসারীকে এক একজন আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলা তথা তাদের মধ্যে সকল প্রকার মানবিক সদগুণের বিকাশ ঘটানো এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতায় তাদের দুনিয়ার সর্বোত্তম মানবগোষ্ঠীতে পরিণত করা। এ তিনটি মহৎ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে নিয়ামক শক্তির প্রয়োজন তার সমাবেশ ঘটানোর লক্ষ্যেই একটি আদর্শ গণকল্যাণমূলক রাষ্ট্র কাঠামোর সৃষ্টি। রাষ্ট্র গঠন নবীজীর (সাঃ) লক্ষ্য ছিল, এ কথা বলা না গেলেও মানবিক মাহাত্মের পূর্ণ বিকাশ ঘটানোর প্রয়োজনে একটি জরুরী উপলক্ষ্য ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

নবী করীম (সাঃ)-এর প্রবর্তিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে রাষ্ট্র ও নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও অধিকারের যে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় তারই একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা হচ্ছে ফেকাহ্‌বিদগণ কর্তৃক কোরআন-সুন্নাহর আলোকে প্রণীত ইসলামী রাষ্ট্রের ছয়টি মৌলিক অধিকার। উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকদের নিরঙ্কুশ আনুগত্য লাভের পূর্বশর্ত হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জন্য আলোচ্য ছয়টি মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিতকরণ। ছয়টি অধিকার হচ্ছেঃ

(১) রাষ্ট্র প্রতিটা নাগরিকের শ্রমের ভিত্তিতে খাদ্যের অধিকার সুনিশ্চিত করবে। যাদের শ্রম করার সামর্থ্য নেই, বা যারা নিজেদের শ্রম দ্বারা নিজের ও পোষ্যদের প্রয়োজনীয় খাবার সংগ্রহ করতে অপারগ তাদের খোরাকের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে। রাষ্ট্রে কোন মানব শিশু অনাথ অভিভাবকহীন রূপে গণ্য হবে না। প্রিয় নবীজীর সুস্পষ্ট ঘোষণা- "যার কোন অভিভাবক নেই, আমি স্বয়ং তার অভিভাবক।" - [বুখারী]

(২) রাষ্ট্রের প্রতিটা নাগরিকের আবরু ঢাকবার বা শীত নিবারণের মত প্রয়োজনীয় বস্ত্রের প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে হবে। যারা নিজের শ্রমে তা সংগ্রহ করতে অপারগ, তাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের জোগান রাষ্ট্রকে দিতে হবে।

(৩) প্রতিটা নাগরিককে প্রয়োজনীয় বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সাততলা আর গাছতলার ব্যবধান সৃষ্টি করা চলবে না।

(৪) প্রতিটা নাগরিকের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক শিক্ষার সুযোগ সুনিশ্চিত করতে হবে। আর সর্বপ্রকার শিক্ষাই হবে অবৈতনিক। শিক্ষা সম্পর্কিত সকল ব্যয়ভার রাষ্ট্রকে বহন করতে হবে।

(৫) প্রতিটা নাগরিকের রোগে চিকিৎসা প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে এবং অধিকারের প্রাপ্ততা রাষ্ট্র কর্তৃক সুনিশ্চিত করতে হবে।

(৬) প্রতিটা প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ের সুস্থ সংসার জীবনে প্রবেশের অধিকার অর্থাৎ বিবাহ বন্ধনের সুযোগ রাষ্ট্র কর্তৃক সুনিশ্চিত করতে হবে।

উপরোক্ত ছয়টি অধিকারকেই ফেকাহবিদগণ 'জরুরিয়াতে সিত্তাহ' নামে অভিহিত করেছেন এবং যে কোন অপরাধে হদ্দ (দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি) বা 'তাবীর' (অপরাধের সাধারণ বিচার) প্রয়োগ করার আগে দেখতে হবে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য উপরোক্ত ছয়টি জরুরী অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছিল কি-না?

এখানে উল্লেখ করতে হয় চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা, ধর্ষণ, ছিনতাই প্রভৃতি যে সব অপরাধের জন্য ইসলামী শরীয়ত হদ্দ এবং তাবীর-এর ব্যবস্থা করেছে, এসবের প্রায় সব কয়টিই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে উপরোক্ত ছয়টি অধিকারের কোন না কোন একটি বা একাধিক প্রয়োজন বৈধ পন্থায় মিটানোর অপারগতার কারণে। আর মৌলিক প্রয়োজনগুলো মিটে যাওয়ার পরও যারা অপরাধ সংঘটন করে, ওদেরকে ইসলামী শরীয়ত মানসিকভাবে অসুস্থ এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ জীবনের ব্যাধিগ্রস্ত করার সংক্রামক জীবাণু বহনকারী বিপজ্জনক লোকরূপে চিহ্নিত করে ওদের ক্ষতিকর অস্তিত্ব থেকে সমাজকে নিরাপদ রাখার লক্ষ্যেই হদ্দ জারির আওতাভুক্ত বিবেচনা করে।

হযরত নবী করীম (সাঃ) প্রবর্তিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অপরাধের শাস্তি বিধানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ব্যক্তির চরিত্র সংশোধন এবং সমাজের পরিপূর্ণ শান্তি সুনিশ্চিতকরণ। এ লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাবনা যেখানে শেষ হয়ে যায়, সে সব ক্ষেত্রেই শুধু চরম শাস্তি বা 'হদ্দ' প্রয়োগের বিধান।

সন্ধানী দৃষ্টিতে পবিত্র কোরআন-হাদীস পাঠ করলে দেখা যায়, ধন সম্পদ এবং অন্যান্য সব ধরনের জীবনোপকরণকে ইসলাম প্রচুর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সম্পদ সৃষ্টি, আহরণ, উৎপাদন এবং সংরক্ষণে ইস্‌লাম বাধা দেয় না, বরং এ সম্পর্কিত সকল ক্রিয়াকর্মকে উৎসাহিত করে, তবে সম্পদ আহরণ এবং ব্যয়- এ দু'টি কাজই শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে হতে হবে। যথা- সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে অন্যের অধিকারের সীমায় হস্তক্ষেপ করা যাবে না। কোন শোষণ-মূলক পন্থায় সম্পদ অর্জন করা যাবে না। শ্রম, উত্তরাধিকার এবং সন্তুষ্টচিত্তে প্রদত্ত দাম ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় সম্পদের মালিক হওয়া যাবে না।

অর্জিত সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও যথেচ্ছাচার করা যাবে না। অপব্যয়, বিলাস এবং খেয়ালখুশীমত সম্পদ বিনষ্ট করা ইসলামী শরীয়ত সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। নিজের অধিকারে যা আছে, এর সবকটুকুই ভোগ করার অধিকার কারও নেই। এর নির্ধারিত এক অংশ যাকাত বাবত অবশ্যই দিতে হবে। এর পরও সকলের সম্পদেই 'সায়েল' ও 'মাহরূমের' হক রয়েছে। [আযযারিয়াত ঃ আয়াত নং ১৯]

পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে 'সায়েল' অর্থ ভিখারী নয়, বরং যার প্রয়োজন রয়েছে। যে ব্যক্তি নিজের শ্রমের দ্বারা তার নিজের এবং পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ জোগাড় করতে

পারে না। তাছাড়া রয়েছে সমষ্টিগত জাতীয় প্রয়োজন। জাতীয় আপৎকালে এবং সমষ্টির প্রয়োজনে যাদের নিকট সম্পদ আছে, তাদের সে সম্পদের মধ্য থেকে যে কোন পরিমাণ অধিগ্রহণের ক্ষমতাও এ আয়াতেই খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধানকে দেওয়া হয়েছে। কি পরিমাণ নেয়া যাবে, এ প্রশ্নের জবাব রয়েছে পবিত্র কোরআনের অন্য এক আয়াতে। সেখানে বলা হয়েছে, জীবনযাত্রার জরুরী প্রয়োজনের অতিরিক্ত যতটুকু থাকে, সে সবটুকুই নেয়া বৈধ হবে। [কানযুল উম্মাল ঃ মুহাল্লা ইবনে হাযম]।

সম্পদ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যে সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

(১) যে সব উপায়-উপকরণের উপর মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল সে সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। সুতরাং এ সবের সার্বভৌম মালিকানা একমাত্র তাঁরই। মানুষ কেবলমাত্র তাঁরই নির্দেশিত পন্থায় এসব আহরণ ও ভোগ দখল করার অধিকারী। অধিকন্তু দখলীকৃত সম্পদের সে আমানতদার মাত্র; নিরঙ্কুশ মালিক নয়।

(২) একই কারণে মানুষ সম্পদ আহরণ ভোগ-দখল করার ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়। তার অধিকারের সীমা আল্লাহ ও রাসূলের নির্ধারিত নীতিমালা দ্বারা নির্ধারিত। মানুষ নিজে হালাল-হারাম বা জায়েয-না জায়েযের বিধান তৈরী করার অধিকার রাখে না। পদে পদে তাকে আল্লাহ্র বিধান মেনে চলতে হয়।

(৩) সকল মানুষের অধিকার সমান এবং প্রত্যেকে একই রক্ত সম্পর্কের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। সে কারণে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে এমন কোন পন্থাই বৈধ নয়, যদ্দারা একে অন্যকে শোষণ করার এবং সে শোষণের ফলশ্রুতিতে মানব সমাজে উচ্চ-নীচ, শোষক-শোষিত প্রভৃতি নানা স্তর-ভেদের সৃষ্টি হতে পারে।

(৪) নবী করীম প্রত্যেককেই জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী ও মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী হতে কঠোর ভাষায় তাকিদ করেছেন। যাতেকরে কেউ যথেষ্ট ব্যয় করে সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট করার সুযোগ না পায়। হাদীস শরীফে অপব্যয় ও ঐশ্বর্য প্রদর্শন করে অন্যের মনোকষ্টের কারণ ঘটানোকে সুস্পষ্ট ভাষায় হারাম প্রতিপন্ন করা হয়েছে। [মুহাল্লা]

ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যক্তির প্রতিভার ও যোগ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে যেমন সর্বাধিক যত্ন নেয়া হয়, তেমনি ব্যক্তির মর্যাদা নির্ধারিত হয় সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সেবা ও শ্রমভিত্তিক যোগ্যতার মাধ্যমে। যে কারণে দেখা যায় হাবশী কৃতদাস বেলাল, নাম-গোত্রহীন সুহাইব প্রমুখেরা সমাজের শীর্ষ ব্যক্তিত্বরূপে বরণীয় হন। বংশমর্যদা, গোত্রীয় আভিজাত্য বা পিতৃ-পিতামহের সামাজিক দাপট অর্থহীন হয়ে যায়।

দশ বছরের কঠোর সাধনার মাধ্যমে হযরত নবী করীম যে বিশাল একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন, তার আয়তন ছিল প্রায় আট লক্ষ বর্গমাইল। এছাড়াও আরও অন্যূন এক লক্ষ

বর্গমাইল পরিমিত এলাকায় ইসলামী রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। এ বিরাট রাষ্ট্রটা প্রতিষ্ঠা করতে লোক হয়েছিল মাত্র চৌদ্দশত। এর মধ্যে নবীজীর (সাঃ) অনুসারীগণের মধ্য থেকে ছিলেন চারশ' এবং বিরুদ্ধ শক্তির মাত্র হাজার খানেক। কারণ দিগ্বিজয় করা বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পররাজ্য পদানত করা প্রিয় নবীজীর (সাঃ) লক্ষ্য ছিল না। তাঁর জীবদ্দশায় অন্যূন দশ লক্ষ লোক সরাসরি ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন অবশিষ্ট আরও অন্যূন ষাট লক্ষ মানুষ নবী করীমের (সাঃ) কল্যাণময় শাসন মেনে নিয়েছিলেন। বিভিন্ন অমুসলিম গোত্রের প্রায় তিনশ' জন গোত্রপ্রধান মদীনায় হাজির হয়ে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নিকট সমগ্র জাযীরাতুল–আরব থেকে প্রতিনিধি দল উপস্থিত হয়েছিল দুইশত নয়টি, অন্তত ত্রিশটা শক্তিশালী কবীলার সাথে তাঁর লিখিত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। অন্যূন একশতটা তাবলীগী দল বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন এবং অসংখ্য পত্র লিখেন, যেগুলোর মধ্যে চারশতের মত পত্র হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে এখনও সংরক্ষিত রয়েছে।

হযরত নবী করীমের (সাঃ) প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি লক্ষণীয় দিক ছিল প্রশাসনযন্ত্রকে তিনি কোন অবস্থাতেই অবশ্য পোষ্যরূপে জনগণের কাঁধে চাপিয়ে দেননি। সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থাই গড়ে তোলা হয়েছিল একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানরূপে। সে কারণে শাসক প্রশাসকদের জীবনযাত্রার মান সাধারণ নাগরিক জীবনমানের সীমা অতিক্রম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল। খোদ নবীজী (সাঃ) এবং তাঁর নিষ্ঠাবান অনুসারী খলীফাগণের জীবনযাত্রার মান পর্যালোচনা করলে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) যখন শুনলেন, কুফার শাসক বসবাসের জন্য একটি দ্বিতল ভবন নির্মাণ করেছেন এবং দরজায় দ্বাররক্ষী বসিয়েছেন, তখন মদীনা থেকে একজন বিশিষ্ট সাহাবীকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেন যে, দ্বিতল বাড়ীটি তুমি নিজ হাতে আগুন ধরিয়ে জ্বালিয়ে দিবে এবং ঐ অপচয়কারী প্রশাসককে গ্রেফতার করে মদীনায় হাজির করবে।

হযরত নবী করীমের (সাঃ) যুগে সম্পদের সীমাবদ্ধতা ছিল। খাদ্য–বস্ত্রসহ সর্বপ্রকার জীবনোপকরণের অভাব ছিল প্রকট। তবে অভাব কোন সময়ই অনুভূত হতো না। কারণ, সেকালে বিশেষ সুবিধাভোগী কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না। পরবর্তী খলীফাগণের আমল–দারীতেও তা ছিল না। যে কারণে শাসক প্রশাসকগণকেও জনগণের সাথে উপবাসে দিনাতিপাত করতে হতো। পরে যখন প্রাচুর্য এসেছে তখনও শাসক কর্তৃপক্ষের জীবনযাত্রার মানে খুব একটা পরিবর্তন আসতে দেখা যায়নি। জনগণের সেবকরূপে নবীজীর (সাঃ) অনুসারীগণের দায়িত্ববোধ কতটুকু তীব্র ছিল, দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমরের (রাঃ) একটা ঘোষণা থেকেই প্রতীয়মান হয়। একবার তিনি তাঁর শীর্ষস্থানীয় আমলা–প্রশাসকদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, সুদূর ফুরাত তীরে একটা কুকুরও যদি না খেয়ে মরে তবে তার জন্য ওমরকে জবাবদিহি করতে হবে। [কানযুল উম্মাল।]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ঃ সাহিত্য ও সমাজ দর্শন

শরীফুল মুজাহিদ

আমাদের দেশে যাঁরা দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবালের কাব্যদর্শন গভীরভাবে আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান দার্শনিক তিনি। অনেকগুলো ধর্মতত্ত্বজ্ঞান তাঁর নখদর্পণে থাকায় ইকবাল দর্শন আত্মস্থ করতে তাঁকে বেগ পেতে হয়নি। সরাসরি ইকবালের কবিতার রস তিনি আস্বাদন করতেও সক্ষম হয়েছেন। ইকবাল দর্শন ও চিন্তাধারা নিয়ে বিগত কয়েক যুগ থেকেই তিনি কলম চালিয়ে আসছেন। ১৯৮৬ সালে ঢাকায় আল্লামা ইকবাল সংসদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তিনি এ প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টামন্ডলীর সম্মানিত সদস্য ছিলেন। ১৬–২–৮৮ তারিখে তাঁকে কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। তিনি এখনো এ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি।

২

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ দার্শনিক, ইসলামী চিন্তাবিদ বা শিক্ষাবিদ হিসেবে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্বের দাবীদার হলেও সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর পরিচিতি ব্যাপক। তিনি যেভাবে সহজ–স্বচ্ছন্দভাবে বক্তৃতা করেন, তেমনি তাঁর রচনারও প্রধানতম গুণ হচ্ছে সাবলীলতা। ভাব–ভাষা উভয় ক্ষেত্রেই এর ছাপ রয়েছে। দর্শন ও ইসলামী বিষয়াদি নিয়ে তিনি সবচেয়ে বেশী প্রবন্ধ লেখেন সত্য; সৃজনশীল সাহিত্য যেমন গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি রচনায়ও তাঁর পারদর্শিতা এতটুকুন কম নয়। সাহিত্য সমালোচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত। বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায়ই তাঁর কলম স্বচ্ছন্দ। ইসলামই যে মানবতার সর্বাত্মক বিকাশের নিশ্চয়তা দান করে, জনাব আজরফের বিভিন্ন লেখায় তার ব্যাখ্যাই দীপ্যমান।

৩

১৯০৬ সালের ২৫ অক্টোবর (৯ কার্তিক, ১৩১৩) সিলেটের প্রাক্তন মহকুমা শহর সুনামগঞ্জে (বর্তমানে জেলা) নানা বাড়ীতে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জন্ম। তাঁর নানা হাসন রাজা যৌবনে প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। পরিণত বয়সে বিরাগী–তত্ত্বজ্ঞানী মরমী কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

পিতাও জমিদার ছিলেন। তাঁর পিতা দুহালিয়ার জমিদার দেওয়ান মোহাম্মদ আসফ সাহেব শ্বশুর (হাসন রাজা) থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলামের শরীয়তে পাবন্দ, মুসলিম

নবজাগরণে উদ্দীপ্ত এবং জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত এই জমিদারকে সিলেটের খেলাফত আন্দোলনেও নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়। এরূপ পরিবেশে বড় হলেও দেওয়ান আজরফ-এর মানস-সংগঠনে শিক্ষায়তনের পরিবেশই বেশী ছাপ ফেলে। প্রথম জীবনে নানাবাড়ী ও নিজের বাড়ীর পরিবেশ তাঁকে দোদুল্যমান করে। ইংরেজী ভাষার সংস্পর্শে এসে ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রতি কিছুটা আকর্ষিত হন। তিনি পরবর্তীতে অবশ্য এর কোনটিই তাঁর জীবনে স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাঁর শিক্ষক সুরেন্দ্র লাল কুণ্ডু এবং সহপাঠী প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের সাহচর্য্য তাঁকে জীবনে এ দুই প্রভাব থেকে ছিন্ন করে দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়নে আগ্রহী করে তোলে। পরবর্তীতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও আল্লামা আবুল হাশিম তাঁর জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এখন সাতাশি বছরের কোঠায়। তাঁর এই সাতাশি বছর নানা জীবন্ত উপাখ্যানে ভরপুর। ১৯৪৭ সালে আসামের কংগ্রেস সরকার কর্তৃক বহিরাগতদের উপর জুলুম-নির্যাতনের প্রতিবাদে আসাম মুসলিম লীগের কার্যকরী কমিটির সদস্য হিসেবে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে তিনিও আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সিলেট-কাছাড়ের বিভিন্ন স্থানে জনমত গঠনের পর আসামের কামরূপে যান এবং সেখানে এসব জুলুম-নির্যাতনের প্রতিবাদ করেন। ১৪৪ ধারা অমান্য আন্দোলনেও নেতৃত্ব দেন। এ সময় তিনি ভাগ্যক্রমে পুলিশের গুলী থেকে বেঁচে যান। পরবর্তীতে একই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার অপরাধে শিলচরে কারারুদ্ধ হন। মাসাধিককাল কারাও বরণ করেন।

সিলেট জেলার পাকিস্তানের সাথে সংযুক্তির প্রশ্নে ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত গণভোটেও তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সিলেটের গ্রাম-গ্রামান্তরে জনমত গঠনের কাজে ঘুরে বেড়ান। পাকিস্তান অর্জনের পর জীবন বিনাশের আশংকা নিয়েও তিনি আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি পেশের জন্য কলকাতা যান এবং সীমানা নির্ধারণ কমিশনের কাছে ১৩ খানা স্মারকলিপি পেশ করেন।

আদর্শের প্রশ্নে তিনি সারাজীবন অবিচল। জীবনে কোন বৈপরীত্য তাঁকে পর্যুদস্থ করতে পারেনি। জমিদার হয়েও জমিদারবিরোধী নানকার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি নিজের জমিদারীতে দাঁড়িয়ে নানকারদের ভূমিস্বত্ব দান করে মানবতাবাদী আদর্শের এক বিরল ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

এদেশের শিক্ষা-আন্দোলনেও তাঁর অবদান স্মরণীয়। ঢাকা আবু জর গিফারী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে দেশের একাধিক কলেজে তিনি প্রিন্সিপাল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩২ সালে দর্শনশাস্ত্রে এম এ ডিগ্রী নেওয়ার পর তিনি শিক্ষকতাকেই জীবনের পেশা হিসেবে বেছে নেন। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল অবধি দীর্ঘ ৪৯ বছরে এই শিক্ষকতা জীবনে তিনি সুস্থ সবল থেকে জ্ঞানের আলো বিতরণে তৎপর ছিলেন।

দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ ছাড়াও গল্প, কবিতা, সাহিত্য-সমালোচনা ও রস-রচনাসহ সাহিত্যের বিবিধ ক্ষেত্রে তাঁর সরব উপস্থিতির স্বাক্ষর প্রায় ৬০ খানা (প্রকাশিত-অপ্রকাশিত) গ্রন্থ। এর মধ্যে ২০ খানা প্রকাশিত। ৪০ খানা অপ্রকাশিত। তাঁর কাছে তাঁর প্রিয় বই-আত্মজীবনী আজও অপ্রকাশিত।

দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের বহির্জগতে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বহুল নন্দিত। অন্যতম ধর্মতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক হিসেবে বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ এবং বহু দেশভ্রমণ ও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য এ সূত্রেই তিনি লাভ করেছেন।

৪. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

(১) ১৯০৬ ইং ২৫ শে অক্টোবর-১৩১৩ বাং ৯ই কার্তিক শুক্রবার তাঁর নানা মরমী দার্শনিক কবি দেওয়ান হাসন রাজার সুনামগঞ্জ শহরের তেঘরিয়াপাড়ার বাড়ীতে জন্ম। পিতা দুহালিয়ার জমিদার দেওয়ান মোহাম্মদ আসফ, মাতা রওশন হুসেইন বানু। (২) দুহালিয়া মধ্য ইংরেজী স্কুল, সুনামগঞ্জ জুবিলী হাই স্কুল, সিলেট মুরারীচাঁদ কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ। ১৯৩২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ। (৩) ১৯৩৭ সালে সিলেটের গোলাপগঞ্জের মোহাম্মদ চৌধুরী একাডেমীতে প্রধান শিক্ষকরূপে যোগদান। (৪) স্বল্পকালের জন্য সিলেট মুরারীচাঁদ কলেজে সহকারী অধ্যাপকরূপে যোগদান। (৫) ১৯৪৬ সালে আসাম প্রদেশ মুসলিম লীগ কর্তৃক সদস্য নির্বাচিত। (৬) আসাম কংগ্রেস সরকার কর্তৃক বহিরাগতদের উপর নানাবিধ জুলুম সিতম করার প্রতিবাদে ১৯৪৭ সালের মে মাসে শিলচরে আসাম সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ১৪৪ ধারা অমান্য করায় কারাবরণ। ভারত বিভাগের পরে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে কোলকাতায় সীমানা নির্বাচন কমিশনের নিকট ১৩ খানা স্মারকলিপি প্রদান। (৭) ১৯৪৮ সালে ২০ শে নভেম্বর সুনামগঞ্জ কলেজে যোগদান ও ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে অধ্যাপক, ভাইস প্রিন্সিপাল ও প্রিন্সিপালের দায়িত্ব গ্রহণ। (৮) ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের সভাপতি নির্বাচিত। (৯) ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। (১০) ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান দর্শন কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত। (১১) ১৯৫৭ সালে নরসিংদি কলেজের প্রিন্সিপালের দায়িত্ব গ্রহণ। (১২) ১৯৫৯ সালে পাকিস্তান দার্শনিক কংগ্রেসের ধর্ম-দর্শন শাখার সভাপতি নির্বাচিত। (১৩) ১৯৬২-৬৩ সালে ইরাক সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে আল কিন্দির মৃত্যুর সহস্র বার্ষিকীতে যোগদান ও তাঁর জীবনী আলোচনায় অংশগ্রহণ। (১৪) ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান দার্শনিক কংগ্রেসের দর্শন শাখার সভাপতি নির্বাচিত ও মতলব কলেজের প্রিন্সিপালের পদে যোগদান। (১৫) ১৯৬৭ সালে ঢাকায় আবু জর গিফারী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষরূপে যোগদান। (১৬)

১৯৭১ সালে পাকিস্তান দর্শন কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সভাপতি নির্বাচিত। (১৭) ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে দর্শন বিভাগে পরে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে খন্ডকালীন দায়িত্ব পালন। (১৮) ১৯৮১ সালে ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে বিশ্বভারতীতে ভাষণ দান। (১৯) ১৯৮৪ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে ধর্ম সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান ও Faith and Reason নামক প্রবন্ধ পাঠ। এ প্রবন্ধ পরে Dialague-এ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৭ সালে। (২০) ১৯৮৫ সালে রোমে আমন্ত্রিত হয়ে ধর্ম-সম্মেলনে যোগদান ও প্রবন্ধ পাঠ। (২১) ১৯৮৬ সালে ইরান সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তেহরানে সফর।

[দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের নিজের হাতে লেখা জীবনপঞ্জীটি।]

৫

১৯২৬ সালে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের লেখা প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। এ হিসেবে তাঁর লেখার বয়স এখন ৬৭ বছর। সুদীর্ঘ লেখনীর জীবনে তিনি জাতিকে ২০ খানা প্রকাশিত গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন। প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে ৪০ খানা গ্রন্থ। এ ছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, পত্র-পত্রিকা ছাড়াও স্মরণিকা-সংকলনে তাঁর কত হাজার মৌলিক প্রবন্ধ, অনুবাদ কর্ম, গবেষণা প্রবন্ধ, আলোচনা-সমালোচনা বেরিয়েছে, তার সঠিক হিসেবের জন্যে দস্তুরমত থিসিস করা দরকার। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বিশ্বকোষের উপর যে এদেশে থিসিস-ডক্টরেট ডিগ্রী নেয়ার জন্যে অনেকেই এগিয়ে আসবেন- তাতে কাউকে উদ্বুদ্ধ করার বা দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হবে না আশা করি।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য

(১) তমদ্দুনের বিকাশ-১৯৩৯-তমদ্দুন মজলিস, সিলেট। (২) সত্যের সৈনিক আবু যর-১৯৫১ ১ম সংস্করণ-তমদ্দুন মজলিস, ঢাকা। (৩) ইতিহাসের ধারা-১ম সংস্করণ ১৯৫২, তমদ্দুন মজলিস, ঢাকা। (৪) নতুন সূর্য-(গল্পের সংকলন) ১ম সংস্করণ ১৯৫৯, পূর্বাচল প্রকাশনী, ঢাকা। (৫) জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম-১ম সংস্করণ ১৯৫৯ প্রকাশক ইসলামিক একাডেমী ঢাকা; ২য়, ৩য়, ৪র্থ মুদ্রণ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা; ৬ষ্ঠ সংস্করণ যন্ত্রস্থ। (৬) Science and Revelation-১ম সংস্করণ ১৯৮০, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা-১৯৮০। (৭) ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে, ১ম সংস্করণ ১৯৮০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা। (৮) Background of the Culture of Muslim Bengal-প্রথম সংস্করণ, প্রকাশক জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, ঢাকা; পরবর্তী সংস্করণ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। (৯) ইসলাম ও মানবতাবাদ-১ম সংস্করণ-১৯৯০ প্রকাশক ইসলামিক ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশ (১০) Philosophy of History–১ম সংস্করণ–১৯৮২, প্রকাশক ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা। (১১) Abu Dharr Ghifari –১ম সংস্করণ–১৯৮২ প্রকাশক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। (১২) জীবনদর্শনের পুনর্গঠন –১ম সংস্করণ–১৯৮০ ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম। (১৩) সন্ধানী দৃষ্টিতে ইসলাম–১ম সংস্করণ–১৯৮২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। (১৪) দর্শনের নানা প্রসঙ্গ–১ম সংস্করণ ১৯৭৭, প্রকাশক মুক্তধারা, ঢাকা। (১৫) মরমী কবি হাসন রাজা–১ম সংস্করণ–১৩৬৩, প্রকাশক মজ্লিশ প্রকাশনী, ঢাকা। (১৬) ইতিহাসে উপেক্ষিত একটি চরিত্র– প্রকাশক আবু জর গিফারী সোসাইটি, ঢাকা। (১৭) ধর্ম ও দর্শন–১৯৮৬ প্রকাশক বাংলা একাডেমী, ঢাকা। (১৮) হাসন রাজা –১৯৯০, প্রকাশক বাংলা একাডেমী, ঢাকা। (১৯) নয়া জিন্দেগী–(উপন্যাস) ২য় খন্ড, প্রকাশক বাংলাদেশ কোঅপারেটিভ বুক সোসাইটি, ঢাকা। (২০) ব্যক্তিত্বের বিকাশ– (তরজমা) প্রকাশক মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৩, প্যারীদাস রোড, ঢাকা। ১ম প্রকাশ–১৯৬৫, ২য়প্রকাশ ১৯৬৯।

৬. সম্মান ও পুরস্কার প্রাপ্তি

(১) স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার–১৯৮১। (২) ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার (সমাজ বিজ্ঞান গবেষণার জন্য)–১৯৮৩। (৩) নাসির উদ্দিন–স্বর্ণপদক (দর্শন) ১৯৮৪। (৪) বাংলাদেশ মুসলিম ওয়েলফেয়ার মিশন পুরস্কার–১৯৮৫। (৫) কোরানিক সোসাইটি পুরস্কার–১৯৮৭। (৬) শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপংকর পুরস্কার–১৯৮৮। (৭) বাংলাদেশ জাতীয় সাহিত্য সংসদ স্বর্ণপদক ১৯৮৯ (৮) ছাত্র যুব সম্মেলন সংবর্ধনা–১৯৮৯। (৯) জালালাবাদ যুব ফোরাম পুরস্কার–১৯৯০। (১০) খানবাহাদুর আহসান উল্লাহ স্বর্ণপদক ১৯৯০। (১১) রোটারী প্রাইজ–১৯৯১। (১২) বাংলাদেশ সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার –১৯৯১। (১৩) জ্ঞানতাপস ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্বর্ণপদক (১৩৯৫ বাং ১৯৪৯)। (১৪) মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (স্বর্ণপদক) ১৯৮৮। (১৫) ভোলা জাতীয় মঙ্গল সাহিত্য পুরস্কার–১৯৯২। (১৬) বিশ্বনাথ ছাত্র কল্যাণ সমিতি সংবর্ধনা–১৯৯২। (১৭) মৌলভীবাজার মিউনিসিপ্যালিটি সংবর্ধনা–১৯৯২। (১৮) একুশে পুরস্কার –১৯৯২। (১৯) স্যার জগদীশচন্দ্র বসু পুরস্কার, ১৯৯২।

৭. মোহাম্মদ আজরফের পয়গাম

মানব জীবনে রয়েছে নানাবিধ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সমস্যা। এ সব সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। এছাড়া মোহাম্মদ আজরফের মতে, মানবজীবনে রয়েছে নানা বৃত্তি–প্রবৃত্তি পূরণ ও বিকাশের প্রশ্ন। এগুলোর কোনটাকে বাদ দিয়ে কোনটার বিকাশের চেষ্টা হবে একদেশদর্শী ব্যাপার। সুতরাং মানব জীবনের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য প্রয়োজন

বিভিন্ন বৃত্তির সুসমন্বিত পূরণের ব্যবস্থা। তা না হলে মানবজীবনের নানাবিধ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানও সম্ভব নয়। এসব কারণেই প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এই পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হবে মানবপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল–মানবীয় বুদ্ধিজাত মতবাদের সীমাবদ্ধতার কারণে মানুষের উদ্ভাবন–ক্ষমতার বাইরে। এখানেই বিশ্বস্রষ্টা ও প্রতিপালকের প্রদত্ত জীবনব্যবস্থায় অপরিহার্যতার প্রশ্ন এসে পড়ে।

বর্তমানকালে মানুষের মধ্যে জীবনকে খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখার যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, মোহাম্মদ আজরফ তার শুধু বিরোধীই নন, এটা তাঁর দৃষ্টিতে বিরক্তিকর। এ সম্পর্কে কিছুটা তিক্ত স্বরে তিনি বলেনঃ 'বারবার বলা হলেও একটা কথার পুনরাবৃত্তি না করে উপায় নেই। আমাদের বিচারবুদ্ধি ক্রমেই একদেশদর্শী হতে চলেছে। জীবনের যে কোন একটি দিককে একমাত্র দিক বলে স্বীকার করে নিয়ে আমরা তারই আলোকে এ দুনিয়ার যে কোন বিষয়ের তথা মানুষের বিচার করতে চাই। এতে বিচারের মানদণ্ডের অসম্পূর্ণতার দরুন আমাদের বিচারও হয় অসম্পূর্ণ ও একচোখা। মানবজীবনের খণ্ডিত অংশ থেকে আমাদের দৃষ্টি তার পূর্ণাঙ্গ রূপের প্রতি নিবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত না হলে সে বিচার চিরকালই এভাবে একদেশদর্শী থেকেযাবে।'

বর্তমান যুগে এক ধরনের মানুষের অন্ধ যুক্তি–প্রীতিকে তিনি সুনজরে দেখেননি। তাঁর মতে, 'আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে যেসব নীতিকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, সেগুলোও পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞানের কোন শেষ নেই।' তাঁর মতে, মানবজীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য 'ইনসানে কামিল' হওয়া এবং এ লক্ষ্যে পৌঁছবার একমাত্র উপায় মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ রাসূলে আকরম (সঃ)–কে অনুসরণ করা। বিশ্বনিয়ন্তা এমনভাবে রাসূলুল্লাহ্র (সঃ) জীবন গড়ে তুলেছেন, যেন মানুষ সর্বাবস্থায় তাঁকে অনুসরণ করতে পারে। মোহাম্মদ আজরফের কথায়, 'রাসূলে আকরম (সঃ)–এর জীবনী আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, আল–কুরআনের বাণী এ দুনিয়ায় প্রচার করার জন্য তাঁকে অতি শৈশব থেকেই প্রস্তুত করা হচ্ছে। জাহেলিয়ার অন্ধ তমসার কালেও তিনি এমন কোন কাজ করেননি যা পরবর্তীকালে আল–কুরআন নিষিদ্ধ করেছে।' ''সলাম ও মানবতাবাদ' শীর্ষক বইয়ের ২৯ ও ৩৪ পৃষ্ঠায় আমরা দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের এ বক্তব্য দেখতে পাই।

৮. মূল্যায়ন

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ প্রতিভার মূল্যায়নে দেশের প্রথিতযশা লেখক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, কলামিস্ট বিভিন্ন সময়ে কলম ধারণ করেন। আমরা এখানে সে সব থেকে কিছুটা আলোকপাত করার প্রয়াস পাবোঃ

অধ্যাপক আবদুল গফুর 'মোহাম্মদ আজরফ ঃ বাংলাদেশের অনন্য মনীষী' প্রবন্ধে বলেন, 'ব্যক্তি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফকে এক হিসেবে বলা যায় জাত শিক্ষক। তাঁর শিক্ষকতা কখনই ক্লাসের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তাঁর ক্লাসের তো বটেই, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরাও ক্লাসের বাইরে এমন কি তাঁর বাসভবনে যখন-তখন তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে যায়। তিনিও গভীর আনন্দের সঙ্গে তাদের শিক্ষাদান করে থাকেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা আগাগোড়া অসচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও এঁদের পড়িয়ে টাকা নেয়ার কথা তিনি কখনও কল্পনাও করেন না।' [ঐতিহ্য ঃ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ক্রোড়পত্র, পৃঃ ৭৩]

অধ্যাপক আবদুল গফুর আরো লেখেনঃ '..........ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবে মোহাম্মদ আজরফের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাঁর গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি। এদেশে ইসলামের গতিশীল ভাবধারার ইতিহাসে মোহাম্মদ আজরফ এক উজ্জ্বল সংযোজন হিসেবে অমর হয়ে থাকবেন।' [পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৭]

এস. মুজিব উল্লাহ 'দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ঃ ভারতীয় দর্শন প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে লেখেন ঃ .... বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় সংখ্যক মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ অন্যতম। বহু গ্রন্থ প্রণেতা, সুলেখক, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও সাংবাদিক রূপে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। -; কোন অর্থেই তাঁকে সাম্প্রদায়িক অভিধায় আখ্যায়িত করা যায় না। সনাতন হিন্দুধর্মের অনেক গূঢ় রহস্যই তাঁর নখ দর্পণে।' [পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৮-৭৯]

জনাব ফারুক মাহমুদ 'দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ' প্রবন্ধে লেখেন ঃ '..... দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত মজলিসের সুদিনে-দুর্দিনে তিনিই সভাপতি রয়েছেন। এই দীর্ঘ ৩৭ বছরে বহু সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক কর্মী মজলিসের সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের অনেকে এ প্রতিষ্ঠানের সংশ্রব ত্যাগ করে চলেও গেছেন। কিন্তু চিন্তার সততা ও আন্তরিকতা এবং অসাধারণ অমায়িক ব্যবহারের দরুন তাঁর বিরুদ্ধে তাঁদের কাউকেই অভিযোগ করতে শোনা যায়নি।' [পূর্বোক্ত, ৯৫]

১৯৮৬ সালে অগ্রপথিক 'দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সংখ্যায়' সম্পাদকীয়ে লেখা হয় ঃ '—মোহাম্মদ আজরফই বোধ হয় বাংলাদেশের একমাত্র মনীষী, যাঁকে ধর্ম সভা থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, দর্শন সভা থেকে শুরু করে শিল্পকলা-সাহিত্য বা ইতিহাস আলোচনায় নির্দ্বিধায় আহবান করা যেতে পারে।...'

'অগ্রপথিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সংখ্যা'য় মুহম্মদ আবূ তালিব তাঁর স্মৃতিকথায় লেখেনঃ যে ক'জন মনীষী আপন ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যে স্বজাতির হৃদয়ে প্রোজ্জ্বল আসন দখল করে আছেন, অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।' [পৃ ১৮]

জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ তাঁর 'সত্যানুসন্ধানী আজরফ' প্রবন্ধে লেখেনঃ '.. তিনি তাঁর ভাবকে নির্দিষ্ট যুক্তির পথে চলতে বাধ্য করেছেন। আবেগ তাঁর মনীষার স্থির লক্ষ্যকে কক্ষচ্যুত করেনি। তাই তাঁর প্রবন্ধ সত্যিকার প্রবন্ধ হয়েছে। তাঁর জ্ঞান জগতের পরিচায়নে তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক হতে পেরেছেন।..' [অগ্রপথিক, ৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৬ পৃ ১২]

জনাব সাইদুর রহমান 'দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ঃ কিছু কথা' প্রবন্ধে লেখেনঃ '....তখনই তাঁর দার্শনিক প্রজ্ঞা অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। আমার তখনি মনে হয়েছিল, এককালে তিনি দেশের একজন প্রখ্যাত দার্শনিক হবেন।' [ঐতিহ্য ক্রোড়পত্র, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পৃ ৫৫।

খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস 'আমার চোখে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ' প্রবন্ধে লেখেনঃ '——দর্শন শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন কালের দার্শনিক ও দর্শনতত্ত্বের সঙ্গে নিবিড়ভাবে ওয়াকিফহাল। মুক্তবুদ্ধি এবং পরিচ্ছন্ন বিবেকের অধিকারী দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফকে দেখা যায় পরস্পর বিরোধী চিন্তা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মঞ্চে কথা বলতে। যা বলেন এবং যতটুকু বলেন তা স্বকীয় প্রত্যয়, দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিরহংকার আস্থার সঙ্গেই বলেন।' [পূর্বোক্ত, পৃ ৬১]

সন্তোষ গুপ্ত 'দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ঃ আমার চোখে' প্রবন্ধে লেখেন ঃ '—সৌম্য-শান্ত-ফর্সা চেহারা। তবুও পোড়-খাওয়া একটি জিজ্ঞাসু হৃদয় তাঁর মধ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। চেহারায় দার্শনিকসুলভ প্রশান্তির মধ্যে ক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা-বায়ুর ঝাপটার মুখোমুখি একটি মানুষ তাঁর মধ্যে বাস করে। অনুচ্চভাষী, ধর্মজ্ঞ, কিন্তু সামান্যতমও সংস্কারকে তিনি প্রশ্রয় দেন না। মুক্তবুদ্ধির অধিকারী হিসেবে সহজেই ভিড়ের মধ্যে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চেহারায় কোন অসাধারণত্বের ছাপ নেই। তবুও ভিড়ের মধ্যে অনন্য। নিরহংকারী কথাবার্তায়। শিশুর সারল্য ধরা পড়ে তার স্মিত হাসিতে আর বোধ হয় তখনি তাঁকে কাছের মানুষ বলে মনে হয়। পান্ডিত্য দিয়ে ব্যবধান গড়ে তোলেননি, বয়সের পরিমাপ দিয়ে গাম্ভীর্য দিয়ে দূরত্ব বজায় রাখেন না। মিতভাষী অথচ সহজেই আপন করে নেন আলাপিত সকলকেই।' [পূর্বোক্ত, পৃ ৬৩]

ডঃ আমিনুল ইসলাম 'মোহাম্মদ আজরফের ধর্মচিন্তা ও দর্শন' প্রবন্ধে লেখেন ঃ '....দার্শনিক মতবাদের দিক থেকে তাঁর আকর্ষণ প্রধানত ভাববাদের প্রতি। দার্শনিক জীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন জার্মান দার্শনিক হেগেলের মতবাদ দ্বারা। পরবর্তী কালে তিনি ক্রমশ হেগেলীয় প্রভাব থেকে সরে এসে এক নিজস্ব ভাববাদী দার্শনিক মত রচনার দিকে অগ্রসর হন। তাঁর চিন্তা ও রচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির, আবেগের সঙ্গে বিবেকের, এক কথায় ধর্মের সঙ্গে দর্শনের সংযোগ ও সমন্বয় বিধানের পক্ষপাতী।' [পূর্বোক্ত, পৃ ৮৬]

জনাব আবদুল মুকীত চৌধুরী 'মোহাম্মদ আজরফ মনীষার মূল্যায়ন' শীর্ষক লেখায় বলেন ঃ 'আমাদের জাতীয় জীবনের তিনটি পর্যায়ে–বৃটিশ ভারতে, পাকিস্তানে ও বাংলাদেশ আমলে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর শ্রেষ্ঠ মনীষার অবদানে এ তিনটি কালকে প্রভাবিত করেছেন শিক্ষা, রাজনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও দর্শনে। তাঁর চিন্তাধারায় দীপ্তি লাভ করেছে মানুষের মুক্তি– ইহ ও পরকালে। সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে তাঁর সুমহান অবস্থান, গণজীবনের উত্তরণে তাঁর কলম–নিসৃত শব্দমালা মুখর শাশ্বত জীবনের সত্য সন্ধানে তিনি নিরলস আর সর্বোপরি তাঁর গভীর জ্ঞানের পাশাপাশি সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনচরণে তিনি সাধারণ মানুষের চির আপনজন– তাঁর জন্ম যে কোন দেশ ও জাতির জন্য একটি গৌরব, একটি পবিত্র অহংকার।'

'বাংলা সাহিত্যে সিলেট' গ্রন্থের লেখক জনাব শামসুল করিম কয়েস দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মূল্যায়নে বলেন ঃ 'সাহিত্যিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের চিন্তা ও দর্শন সমকালকে প্রভূতভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ মনীষা ব্যতিক্রমী ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর।'

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ৮৭তম জন্ম দিবস উপলক্ষে ২৫ অক্টোবর '৯২ দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় এক .মূল্যায়নে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সুযোগ্য দৌহিত্র সাহিত্যিক–সাংবাদিক জনাব হোসেন মাহমুদ বলেন ঃ 'দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ আমাদের জাতীয় গৌরব। নিরহঙ্কার, সদালাপী, বর্ষীয়ান এ মানুষটির চেহারায় শুদ্ধ জ্ঞানের পবিত্র দীপ্তি সদা বিচ্ছুরিত। এখনো তিনি সচল, সৃষ্টিশীল। আবেদনের হাত বাড়িয়ে কেউ তাঁর সামনে দাঁড়ালে তিনি তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেন না– হয় লেখা, নয় পকেটের পয়সা কিছু একটা তিনি দেবেনই। যদি কোনটিই সম্ভব না হয় তবে পাওয়া যাবে দোয়া। সন্দেহ নেই, দেশ ও জাতিকে এখনো তাঁর অনেক দেয়ার আছে এবং তিনি দিচ্ছেনও। জীবন ও কর্মের মেলবন্ধনে কৃতী পুরুষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ জাতির গর্ব।'

কবি ও গবেষক জনাব মুকুল চৌধুরী দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের সাক্ষাৎকার নেয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন ঃ 'কর্মচঞ্চল ও গণমুখী এই ব্যক্তিত্বের আশি বছর পূর্তিতে অগ্রপথিক–এর পক্ষ থেকে মোট ছাব্বিশটি প্রশ্ন নিয়ে হাজির হই এবং একাধিক বৈঠকে তাঁর এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। এই সময়ে তাঁর কর্মচাঞ্চল্য, গণমুখীনতা, পাণ্ডিত্য ও স্মৃতিশক্তির পরিচয় লাভ করে বিমোহিত হয়েছি। এই সময়ে অসংখ্য লোক সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে এসেছেন। কেউ লেখার জন্য, কেউ সভা–সমিতিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সাক্ষাৎকারের কোন এক গুরুত্বপূর্ণ অংশের আলোচনায় ব্যাঘাত হচ্ছে দেখে বিরক্ত হয়েছি, কিন্তু তাঁর ধৈর্য মোহিত করেছে। প্রতিটি লোকের সাথে অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা, প্রাসংগিক আলোচনায় কোন কোন বিষয়ে তাঁর তাৎক্ষণিক মন্তব্য ও স্মৃতিচারণ বিস্মিত করেছে। সাক্ষাৎকার প্রসংগেও অনেক পুরনো ঘটনার স্থান–কাল–পাত্র যেভাবে তাঁর স্মৃতি থেকে উঠে এসেছে তাও এক বিস্ময়।'

জনাব মতিউর রহমান নীলু 'আজরফের দর্শনে নৈতিকতা জ্ঞান প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে লেখেনঃ '....একজন সুনিপুণ বক্তা, ত্বরিৎকামী সুলেখক, যুক্তিবাদী আলোচক এবং মানবতাবাদী দার্শনিক হিসেবে তিনি বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী মহলে সর্বাধিক পরিচিত। দর্শনকে তিনি দেখেছেন জ্ঞান চর্চার এক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা হিসেবে। আর এ কারণেই জ্ঞানের প্রায় অধিকাংশ লেখাতেই তাঁর বিচরণ উল্লেখ করার মতো। দর্শনের সাথে সাথে সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম, নৈতিকতা, ললিতকলা, মরমীবাদ, ইতিহাস এবং সাহিত্যের অঙ্গনেও তাঁর পদচারণা একজন প্রথিতযশা পন্ডিতের মতো। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তাঁর আলোচনা মৌলিকতার দাবী রাখে। আপন মাতৃভাষা ছাড়াও তিনি আরবী, ইংরেজী, ফারসী, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় সমান পারদর্শী। ধর্মের ক্ষেত্রে শুধু নিজের ধর্ম ইসলামই নয়, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, জৈন ও ইহুদী প্রভৃতি ধর্মের আলোচনায়ও তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। ধর্মকে যুক্তিনির্ভর করে জনপ্রিয় করার দিকেই তাঁর মনোযোগ সবচেয়ে বেশী।' [অগ্রপথিক, ৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৬]

জনাব মোখলেসুর রহমান ১৪ জন মনীষীর জীবন ও কর্মকে ক্রোড়ে করে একটি সংকলন তৈরী করেন 'একান্তে অগ্রগামী চেতনা' শিরোনামে। ১৪৩ পৃষ্ঠাসম্বলিত জীবনী মূল্যায়ন ধর্মী এ সংকলনে তিনি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বিষয়ক প্রবন্ধের শিরোনাম দেন 'উপমহাদেশের ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, সাহিত্যিক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ।' তিনি বইয়ের ২১ পৃষ্ঠায় লেখেন ঃ 'বাংলাদেশের সাহিত্য, গবেষণা, দার্শনিক ও ইসলামী চিন্তাধারায় এক বিশিষ্ট নাম অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। আজ আর তাঁকে সাড়ম্বরে পরিচয় করিয়ে দিতে হয় না। জ্ঞান তাপস এ মনীষীর সাহিত্য ও দার্শনিক চিন্তাধারা সমাজের সকল স্তরে নাড়া দেয়। .....'

৯. গ্রন্থ প্রসঙ্গ

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ-এর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর ওপর আলোচনা পর্যালোচনা বেরিয়েছে। আমরা এখানে তাঁর দু'একটি গ্রন্থ সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পাবো। তাঁর 'জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম' গ্রন্থে 'আমাদের কথা'য় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর তদানীন্তন প্রকাশনা পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুর লেখন ঃ 'ইসলাম সম্পর্কে যুগ সমস্যার আলোকে লিখিত গবেষণাধর্মী পুস্তক বাংলো ভাষায় খুব বেশী নেই। অথচ আধুনিক শিক্ষিত সমাজের জন্য এ ধরনের গ্রন্থের প্রয়োজন খুবই বেশী। উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম যুগের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট সহায়ক হবে ভেবেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ গ্রন্থ প্রকাশনায় ব্রতী হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে এ ধরনের মৌলিক গ্রন্থ বিরল বিধায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য খুব সঙ্গত কারণেই গর্ববোধ করতে পারে।............'

'জীবন দর্শনের পুনর্গঠন' গ্রন্থে 'আমাদের কথা'য় চট্টগ্রামের ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের আবাসিক পরিচালক জনাব আশরাফ ফারুকী লেখেনঃ 'জীবন দর্শনের পুনর্গঠন বইটিতে লেখক দর্শনের পুনর্গঠনের কথাই শুধু বলেননি, ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠনের একটি বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতও পেশ করেছেন।'

১০. জাতীয় অধ্যাপক প্রসঙ্গ

আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হচ্ছে, মেনে নিতে হচ্ছে, দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ন্যায় ব্যক্তি–ইন্সটিটিউটকে আজও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'জাতীয় অধ্যাপক' ঘোষণা দেননি। জাতীয় অধ্যাপক আজো ঘোষণা না দেয়া জাতির জন্য ট্রাজেডি বলেই আমাদের বিশ্বাস। তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক করার জন্যে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জাতীয় দৈনিকে পোস্ট এডিটোরিয়াল ছাপা হয়। বিভিন্ন মহল থেকে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফকে জাতীয় অধ্যাপক করার কথা উচ্চারিত হলেও এযাবৎ সরকারের তরফ থেকে তা সম্পন্ন হয়নি।

দৈনিক মিল্লাতের 'ফারিশতা'র রোজ নামচা' উপ–সম্পাদকীয়তে আক্ষেপের সাথে বলা হয়েছেঃ এদেশের মানুষ এখনো তাঁর যথাযোগ্য মূল্যায়ন করতে পারেনি। সময় মতো তাঁর কদর ও সম্মানবোধ হয়তো আমরা করতে পারলাম না। দেশে তো বুদ্ধিজীবীর অভাব নেই। অনেককেই আবার জাতীয় অধ্যাপক বা National Professor বানানো হয়েছে। আমরা কি পারি না এ জাতীয় একটি সম্মানের স্থান বরাদ্দ করে তাঁকে যথাবিহিত মর্যাদা দিতে? হয়তো পারি, কিন্তু মূর্খের রাজত্বে কে কার পান্ডিত্যের খবর রাখে, আর কে–ই বা তদবীর করে এসব বিষয়ে। ভারতপন্থী বুদ্ধিজীবীদের তদবীর করার লোক যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে, প্রশাসনের অভ্যন্তরেও বিস্তর পরনির্ভরশীল তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের চেলাচামুন্ডারা কিলবিল করছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমিকদের পক্ষে আর কেউ না থাকলেও আছে দেশের জনগণ যারা দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ–এর পান্ডিত্যকে জাতীয়ভাবে বরণ করে নিলে যারপরনাই খুশী ও তুষ্ট হবে।.......' (দৈনিক মিল্লাত, ১১ নভেম্বর, ১৯৯২)।

এমনিভাবে বিভিন্ন পত্র–পত্রিকা ছাড়াও সভা–সেমিনারে তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক ঘোষণা করার বিষয়টি সোচ্চার হচ্ছে। তাই, যথাযথ কর্তৃপক্ষ অনতিবিলম্বে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফকে জাতীয় অধ্যাপক ঘোষণা করবেন বলেই আমরা আশাবাদী। কারণ তিনি এখন সাতাশি বছরের বৃদ্ধ। এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা– বিশ্লেষণের দরকার নিষ্প্রয়োজন।

১১. আমাদের কথা

'বর্তমান যুগ স্পেশালাইজেশনের যুগ। এ যুগে মানুষ সব বিষয়ে নয়, একটি দু'টি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়াটাকেই সুবিধাজনক মনে করে। যিনি প্রকৌশলী তিনি ইতিহাস বা ধর্ম সম্বন্ধে

হয়ত প্রায় কিছুই জানেন না। আবার যিনি ধর্মবেত্তা তিনিও হয়ত বিজ্ঞান বা শিল্পকলা সম্বন্ধে অ-আ জ্ঞানটুকুও রাখেন না। জীবনকে খন্ড খন্ড করে জানবার, বুঝবার ও বিচার করবার এ প্রবণতা চূড়ান্ত বিচারে যতই অবাস্তব, ত্রুটিপূর্ণ ও ক্ষতিকর বিবেচিত হোক, খন্ডিত জীবন দৃষ্টির শৃঙ্খলা থেকে মুক্তির জন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিশ্বমনীষা যতই আকুতি জানান, আধুনিক বিশ্বে এ প্রবণতা অদ্যাবধি ব্যাপক ও প্রবলই রয়ে গেছে। ....বাংলাদেশের সম্প্রতিকালে মনীষার ইতিহাসের এমনি ধরনের এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ।..........'

বর্ষীয়ান দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের উপর লেখা প্রবন্ধে অধ্যাপক আবদুল গফুর কথাগুলো বলেন। সাতাশি বছরের অশীতিপর বর্ষীয়ান দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ প্রতিভার মূল্যায়নে আমাদের কথা আছে। ভাবতে অবাক লাগে, ঢাকায় তাঁকে মাথা গুঁজতে হয় ভাড়া করা বাসায়। তাঁর স্থায়ী কোন ঠিকানা এই ঢাকাতে নেই। বাসায় নেই টেলিফোন। প্রায় হর রোজ তাঁকে বাসা থেকে বেরিয়ে রিক্সা বা বেবী টেক্সিতে করে তবেই সভা-সমিতিতে যোগ দিতে হয়। এ বয়সেও তাঁকে কলম সচল রাখতে হচ্ছে? নয় তো কি? ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা জাতীয় পর্যায়ে আমরা দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ প্রতিভার মূল্যায়ন কি-ই বা করতে পেরেছি? তার সহায়তায়ই বা কতটুকুন এগিয়ে এসেছি? অতি দুঃখের সাথে তিনি বলেছেন ঃ পান্ডুলিপি তো পড়ে আছে, আমার বই ছাপবে কে?

তাঁর হাজারো পৃষ্ঠার পান্ডুলিপি আজো প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। এযাবৎ তাঁর প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে কয়েক হাজার পৃষ্ঠা। কারো কি দায়িত্ব নেই, তাঁর গ্রন্থগুলো বা পূর্ণাঙ্গ রচনাবলী ছাপার ব্যবস্থা করার? তাঁর লেখা পাঠ্য তালিকাভূক্ত করার? অন্য ভাষায় অনুবাদ করার?

তিনি তো জীবনভর জাতিকে বিলিয়ে গেলেন। আমরা যে তাঁকে যথাযথ মূল্যায়নে কার্পণ্য করেছি-এটা সততই সত্য। এই আবেদ মনীষী শরীয়তের সম্পূর্ণ পাবন্দ এক বিস্ময়কর প্রতিভা। পূর্ব রামপুরার বাসায় থেকে আজো জাতির চলাচলের দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি কলমের মাধ্যমে। দীর্ঘজীবী হোন তিনি- এ মুনাজাতই করি।

তথ্যসূত্র

১. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ প্রকাশিত গ্রন্থাবলী,
২. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার
৩. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ব্যক্তিগত ফাইল
৪. ঐতিহ্য ঃ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ক্রোড়পত্র, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬
৫. অগ্রপথিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সংখ্যা, ৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৬
৬. দৈনিক মিল্লাত, ১১ নভেম্বর ১৯৯২
৭. সাপ্তাহিক বিক্রম, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মূল্যায়নধর্মী সাক্ষাৎকার

ইকবালের দর্শন পাশ্চাত্য সভ্যতার ওপর চরম আঘাত *

মাহমুদ বায়্যাত

مسلم استی بے نیاز ازغیر شو . اهل عالم را سرا پا خیر شو .
رزق خود را ازکف دونان مگیر . یو سف استی خویش را ارزان مگیر

হও যদি মুসলিম অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ো না
জগদ্বাসীর জন্য আপাদমস্তক কল্যাণের হও।
নিজের রিজিককে হাতের তালুতে নেয়া দু' রুটিতে সীমিত করো না
যদি ইউসুফ হয়ে থাক নিজেকে সস্তা মনে করো না।

যিনি ছিলেন কবিকুলের সিংহ, বিদগ্ধ আরেফ, স্বাধীনতার অগ্রসেনানী, সাধক, হৃদয়বান দার্শনিক, উপরন্তু যিনি ছিলেন একজন আশেক, দ্বীনদার মুসলমান, ঐক্যের সিপাহসালার, প্রতি যুগের ও প্রতি শাখার ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ববর্গ বিশেষ করে প্রাচ্যের মুক্তিকামী জনগোষ্ঠী মানব ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, যার সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং লিখেছেন, যে কোন পরিস্থিতিতে তাকে ভুলেননি–তার সম্পর্কে কথা বলা ততটা সহজ নয়।

বিশেষতঃ আজকের এ সমাবেশে এমন সব সম্মানিত পণ্ডিত শিক্ষাবিদ রয়েছেন–যারা আমি যা বলতে চাই তার চেয়েও অধিক জানেন। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্যের পর্যায় হলোঃ

اب دریا را اگر نتوان کشید + هم بقدر تشنه باید چشید .

সমুদ্রের পানিকে যদি টেনে নিতে না পার,
অন্তত পিপাসা মিটাতে যতটুকু প্রয়োজন
ততটুকু পান করা চাই (শেখ সাদী)

আমার সময়ের সীমাবদ্ধতা, এদেশে দায়িত্ব পালনের সূচনালগ্নের নানামুখী ব্যস্ততার মাঝে ইকবালের মত মহান ব্যক্তির জীবনী সংক্রান্ত নিবন্ধ লিখতে গিয়ে মুসলিম সমাজ, বিশেষ করে যুব প্রজন্মের সমস্যা এবং এর সমাধান সম্পর্কে ইকবালের যে কাব্য ভাণ্ডার রয়েছে তার সামান্য কিছু নিয়ে আলোচনা করব। অবশ্য একথাও বলবো ইকবাল সাহিত্যের ব্যাপকতা ও বিভিন্নমুখী ক্ষমতা নিয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনা হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

* 'আল্লামা ইকবাল সংসদ' আয়োজিত ''সমকালীন বিশ্ব ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ব'' শীর্ষক সেমিনারে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণ। হোটেল সুন্দরবনের অডিটরিয়ামে ৯ নভেম্বর '৯২ তারিখে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

যে সমস্যাগুলো এই বিদগ্ধ দরদী কবি ও দার্শনিককে ব্যথিত করেছে তা হলো মুসলিম দেশসমূহে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী ও শোষণমূলক আগ্রাসন, কতিপয় মুসলমানের আত্মবিস্মৃতি, নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে তাদের বিচ্যুতি, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দিকে তাদের অন্ধভাবে ঝুঁকে পড়া, অন্য কথায় ফিরিঙ্গীদের চাকচিক্যময় সংস্কৃতির দিকে তাদের ঝোঁকপ্রবণতা এবং যে ইসলামী শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ মানুষ গড়তে পারে তার প্রতি তাদের ভ্রূক্ষেপহীনতা। তিনি পাশ্চাত্যের আগ্রাসন সম্পর্কে বলেনঃ

فریاد ز افرنگ ودل آو یزئی افرنگ
فریاد زشیرینٹی و پرویزی افرنگ
عالم همه ویرانه ز چنگیزی افرنگ
معمار حرم ! باز به تعمیر جهان خیز -

ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ
পাশ্চাত্যের আসক্তির বিরুদ্ধে ফরিয়াদ
ফিরিঙ্গীদের মিষ্টি আর পারভেজী দাপটের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ
ফিরিঙ্গীদের চেঙ্গিসী আক্রমণে
গোটা বিশ্ব আজ ধ্বংসপ্রায়
বাইতুল্লাহ আল-হারামের স্থপতিরা
বিশ্বগড়ার কাজে জেগে উঠ।

মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেনঃ

مسلم استی بی نیاز از غیر شنو + اهل عالم را سراپا خیر شو
رزق خود را ازکف دونان مگیر + یوسف استی خویش را ارزان مگیر -

মুসলিম তুমি মুখাপেক্ষী হয়ো না কারো
বিশ্ববাসীর কল্যাণ তরে হবে আপাদমস্তক তব,
দু'মুঠোর মাঝে দু'টি রুটিই কেবল তব সম্বল নয়
তুমি তো ইউসুফ মূল্য তোমার কম নয়।

যে সমস্যাটি আজকের মুসলিম সমাজ বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়কে হুমকির সম্মুখীন করেছে তা হলো পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, যদিও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটি নতুন বিষয় নয়। মুসলিম বিশ্বে তাদের অনুপ্রবেশের সূচনা থেকে হয়ে আসছে এবং চলছে। তৃতীয় বিশ্বের বেশীর ভাগ দেশে মুসলমানদের জাগরণ, আত্মপ্রত্যয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন, সংগ্রাম ও স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদীদের থাবা বিস্তারের পথ-পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়েছে। আজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জটিল মারপ্যাঁচে ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে দেশসমূহের সীমা-পরিসীমা অতিক্রম করে একই সাথে সকল দেশের উপর আধিপত্য বিস্তারের সুযোগে সর্বগ্রাসী আগ্রাসন শুরু করেছে। পাশ্চাত্য সংবাদ মাধ্যম ও চলচ্চিত্র জগত প্রাচ্যের চরিত্র ও আচার-আচরণকে পরিবর্তন করার কাজে দেদার কাজ করে যাচ্ছে। তাদের এ ফাঁদ থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রয়োজন ইসলামের মৌলিক শিক্ষার দিকে গভীরভাবে মনোনিবেশ করা। ইকবালের মত এ মহান কবির আত্মাকে আল্লাহ প্রশান্তির দিন, যার কবিতা পুরোনো হয় না, আজও তার কবিতার বাণী তেজোদীপ্ত মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে।

ইকবাল পাশ্চাত্য চিন্তাধারার ক্ষেত্র সৃষ্টির মূল ও গভীরতা এবং পশ্চিমা নামকরা দার্শনিকদের অবস্থা বর্ণনা করে তাদের সমালোচনা করেছেন। তার দৃষ্টি ছিল মুসলিম সমাজের সৌন্দর্য্যের দিকে। পাশ্চাত্যের চিন্তা-চেতনার মূলে কি আছে তা তাদের নয়া চরিত্র ও বাহ্যিক আচরণের গভীরে খুঁজলেই প্রতিভাত হবে। যেমন তিনি বলেনঃ

راهب دیرینه افلاطون حکیم ۔ ازگروه گو سفندان قدیم
رخش او در ظلمت معقول گم ۔ در کهستان وجود افگنده سم
گفت سر زندگی در مردان است ۔ شمع را صد جلوه از افردن است ۔

পূরোনো সাধক প্লাটো জ্ঞান তাপস
অতীত যুগের গুহপান্ডাল দলের একজন
তার বেগবান ঘোড়া বিবেকের আধারে হারিয়ে গেছে।
সৃষ্টির অস্তিত্বের গভীরে সংক্রমিত করেছে বিষ
বলেছেন জীবন রহস্য রয়েছে মরার মাঝে
মোমবাতির শতগুণ প্রভা তার জমে যাওয়ার মাঝেই রয়েছে।

তাই প্লাটো, এরিস্টটল ও বেকনের দর্শনও পর্যালোচনা করেছেন, তবে তার কথা ছিল-এগুলো পড়, কিন্তু তাতে আকৃষ্ট হয়ো না। যেমন বলেছেনঃ

زمانی با ارسطو آشنا باش + دهے باساز بیکن هم نواباش
ولیکن ازمقام شان گزر گن + مشوکه اندرین منزل سفر کن

কিছু সময় এরিস্টটলের সাথেও পরিচিত হও
বেকনের সুরের তানে তাল ধর
কিন্তু তাদের অবস্থান থেকে অগ্রসর হও
সেখানে গিয়েই ঘর তৈরী করে থেমে যেয়ো না
সফর অব্যাহত রাখ।

অন্যত্র বলেছেনঃ

ولیکن حکمت دیگر بیا موز + رهان خود را ازین مکر شب وروز

তবে অন্যের জ্ঞান–বিজ্ঞান শিক্ষা কর
দিবস রজনীর এসব প্রতারণা থেকে বাঁচার জন্যই তা শেখ।

যারা ইসলামী সংস্কৃতির গভীর মর্ম উপলব্ধি না করেই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ছিন্ন মূল সংস্কৃতির অনুকরণে আত্মহারা হচ্ছে, নিজের দেশের উন্নয়নে ও স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য নব নব জ্ঞান–বিজ্ঞান আয়ত্তে না এনে পাশ্চাত্যের ভাসাভাসা আচরণ ও অন্ধকার শূন্য চরিত্র শিক্ষা লাভ করছে, পাশ্চাত্যের পোশাককে নিজের ভদ্রতা সৌজন্যতার প্রতীক বানাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে ইকবাল বলেনঃ

قوت افرنگ از علم و فن است
ازهمین آتش چراغش روشن است
حکمت از قطع و برید جامه نیست .
مانع علم وهنر عمامه نیست
علم و فن را ای جوان شوخ وشنگ
مغزمی باید نه ملبوس فرنگ

ফিরিঙ্গীদের শক্তি বিজ্ঞান ও কারিগরীতে
এ অগ্নিতেই তাদের বাতি জ্বলছে
হেকমত বা প্রজ্ঞা জামা ছেঁড়া নয়
হেকমত, বিজ্ঞান, কারিগরী পাগড়ী পরার বিরোধী নয়।
বিজ্ঞান ও কারিগরীর মাঝে মত্ত হয়ে পড় হে যুবক
তবে ফিরিঙ্গীদের সাথে মনমগজ মিলিত করো না।

ইকবাল ও প্রাচ্যের অন্যান্য মুসলমানদের পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রত্যাখ্যানের অর্থ জ্ঞান–বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা বর্জন নয়। উক্ত কবিতার ছন্দ ক'টিতে তা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, পশ্চিমারা জ্ঞান–বিজ্ঞানের যে–সব কলাকৌশল অবলম্বন করে প্রাচ্যের ঐ সমস্ত লোকের মধ্যে দ্বিধা–দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে যারা ইসলামের মূল সংস্কৃতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়, সে–সব জ্ঞান–বিজ্ঞানেরও সমালোচনা করেছেন। বস্তুত ইকবাল এ জ্ঞান–বিজ্ঞানের গুরুত্ব এবং এক্ষেত্রে পরিণতি কি হবে তা যুব সমাজের সামনে সুস্পষ্ট করে দিতে চান। এ প্রসঙ্গে বলেনঃ

در جنیوا چیست غیر از مکر فن ۔ صدتواین میش وان نخبچیر من
دانش افرنگیان تیغ بدوش ۔ درهلاك نوع انسان سخت کوش ۔

মাতালদের কাছে প্রতারণা ও কলাকৌশল ছাড়া আর কি আছে।
তোমার শিকার কি মেষগুলোই
আমার শিকার তো ঐগুলো (সিংহগুলো)।

ইকবাল দর্শনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তিনি জাতীয়তা, রুসম–রেওয়াজ ও সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী নন। তার বেদনা সকল মুসলমানের বেদনা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ

من وتواز دل دین نا امیدیم + چوبوی گل ز اصل خود رمیدیم
دل مامرد و دین از مرد نش مرد ۔ دو تامر گے بیك سودا خریدیم
مسلمانی کے داند رمز دین را + نساید پیش غیرٔ الله جین را ۔

আমি আর তুমি দ্বীনের জীবনিশক্তি হতে নিরাশ

যেমন ফুল থেকে তার সুবাস কেড়ে নিয়েছি
আমাদের অন্তর মরে গেছে, দ্বীনও তার সাথে বিদায় নিয়েছে
দুই মৃত্যু একই সদা হিসেবে খরিদ করেছি
যে মুসলমান দ্বীনের ভেদ জানে
গাইরুল্লাহর কাছে মাথা নত করে না।

ইকবাল পাশ্চাত্যের বন্দীশালা ও ফাঁদ থেকে বাঁচার এবং নাজাতের একমাত্র পথ দ্বীন- ইসলাম ও কোরআনকে আঁকড়ে ধরার মাঝেই দেখতে পেয়েছেন। যেমন বলেছেনঃ

ملتے را رفت چون آئین زدست + مثل خاك اجزاے اوازهم شکست
هستی مسلم ز آئین ات وبس + باطن دین نبی صـ این امت وبس
تو همی دانی کے آئین توجیت + زیرگردون سر تمکین توجیت
ان کتاب زنده قرآن حکیم + حکمت او لایزال است و قدیم
نوع انسان را پیام آخرین + حامل او رحمة للعالمین
ارج میگیرد ازونا ارجمند + بنده را از سجده ساز وسر بلند
گر تومی خواهی مسلمان زیستن + نیت ممکن جز بقرآن زیستن
از تلاوت برتو حق دارد کتاب + تو از وکامے که می خواهی بیاب .

যে জাতির আইন হাতছাড়া হয়েছে,
মাটির মত তার অংশগুলোও খসে পড়েছে।
মুসলমানের আস্তিত্বই হল- খোদায়ী বিধান
নবী (সাঃ)-এর দ্বীনের গূঢ় রহস্যই তাতে নিহিত।
তুমি কি জান তোমার বিধান কি?
গোলকের নিচে তোমার অবস্থানের রহস্য কি?
ঐ জীবন্ত কিতাব প্রজ্ঞাময় কোরআন যার প্রজ্ঞা অনাদি-অনন্ত
মানব জাতির জন্য তা চূড়ান্ত পয়গাম

যার বাহক হলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন
যদি তুমি চাও মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকতে
কোরআন ছাড়া বাঁচার কোন পথ নেই,
এ কিতাব তিলাওয়াতের মাধ্যমেই তোমার অধিকার নিয়ে নাও,
তুমি যা চাও তা–ই তার মাঝে পাবে।

সুধীমন্ডলী! আমরা যদি ইসলামী সমাজের সমস্যা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আগ্রাসনের দিকে তাকাই–এটা সবার কাছে দিবালোকের মত সত্য প্রমাণিত হবে যে, পশ্চিমারা সম্মিলিত প্রচারযন্ত্র ব্যবহার করে, টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালা ও ফিল্ম প্রদর্শন করে, নাটক, নভেল, অশ্লীল ম্যাগাজিন প্রকাশ করে যুব সমাজকে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির দিকে আকৃষ্ট করছে এবং ইসলামী সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এর মাধ্যমে তাদেরকে এমন এক অস্তিত্বের রূপ দিতে চায়–'যা দেয় তা–ই খাবে, যা খাহেশ তা–ই লিখবে– যাকে ইচ্ছা তাকেই মারবে', অর্থাৎ যে কাজগুলো তারা ইকবালের যুগে সামরিক হামলা ও তীর কামানের দ্বারা সম্পাদন করত, আজকে প্রযুক্তি ও সম্মিলিত প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে কোনপ্রকার প্রতিরোধ ছাড়াই করে যাচ্ছে। তাই আজকেও ইকবালের কবিতা সম্ভার যুব সমাজের পড়ার মত কবিতা এবং অতীব প্রয়োজনীয়ও বটে।

আশার কথা, ইকবালের এই আশা–আকাঙ্ক্ষা আজ ইসলামী ইরানে প্রতিফলিত হয়েছে। মহান নেতা ইমাম খোমেনী (রঃ)–এর নেতৃত্বে কোরআন ও দ্বীনের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ইরানী জনতা পাশ্চাত্যকে ছুঁড়ে ফেলেছে, আর ইসলামকে করেছে সমুন্নত। তাই তো ইরানের জনপ্রিয় কবি আহমদ শরীয়ত বিদার ইকবালকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেনঃ

حضرت اقبال ای علامه فرزان ما
اسمان شرق را ای اختر تا بان ما

درمیان ظلمت آو باز استعمار غرب
نقطه اقبال شرق و مهر نور افشان ما .
سوختی چونان چراغ لاله بارو شنگری
ماهم اکنون ز ان تو انسان که بودی زآن ما
داشتی خود با جوانان عجم روی سخن
داره پوند از اخوت جان خود باجان ما .
دست یا ید یاحقیقت ملت مسلمان که هست
مصطفے (صـ) رانکته ها برظاهروپنهان ما

انکَه ز نجیر غلامان بشکنداز ره رسید
مرد حق برخاست آری اتیك از ایران ما
رهبری از نسل پاك سردر آزاد گان
بامهابت، پرصلابت، نوح کشتیبان ما
انقلابی راکه در ذل پروراندی سالها
اینك آمد بارور درحیطه امکان ما ؛

মহামহিম ইকবাল– হে আমাদের জ্ঞান তাপস!
প্রাচ্যের আকাশের হে আলোকোজ্জ্বল রবি
পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী অমানিশার তিমির মাঝে
প্রাচ্যের সৌভাগ্য, আমাদের প্রিয়তম আলো বিচ্ছুরণকারী
আলোক প্রভা নিয়ে নানা ফুলের বাতির মত তুমি জ্বলে উঠেছ,
আমরা এখনও পূর্বের মতই তোমার প্রত্যাশায়।
প্রাচ্যের যুব সমাজ ছিল তোমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু
আমাদের পরস্পরে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে জয়গান তুমি গেয়েছে।
সালমান ফারসীর জাতি মহাসত্যের সন্ধান পেয়ে যাচ্ছে
আমাদের ভেতরে ও বাইরে রয়েছে মুস্তফা (সাঃ)–এর অবস্থান,
বন্দীশালার শিকল ছিন্ন করার সে মহাবীর এসে পড়েছেন
আমাদের ইরানে সত্যের অতন্দ্রপ্রহরী জেগে উঠেছেন
মুক্তিকামী নেতার বংশ হতে এসেছেন এক নেতা
গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তার অধিকারী তিনিই আমাদের নূহের কিশতির কান্ডারী
বহুকাল থেকে যে বিপ্লব নিয়ে ভেবেছেন–
সে বিপ্লব এখন আমাদের সামনে উপস্থিত।

ইনশাল্লাহ, মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে কোরআন আঁকড়ে ধরার তাওফীক দিন, আমরা মুসলমানরা যেন গভীর জ্ঞানের বরকতে পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে নস্যাৎ করে দিতে পারি। আল্লাহ আমাদের যুব সমাজকে ইসলামের মূল সত্য উপলব্ধি এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্তঃসারশূন্যতা বোঝার তাওফীক দিন–এ কামনাই করছি। ওয়াসসালাম।

এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান অনূদিত

Speech of His Excellency Anwar Kemal.

High Commissioner for Islamic Republic of Pakistan

Mr. President,
Mr. Secretary General,
Advocate Mujibur Rahman Sahib,
Distinguished guests,

Aslam Alaikum

It is a great honour that you have invited me on the auspicious occasion of the 114th birth anniversary of the birth of Dr. Allama Iqbal. The Allama Iqbal Sangsad of Bangladesh deserves all the credit for having organised this excellent function. The papers read today and the discussions that have followed are eloquent testimonies to the high standard of scholarship of the participants. Indeed it was with some trepidation that I am saying these few words, conscious as I am of my limitations. As much ground has been covered today I shall restrict myself to a few brief comments.

The main point that I should like to make is that Dr. Iqbal was a mighty awakener of the Muslim Ummah at a time of unprecedent adversity. His formative years coincide with the heyday of imperialism and colonialism. Many Muslim states had lost their independence and sovereignty. The Muslims of the world had never faced such grave peril since the earliest days of Islam. The great poet philosopher inspired the Muslims to think and act in unison to carve out a shining destiny for themselves. Surely, this august gathering remebers Iqbal's message :

سبق پھر پڑھہ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا،
لیا جائیگا تجھہ سے کام دنیا کی امامت کا

* An address delivered as chief guest at a Seminar on Allama Iqbal held under the auspices of Allama Iqbal Society on 28 November '91

Read again the lessons of Truth, Trust, Justice and Gallantry. You are destined to give leadership of the World.

However discouraged we may feel in the face of economic problems and political difficulties, we should remember that we are stronger and prosperous than in the past thanks to the ever-growing awareness of the Ummah which was inculcated and infused by the philosophy and poetry of Allama Iqbal. We have to work hard to consolidate the gains.

Allama Iqbal advocated the unity of the Ummah, on the basis of Islamic teachings. Along with the great Sayyed Jamaluddin Afghani, Allama Iqbal ranks as one of the greatest of the Pan-Islamists. Iqbal contributed mightily to our awareness of all issues of concern to the Muslims at large, be it in North Africa, Palestine, Turkey, Iran or the South Asian Sub-continent.

Alama Iqbal's role in persuading Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah to assume the leadership of the Muslims of the Sub-continent and his advocacy of an independent homeland for the Muslims of South Asia were decisive and changed the course of history. Allama Iqbal is rightly revered as the poet philosopher of Pakistan but Allama Iqbal does not belong to Pakistan alone. He spoke for the entire Ummah. His philosophy and poetry is highly regarded throughout the Muslim world because of the relevance of his ideas in today's world. No doubt the Islamic Ummah will face many difficulties in the years ahead. But with the help of Allah Almighty and through our own bold and fearless efforts, on which Allama Iqbal placed great emphasis, we shall overcome all obstacles, and secure our rightful place in today's world.

ALLAMA IQBAL AND SUFISM *

By Dr. Abu Sayeed Nuruddin

Allama Iqbal's thought is essentially religious, having deep linkage with "SUFISM", with very high spiritual values, but with a difference from the age old and traditional approach toward life: his departure was from "Pantheism" to "Individualism" and from belief in Universal life to Individual life.

In the early stage of his thinking at home and abroad till his return from Europe in 1908, he did not altogether discard "Pantheism" which is amply evident from the stray thoughts in the Urdu poems of his early life at home published in "Bang-i-Dara", and monumental research work abroad on : "Development of Metaphysics in Persia". However a tendency to "Individualism" was not totally absent. His creative mind was rather slowly working towards and formulating ideas in that respect as a normal creative procedure.

A revolutionary change in mind actually came after his return from Europe-to put it in his own words : "Europe has made me a real Muslim". Reaction to western influence in his case was rather in the reverse direction, which was quite exceptional and unusual.

Of the well known trinity of 'Metaphysics' and of course that of 'Sufism' as well, in its highest form- God, Man and the Universe, Allama Iqbal is mostly concerned with Man, as a central and focal point of his philosophy, the other two components, viz God and Universe coming in view only at the crossroads, determining the position of 'Man', and to the extent it is necessary to evaluate him in line with the declaration of God in the holy Quran: "And we have honoured the sons of Adam[1] i.e. Mankind". We note with interest that no other

* The paper was read in the World Congress on Allama Iqbal held at Cordova, Spain from 21st to 24th November, 1991. as a representative of Allama Iqbal Sangsad, Dhaka.

philosopher, neither in the West nor in the East, has laid so much emphasis on 'Man', as Allama Iqbal. In fact, here lies his greatness and his difference from all other philosophers of the past and present.

The core of his philosophy has also been clearly expressed in reply to a question; as to what was his teaching: "My forefathers were Brahmins. They spent their lives thinking what was God. I am spending my life thinking : What is Man".[2]

Accordingly, the main thought of Allama Iqbal has been built on this basis in the name of KHUDI, a Persian term meaning Self with a complete new meaning and connotation.

Sufism in Islam is a typical philosophy of life oriental in character gradually developed by the eminent Sufis in the Middle East and the Indian Sub-continent over a period of a few centuries. It attained its highest form in the doctrine of 'Wahdat-ul-Wajud'-'Unity of Being', obtained through Beatific Vision called 'Kashf'.

Sufism has a long outstanding history with various aspects in it, and having divergent ways and schools in its fold. We are not concerned here with all the details. We would therefore, confine our discussion within the purview of the special theme-the highest form: 'Wahdat-ul-Wajud', in relation to khudi-Self.

On a close study of the history of Sufism, we find that almost all the Sufis in the Islamic world tried to determine the position of God, Man and the Universe under the influence of the Pantheistic philosophy with a negative approach to life so far as Man and the Universe were concerned.

According to them, this was the real Islam in the deeper sense, tracing its origin from the different verses of the holy Quran as well as from the Sayings of the Prophet Muhammad (Peace be upon him).

Pantheism has affinities and similarities with Sufism in the sense that-it has been adopted, developed and maintained by almost all the great Sufis and Saints of Islam. Otherwise, it is purely a Metaphysical

subject, which due to passage of time, different environments and circumstances has been some how or other mixed up with 'Tasawwuf' which in fact is a matter of belief, practice and appreciation, has been made a theoretical problem most intricate and difficult to understand.

The doctrine of 'Wahdat-ul-Wajud'-'Unity of Being' made its way into 'Tasawwuf' through 'Neo-Platonism' which again came into existence as an independent school of thought in the third century AD. by way of interpretation and explanations of Plato's theory of 'Ideas' called by Sufis: 'A yan-i-Thabita'- 'Fixed proto types'.

The basic principles of Neo-Platonism may be summarised as under:

> 'Existence is actually one, and that existence alone is the main source of all other existence. In fact the world has emanated from that existence, and finally it has to go back to that 'One Being'. In other words, save and except the 'One Being', whatever exists is merely a shadow of the 'One Being' and does not have any permanent existence. In 'Tasawwuf' this is called 'Hama Wost'-all is He."
>
> "God is the exact Universe·i.e. God Himself is the Universe, as if God and the Universe are the same. God can not he expressed by any attribute. For God, any interpretation like Existence, Being, Essence and Life is incomplete. God is above all these attributes and interpretations".
>
> "Thought can not be made applicable to God, as it presupposes two things- The Thinker and the Thing over which he can think. Again thought necessitates the precondition that the thinker requires a state of mind other than that exists within himself leading to dualism, which is against the fundamental concept of 'Divine Unity'.
>
> "God must exist, and He is complete by Himself. He is above all analysis and numerical calculations. He is surrounding everything. He is unlimited. Any kind of reference to 'Knowledge' and 'Perception' to Him is also wrong, as other than

> Himself nothing has got existence, which can be known or perceived".3

Since the Pantheistic Philosophy of Neo-Platonism, as summarised above, had some resemblance to and similarity with the Islamic Concept of 'Tauhid'-'Divine Unity', the Ascetic Sufis like Dhu'l-Nun of Egypt (d. 861 AD), Bayzid Bustami (d. 875 AD) and Hussain bin Mansur Hallaj (d. 921 AD) and others in the ninth century A.D. accepted this philosophy as the inner aspect of 'Tauhid', and made it an integral part of Sufism. They presented such a new interpretation and explanation as did not exist in Islam at its pristine age.

Besides, prominent Muslim Philosophers like Al-Kindi (d. 883 AD), Al-Farabi (d. 950 AD), Ibn Maskuyah (d. 1030 AD) and Ibn Sina (d.1037 AD) also interpreted and explained Plato's philosophy in a similar way and accepted the same as Islamic philosophy.

It may be mentioned here that Islam's basic and fundamental teaching is 'Tauhid'-`Divine Unity' or true belief in one God. In the pagan age, the Arabs used to worship three hundred and sixty idols of different kinds and names.

The invitation to 'Tauhid' by prophet Muhammad- (Peace be upon him), was in fact a revolutionary movement against that plurality. He explained to people that the numerous artificial Gods whom they worshipped were all false. The real and true God was One, and he alone deserved to be worshipped.

Against this pure and simple concept of Tauhid there came into being the Tauhid-i-Wajudi, as stated earlier, under the influence of Pantheistic philosophy.

But still the Pantheistic philosophy could not gain much influence and remained rather, in its infant stage. It was Shaikh Muhi-ud-Din Ibn Arabi (d. 1240 AD), who presented this philosophy in all its details in the name of Islamic Mysticism. Owing to his untiring efforts, all the principles of Neo-Platonism in respect of this particular theory became amalgamated with the concept of 'Tauhid' in such a manner

that no distinction could be perceived between them. Ibn Arabi was an author of many books, 'Futuhat-i-Makkia' and 'Fususul Hikam' being the most important ones, specially, in 'Fusus' he discussed 'Pantheism-'Wahdat-ul-Wajud' in great details.

In respect of `Tauhid'-'Divine Unity', Ibn Arabi had the firm belief that 'Being' was 'One'. Only God did exist. Existence of all other creations had got no separate entity. In the real sense, there was no difference between the 'Creator' and the 'Creation'. He who differentiated was simply unable to perceive the reality.4

Ibn Arabi in his writings insisted with the utmost assurance and firm belief upon the fact that the Pantheistic theory- 'Wahdat-ul Wajud' was the only reality of Islam. In support of his stand he adduced proofs and evidences from the holy Quran as well as from Traditions of the Prophet Muhammad (Peace be upon him). As for example, he quoted from the holy Quran: "And we are nearer to him than the great artery" (50:16), and argued that this verse did not bear any other meaning than that God Himself was the limbs and parts of the body of the servant. From the Traditions, he referred to the following statement: "Created Adam in the image of Himself". According to him, this meant that Man possessed all the attributes of God, and in fact, these were His attributes, which were revealed in Man, as if Man was the embodiment of the attributes of God.5

To Ibn Arabi, the relation of the Universe with God was that of Exactitude. He affirmed this Exactitude either by negation of Existence of the Universe or by confirming the existence of God.

In the case of the first proposition, he stated that the existence of the Universe was only a nominal, fictitious and unreal thing. It was non existent in the outside. And in the case of the second proposition, he held that the Universe itself was God. In fact it was the manifestation of the only One 'Being', in which the unity revealed itself. In those manifestations, the Unity completely disappeared. Besides those manifestations, there was no separate existence of the unity. That

being so, it was useless for the devotee to search for God beyond this Universe.6

The theory of Pantheism- Wahdat-ul-Wajud introduced in Sufism by Ibn Arabi, had deep impact on the contemporary Sufis, and also on those who came afterwards. Gradually, the principles of the doctrine became so common in the Muslim world that almost all learned people having some inclination toward Sufism, came under his influence. Besides the Sufis, Arabic, Persian and Urdu poets and writers, who claimed to be Sufis, introduced these ideas in their verses and writings attaching to them the utmost importance. In the circumstances, the real spirit of Islam gradually disappeared, and the Muslims in general, began to consider inaction, weakness, laziness, idleness and above all negation of self, as very attractive and fascinating things. They also came to look upon renunciation of the world and escape from the struggle of life as a source of comfort and consolation and also as a means of spiritual success and freedom. They chose solitary life as an ideal and avoided the problems of ordinary existence.

These harmful Platonic ideas actually became very common in the Muslim world on account of Ibn Arabi, and in the true sense, he was solely responsible for this.

Allama Iqbal emerged in the Muslim world with an extraordinary and rare poetic genius. When he went deep into history and reflected on the rise and fall of nations down the ages and gave due consideration to their causes, he came to the conclusion that all this happened because of either affirmation or negation of Khudi-self. The nation which realized the existence of Khudi and made it strong, could survive in the world with all its power, glory and dignity; and the nation which could not do so and did not become aware of its weakness, perished and was wiped out from the surface of the earth.

Allama Iqbal visualized the same thing about the rise and fall of Muslim Nation. He found that as long as the Muslims directed their attention toward realizing the potential of Khudi, they had success, power and

greatness as well as dignity. He maintained that the Muslim should therefore, realize his Khudi-Self and, after developing it in the proper manner, attain the position of Niabat-i-Ilahi-vicegerency, for which he had been sent to Earth.

A nation was however, composed of individuals, and so, Allama Iqbal first of all determined the Khudi of the individual with a positive approach toward life. Then he put forward ideas on the Khudi of the nation. He also found that the root cause of negation of the Khudi of the individual was the prevailing doctrine of Pantheism-'Wahdat-ul-Wajud'.

The greatest exponent of the doctrine of 'Wahdat-ul-Wajud', as stated in the preceding pages, was Shaikh Muhiuddin Ibn Arabi. Subsequently, Fakhruddin Iraqui (d. 1287 AD) and Khwaja Hafiz of Persia (d. 1389 AD) made the ideas of that theory an integral part of their poetical utterances. Khwaja Hafiz had captivated the minds of the Muslims by the inimitable beauty of his verse.

Naturally, Allama Iqbal singled out for his criticism first Plato, the father and founder of that theory, and next Khwaja Hafiz, one of the chief exponents of this negative philosophy of life, in the first edition of his Persian poem: "Asrar-i-Khudi". In this connection, he also bitterly criticised Ibn Arabi in his own writings, as he said :

> "With this view point Shaikh Muhi-ud-Din Ibn Arabi of Undolesia interpreted the holy Quran, which influenced the mind and heart of the Muslims very deeply. Due to profound knowledge and virtues of the great Shaikh and also due to his gigantic personality, the doctrine of : 'Wahdat-ul-Wajud' had been made an essential part of the Islamic thought. Fakhruddin Iraqui (d. 1287 AD) and Awhad-ud-Din Kirmani (d. 1298 AD) were very much influenced by his teachings, and gradually all the poets of the East came under the same influence".7

The after effects of the theory of 'Wahdat-ul-Wajud' as already stated earlier, had been negative for the Islamic world. Owing to these

effects, Muslims of the world as a whole had lost interest in action. An attitude of inertia, inaction and passivity developed among them, which according to Allama Iqbal was against the spirit of Islam.

When according to the doctrine of 'Wahdat-ul-Wajud' it was logically established that the world with all its contents was worthless, the inevitable results were renunciation of the world, asceticism (Rahbaneyat) and above all, negation of Self-Khudi. That is why, Allama Iqbal vehemently opposed the theory. To Quote him :

> "If by 'Tasawwuf' it was meant sincerity in action, and it was actually so in the early period of Islam then no Muslim should raise any objection to this. But if 'Tasawwuf' was considered to be a philosophy-------- and it endeavoured to present a typical doctrine specially based on 'Kashf'- Beatific vision with new interpretations and explanations regarding the realities of the universe and God, my heart revolted against it".8

He was bitter about Ibn Arabi, as he wrote to his friend Serajuddin Paul :

> "The first Poet of 'Tasawwuf' was Iraqui who versified in his book: 'Lumat' the teachings of 'Fususul Hikam' of Ibn Arabi. So far as I understand, in 'Fusus' there is nothing but infidelity".9

The effects of the teachings of Khwaja Hafiz was to promote feelings of uncertainty, negation of the self, drinking wine, indulgence in luxury and above all inaction. We can derive some logical consequences as under:

1. According to the doctrine of 'Wahdat-ul-Wajud-Unity of Being, the world along with all its components had no existence. Apparently, whatever was perceived, was only an illusion of sights, 'Existence' was only 'One', and He was God. Everything else was 'Naught'.
2. In the world and its contents Man was also included. When the world and all its business was `Naught' and worthless, Man was

also 'Naught'. Therefore, all else except God was 'Naught'. There was no existence of any other thing except God, Therefore, the idea of human Self was wrong.

3. As a result, when human self was 'Naught' like the world and its business, then it was but useless, irrelevant and ridiculous to face the problems of life with the help of firm action and continuous effort. If without any effort something was available, that was well and good. Otherwise, why should one unnecessarily search for food not reserved for him?
4. Again, when the human-self had no separate entity, then there was only one way to become united and associated with God, that Man should abstain from effort and annihilate himself, and then instead of strength, welcome sickness and weakness.
5. In turn, when action and effort was useless, then in the circumstances, it was far better to drink constantly and remain intoxicated and Selfless, and make merry in the company of loved one.

Having observed these negative teachings and their adverse moral effects, Allama Iqbal, as stated earlier, made a frontal attack on Khwaja Hafiz along with Plato and Ibn Arabi and warned the people to avoid his philosophy.

The attack on Plato and Ibn Arabi passed almost unnoticed, for few in India knew them, but the attack on Hafiz roused a storm of protest. People had always thought of him as a great Sufi, and especially venerated him for the superb elegance of his verse.

Allama Iqbal tried his best to pacify his critics by making them understand the background and real message of his Poem : but it did not produce any satisfactory result. Being a peace loving person by nature and very much sincere at heart and also on the affectionate advice of his old father, Allama Iqbal dropped the verses relating to Hafiz from the second edition of : Asrar-i-Khudi, and substituted some other verses under the heading: "The true nature of Poetry and Reform of Islamic Literature".

Allama Iqbal was absolutely right in criticising Hafiz along with Plato and Ibn Arabi. In reply to a query by a close associate Dr. Khalifa Abdul Hakim, the Poet said :

> "My views were the same. I omitted the name of Hafiz expediently, as otherwise, I was afraid, due to this controversy, people might oppose the very aim of the philosophy of Khudi presented by me. If they did not consider Hafiz to be such a poet as I depicted, let them do so. But they must think over my contention so far as literature was concerned."[10] "According to hem:" Hafiz was not a Sufi. One could not be a Sufi by merely using the language and terminologies of 'Tasawwuf', as one could not be a clergyman by merely wearing a 'Cowl'. "[11]

It may be mentioned here that Allama Iqbal was not the first person to criticise the doctrine of 'Wahdat-ul-Wajud'. Before him, Ibn Taimiyah (1263- 1328 AD) wrote a Treatise : "Fi Abtal-i-Wahdat-ul-Wajud"-(Refutation of Pantheism), in which he strongly criticised Ibn Arabi's conception of Tauhid-(Divine Unity) under the name of 'Wahdat-ul-Wajud' and discussed its implications. But perhaps his criticism was a little ahead of it's time and did not attract much attention outside Arabia and Ibn Arabi's ideas continued to spread.

Then Ibn Khaldun (d. 1405 AD), Abu Hajar Askalani (d. 1448 AD), Ibrahim Al Baqayee (d. 1454 AD) also bitterly criticised Ibn Arabi for his special doctrine. Of them, Ibrahim Al Baqayee wrote two treatises on the subject.

In the Indian Sub-Continent, Shaikh Ahmad Sarhindi Mujadded-i-Alfe Thani (d. 1625 AD) also vehemently criticised Ibn Arabi and following the same Sufistic procedure of Mujahida, Muraqaba, Mushahida and Kashf-Endeavour, Meditation, Vision and Beatific Vision established that the last stage of Salik-Devotee in his spiritual journey was not 'Wahdat-ul-Wajud;-Unity of Being. But his last station was : `Abdeyat'-Servanthood. The Maqam-i-Abdeyat -station of Servanthood was an important stage in the path of God or Sufism, where a Salik-Devotee

could realize that he was merely a Servant of God and nothing beyond that. The stage of Union with and absorption in God felt by the devotee under the influence of 'Wahdat-ul-Wajud' was not a permanent state. It was merely a Shuhud-appearance.

According to Mujadded, the Salik's experience of 'Wahdat-ul-Wajud' was only an appearance. It appeared to be so, but it was not really so. It was merely a Shuhud-appearance or seeming. So, 'Wahdat-ul-Shuhud' or Tauhid-i-Shuhudi may be called : 'Apparentism'. At the last stage i.e. Maqam-i-Abdeyat, it became clearly evident that the servant was a servant and God was God. It might be called : Theory of Abdeyat. 'Wahadt-ul-Shuhud' could not be termed a theory, although some suggested it was so.[12]

Now, while presenting the unique philosophy of Khudi, Allama Iqbal has been deeply influenced by the theory of Abdeyat presented by Shaikh Ahmad Sarhindi Mujadded-i-Alfe Thani. Allama Iqbal never likes to be absorbed in God through the process of Fana-annihilation in disregard of his self, and never agrees to accept the glory of God-hood beyond the station of Abdeyat-servanthood.

I have discussed the doctrine of Khudi at length in my previous writings; and therefore, I will not go into details here.

Under the influence of the doctrine: 'Wahdat-ul-Wajud'-Unity of Being' the Sufis having denied the existence of the Universe, were in a sense denying their own existence. In their view the end of 'Man' is to be lost in the Universal life. Allama Iqbal agrees with them, but to the extent that the Universe with all its contents is `Naught'. But he is totally opposed to them on the idea that along with the existence of the Universe, the existence of 'Man' also is 'Naught'.

We may provide an answer to the question : What were the views held by Allama Iqbal himself regarding 'Tauhid'- Divine Unity?

The answer is : It becomes evident from his very opposition to the doctrine of 'Wahdat-ul-Wajud', that according to him the question of Wahdat and Kathrat-Unity and Plurality does not arise at all in this

respect. In other words : It is not a fact that Kathrat-Plurality is opposed to Wahdat- Unity, and therefore, unless the Kathrat-Plurality is abolished, true unity can not be established.

Therefore, according to Allama Iqbal, the thing which is opposed to Wahdat-Unity is not Kathrat-Plurality, but `Shirk'-Polytheism, As stated in the holy Quran :

Say : "I am but a man like yourselves (but) the inspiration has come to me, that your God is one God : Whoever expects to meet his Lord, let him work righteousness, and, worship of his Lord, admit no one as partner".[13]

This may be called the Quranic Tauhid, which is emphatically declared in the Kalma-i-Tayyab; 'La Ilaha Illallah' as well, bearing the meaning: There is no God except Allah.

In fact, this is the most simple and real Quranic Tauhid in Islam. For the purpose, there is no necessity of abolishing the existence of the Kathrat or plurality of the Universe. To put the same idea in Allama Iqbal's own words:

"The spirit of Islam is 'Tauhid' - Divine Unity, and its opposite is not Kathrat-Plurality, but 'Shirk'-Polytheism". [14]

If man understands the correct meaning of the Quranic 'Tauhid', his dignity in Iqbal's view is enhanced so much so that except one God, he should not have the fear of anything else. After having denied the world and everything else in it by the sword of 'La Ilaha-there is no God, he absolutely becomes free from the service of everything except the service of God.

God is the Creator of Man and the Universe. He created both with the command: 'Kun Fa Yakun'-'Be, and it was'. Between the Commander and the 'Thing', which comes into being due to the divine command, and between the Creator and the Creature there is complete repugnance. The Commander from His act of commandment and the Creator from His act of Creation is excluded, as Allama Iqbal says in

'Javid Nama': The Commander and the Creator is excluded from Commandment and Creation".

In the matter of 'Tauhid'- Divine Unity, Allama Iqbal believed in the Sufistic proposition : "Hama Azust"-all is from Him, which is very much close to the Salik's state of 'Wahdat-ul-Shuhud' or 'Tauhid-i-Shuhudi', culminating in the theory of : "Abdeyat", confirmed by Shaikh Ahmad Sarhindi and maintained by all other Sufis with comparatively milder views.

Allama Iqbal does not believe in the other prevalent Sufistic proposition : "Hama wost"- all is He, which is completely identical with the conception of 'Wahdat-ul-Wajud' or Tauhid-i-Wajudi propagated by Ibn Arabi.

According to the former view, life can be treated as individual instead of Universal. This view is best suited to Allama Iqbal's philosophy of Khudi- Self, and therefore, he believed in it, as it was his firm conviction that : "All life is individual; there is no such thing as Universal life. God Himself is an individual but He is the most unique individual".

In the holy Quran it is said that " "I have not created the Jinn and Man, but for worshipping me". Accordingly, it is evident that the aim of creating 'Man' in fact is the service of God. Therefore, the relation of Man with God is that of servicehood. Man is the worshipper- Abed, and God is One Who is worshipped (Mabud), and a worshipper always becomes dependent on One Who is worshipped; and Man is proud of that dependence and relationship. It is called : Maqam-i-Bandigi-Station of servicehood, as Allama Iqbal says : Maqam-i-Bandigi De Kar Na Lun Shan-i-Khudawandi; meaning : I will not accept even I am given Godhood, leaving the position of servicehood.

Man is an humble servant of God, who bestowed upon him His unlimited bounties and mercies; none of the other creatures has been given such a dignity and greatness. God sent Man to the earth

as His vicegerent with freedom of will to act according to his own choice- a vital element for maintaining his dignity.

The holy Quran says " "And we subdued for thyself all which is in the heavens and on the earth, all of them ." [15] For him indeed was all creation made. Again the holy Quran says :

"It is He Who created for you all that on earth". In other words, as.if whole of the Universe has been created only for the service of Man. But Man himself has not been created for the service of any other thing except God. The sole aim and object of his creation is only the service of God. Allama Iqbal pointing to this says :

> "All the earthly and heavenly, formidable and useful Beings, which you have been uptill now considering as ones who should be worshipped, all of them and all other things, have been created for your service. This highest position of 'Tauhid'-Divine Unity, which imparts independence and real knowledge of the human self, is not found in other Divine books except the holy Quran". [16]

What else can be the better for the honour, dignity, and greatness of the human self than the fact that when Man becomes the servant of God, the whole Universe becomes obedient and submissible to him?

Inspite of being an ardent exponent of the philosophy of Khudi-Self, Allama Iqbal was not a materialist. He was rather a strong supporter of spiritualism, as he expressly says in a letter :

"I am a Muslim, and by the grace of Allah, I shall die as a Muslim. In my opinion, the material interpretation of the history of humanity is absolutely wrong. I am the supporter of the spiritualism; but of the Quranic viewpoint, which I have explained at length in my writings here and there."[17]

Allama Iqbal does not teach renunciation of the world. But on the contrary, he pleads for making both material and spiritual life harmonious according to the real teachings of Islam. In the holy

Quran, where the life of the world has been termed as 'Mataul Ghurur'- effects of vanity, in the holy Tradition, it has been stated that: 'Al-Dunia Mazra atul Akherat'-the world is the practical field of the world hereafter. Renunciation of the world is therefore : 'Rahbaneyat'- Asceticism or Monkery, which has no sanction in Islam : 'La Rahbaneyata Fil Islam'- there is no Monkery in Islam.

The world itself is nothing : but it should be utilised as a means of attaining the highest object of the eternal life. The world is merely a station on the highway of the spiritual journey. Therefore, what always should be kept in mind is : How to achieve the futurity. It is not advisable to be lost in the glamour, attractions, fascinations and enchantments of the temporary life in this world. Man is like a traveller in the world. If he is lost in the midway, it is difficult for him to reach his destination- the world hereafter. In the words of Allama Iqbal :

> "In short, whether there be a dominion or lordship or anything else, they are not for themselves any object, but they are the means of attaining highest object.
>
> He who considers them as an object for himself, comes under the verdict ofb the holy Quran that : 'They have been contended with the worldly life'. No act of a Mulsim should be other than that, object of which is upholding the world of God". [18]

Allama Iqbal was gifted with a rare kind of Poetic genius combined with an extraordinary metaphysical vision and also with a deep insight into the Quranic teachings. He undertook a gigantic venture to demolish totally a well established system of thought- 'Wahdat-ul-Wajud', originating from the Pantheistic Philosophy-a system practised so widely, with a sense of supreme gain for a few centuries. His boldness is illustrated by the nature of his criticism of both Plato and Ibn Arabi and his attack on Hafiz, the most popular of the Persian Poets.

None before Allama Iqbal excepting Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun, Abu Hajar Askalani, Ibrahim Baquayee and Shaikh Ahmad Sarhindi had

tackled the issue so frontally. Shaikh Ahmad Sarhindi was the only one to make any appreciable dent in the matter.

He had been successful in proving the theory of: 'Wahdat-ul-Wajud' to be an illusion and a very temporary reality, and he put forward the theory of : 'Abdeyat'-Servanthood, where God and Man were shown as individual entities.

Allama Iqbal, to my mind, picked up the thread from this theory of : 'Abdeyat' from Shaikh Ahmad Sarhindi, and built up the whole edifice of his unique philosophy of Khudi with a much more comprehensive metaphysical vision, which is gaining ground and popularity day by day among the people of the world. It is true, Allama Iqbal nowhere expressly said so. But we know, he had profound regard for Shaikh Ahmad Sarhindi. He visited his tomb at Sarhind several time to pay homage.

Allama Iqbal, of course, has acknowledged with all humility that he was inspired by Maulana Jalaluddin Rumi and treated him as Pir and Murshed- Teacher and Guide at every step of his spiritual journey. But general readers of the Mathnavi-the famous epic poem of Rumi, find very little similarity between the two.

Maulana Rumi was basically a Pantheist believing in 'Tauhid-i-Wajudi' of Ibn Arabi. He wrote his poem under the complete influence of that prevalent powerful philosophy just like other contemporary poets. Only some glimpses of the ideas of Khudi are discernible here and there, and that also indirectly. A great poetic genius like Rumi, could not altogether ignore the reality of life inherent in the philosophy of 'Khudi'.

The philosophy of 'Khudi' is particularly addressed to the Muslims of the world-both as 'Individuals' and as a community. But since it deals with the metaphysical aspect of Man with a strong Universal appeal, it is equally valid for all other individuals and communities, and we believe it is destined to retain its validity in the future.

FOOT NOTES

		Page
1.	Al-Quran	17:70
2.	Asar-i-Iqbal- Compiled by Ghulam Dastgir Rashid, Haidarabad Deccan, Second Edition-1946	66
3.	Tarikh-i-Tasawwuf-Dar-Islam (in Persian)-Dr. Qasem Ghani-Tehran-1322 A. H.	105-107
4.	Tarikh-i-Tasawwuf-i-Islam - Mustafa Halimi Pasha-urdu Translation-Rayees Ahmad Jafri-Lahore-1950 A. D.	307
5.	Nazria-i-Tauhid- Dr. Burhan Ahmad Faruqi-Lahore-1947 A. D.	88
6.	Ibid	86-87
7.	Introduction to Asrar-i-Khudi included in Mazamin-i-Iqbal Compiled by Tasaddaq hussain taj, Haidarabad Deccan-First Edition-1362 A. H.	50
8.	Makatib-i-Iqbal, Part I- Compiled by Shaikh Ataullah M. A. -Lahore	53-54
9.	Ibid	44
10.	Urdu-iqbal Number, New Delhi- October, 1938-Article by Dr. Khalifa Abdul Hakim	824
11.	Malfuzat-i-Iqbal- Compiled by Mahmud Nizami First Edition	228
12.	Nazria-i-Tauhid - Dr. Burhan Ahmad Faruqi-Lahor-1947 A. D.	89-90
13.	Al-Quran	18:110
14.	Malfuzat-i-Iqbal - Compiled by Mhmud Nizami First Edition	107
15.	Al-Quran	45:12
16.	Malfuzat-i-Iqbal - Compiled by Mhmud Nizami First Edition	50
17.	Mukatib-i-Iqbal, Part II - Compiled by Saikh Ataullah M. A.- Lahare	319
18.	Ibid	61

ISLAM AND MODERN WORLD*

ADVOCATE MUJIBUR RAHMAN

To properly evaluate and appreciate Islam, its distinctions from other religions are required to be briefly discussed.

Islam is not a religion in the conventional sense of the term. All other religions define and establish a private relationship between an individual and the Creator. Those religions as such, prescribe rites and rituals for that limited and private purpose. So the questions of sovereignty or of any code of life in relation to social, political and economic relations of mankind have got no relevance in respect of those religions. Those religions rather clearly stand for asceticism. Hinduism encourages renunciation of this world through its religious philosophy based on Rigveda. The doctrine of Transmigration encouraged the thought that the full release from the round of birth and death (Samsara) could be achieved only by giving up the worldly life. Asceticism is put forward by four ashramas. Buddhism and Jainism the two offshoots of Hinduism equally welcome the concept of asceticism.

Let us consider Christianity which not only makes a watertight compartment between the temporal and the spiritual, rather it condemns and forsakes the wordly life in clear terms. Jesus Christ said "render to Caesar the things that are Caesar's and unto God, the things that are God's[1]. Christianity abandones this worldly life : "My kingdom is not of this world," said Jesus.[2] So the Christians became very busy during its early centuries, for kingdom `of the' heaven. Consequently they liked relinquishment of the activities of this world and encouraged Monasticism, though Allah's kingdom requires firmness, courage, resistance, law and discipline to establish and

---

* This Paper was read out on November 9, 1992 at Hotel Sundarban on the occasion of the 115th birth anniversary of Allama Iqbal.

enforce truth and justice. Evasion from society and worldly affairs amounts to escapism, from reality. Islam, on the otherhand, disapproves Monasticism, Asceticism and Celibacy, Al-Quran, therefore,warned, referring to the followers of Jesus Christ that, which they invented for themselves was not prescribed by Allah for them.[3] The separation of the Worldly life from the spiritual was further encouraged by Christianity's propagation of the Doctrine of the Trinity and the vicarious atonement of mankind's sin by Jesus Christ (PH.). These doctrines nullify all moral values of christianity so far as temporal matters are concerned.

But since Renaissance (15th century) Europe took up diametrically an opposite turn from Religionism and Monasticism to unmixed worldly mindedness and materialism. Machiavelli (1469-1527) said to be the father of modern politics in Europe, divorced ethics from politics altogether. Consequently religion and worldly affairs have been moving on distinct ways in the west. God having created man did not allow him to adopt a way of life for him according to his sweet will. Rather God as the creator knows man's correct requirements He, accordingly prescribed a system of life for him. Man, when regulates his affairs of life according to shariah as His Vice gerent he is the best of the creation. But left alone beyond the divine code, he is worse than even the other lower species of creation.

ISLAM IS A COMPLETE CODE OF LIFE

Islam defines the relationship between man and the Creator, between a man and a man, and between mankind on the one side and the rest of the creation on the other. Islam encompasses all spheres of life : Individual, social, political, economic, national and international. In other words, it covers the gamut of life as a whole. Over and above, there is no division between the material and spiritual aspects of life in Islam. Every sphere of life, unlike in the west, is blended into one legal system, Shariah of Islam. The divine system

of revelation, chronologically through innumerable prophets, was perfected with last of the prophets, Muhammad (PH.).[4]

For guidance of mankind nothing has been omitted in Al-Quran.[5] Nothing has been neglected in the Book. So Islam takes life in its entirety. It also strikes a balance among all aspects of life and establishes an equilibrium between temporal life and the life hereafter, according to the design of the Sovereign, the Creator. There is, therefore, no scope for any authority to formulate any law in contravention of the principles of Al-Quran.

Islam is the only system of life which has subordinated Government, law and justice to moral values. Islam as such guaranteed the integrity, purity and impartiality both in the matters of general administration and dispensation of justice. In Islam, ruler and the ruled are equally governed under the sovereignty of Allah. Even the prophet was not an exception. As such, Islam as a complete code of life, establishes justice in all spheres of life and thereby creates a balanced society from all stand stand-Points points of view.

Lammens S.J., an eminent orientalist rightly observes." 'Shariah, the Quranic law imposes on a Muslim an obligation in his triple capacity of a believer, of a man and citizen of an Islamic state. Shariah regulates his religious, political and social life reserving to itself the right to superintendent its multiple manifestation and to direct its complicated rhythm.[6]

According to Professor Hitti : "In the Mslim mind religious law (shariah) secular law and theology were mixed inextricably. Religious law (Shariah) was an integral part of the word of Allah. It co-existed with Him. The Shariah according to traditional view, is eternal, universal, perfect and fit for all men at all times in all places. It preceded the state and the society. It recognizes no difference between the state and the society. It recognizes no difference between the sacred and the secular. It sets forth and regulates man's relations with and obligations to Allah as well as his relations with his fellowman. Of the roughly six

thousands verses in the Quran some two thousand are strictly legislative. They are mostly embraced in suras ; Baqara and Nissa.[7]

J. Schacht equally appreciates the wider and all comprehensive character of Shariah. He says, 'Ilm-al-fiqh, 'the science of Islamic law' is concerned with much wider area than that which is strictly juridical in the western sense of the term.[8] 'Islam', as Schacht puts it', is a religion of action rather than of belief a alone.[9] Hence theology in the Christian sense could not be conceived of in Islam. According to Keith Callard, Associate Professor of Political Science, Mc Gill University : In the Context of 2000 years of Christian experience and 1600 years of co-existence of Church and State as separate entities, it is difficult for the West to understand a Muslim when he talks of the Sovereignty of God' 'ideological state' and an 'Islamic Republic'. Early Christians had no opportunity to run a civil Government. But the Prophet and the early Caliphs had. There was no dual authority in Medina. There was no Church apart from the state.[10]

BROTHERHOOD IS AN INTEGRAL PART OF ISLAM

Of All the religions of the world, Islam is the first, foremost and the only religion that along with the declaration of oneness of Allah (Towhid) it declares the unity of mankind, wherefrom emanates the concept of equality which is the foundation of brotherhood of men, Al-Quran declares : "Verily this brotherhood of yours is a single brotherhood and I am your Lord and Cherisher, therefore, serve Me (and no other)." Al-Quran unambiguously mentions the sources of equality and brotherhood of men: "O mankind! we created you from a single (pair) male and female and made you into nations and tribes, that you may know each other (not that you may despise each other). Verily most honoured of you in the site of Allah is (he who is) the most righteous of you and Allah has full knowledge and is well acquainted (with all things).[12] Al-Quran further declares that Allah created mankind from a single person, created, of like nature, his mate, from them twain scattered (like seeds) countless men and women.[13]

Fraternity of believers has been declared : "Believers are but a single brotherhood. Reconciliation has been enjoined between the two contending brothers.[14] Allah commands the Muslim Ummah to remain united in the following terms : "And hold fast, all together, by the rope which Allah (stretches out for you) and be not divided among yourselves, and remember with gratitude Allah's favour on you, for you were enemies and he joined your hearts in love and you were on the brink of the Pit of Fire, and He saved you from it. Thus doth Allah make His signs clear to you : that you may be guided.[15] Prophet (PH) in his famous farewell address said that there is no superiority of an Arab over a non-Arab and vice versa. Mankind is the progeny of Adam who was fashioned out of clay. He further declared that every claim of privilege whether that of blood or property was under his heels. The prophet (PH), in fact, did not consider, even himself, to be above the law. Al-Quran makes it clear that he is a man like others, except that revelations come to him and he did never claim any distinction in his social behaviour.[16] He also sought to establish this by his own acts and precepts. He himself appeared in several suits filed against him.[17] He established the important constitutional principle that the head of the Islamic State could be sued both as a private individual and also in respect of his public duties. He permitted a complainant to nudge him when the latter stated that the Prophet (PH) had done the same to him, on one occasion, During the Sermon of Hujjatul Wida he testified to his love for justice and equality when he publicly declared to the congregation that any one having any claim against him should make it, so that he might satisfy the same. Islam does not approve of the idea : King can do no wrong. Islamic brotherhood is based on such perfect principles.

The prophet of Islam emphasised the importance and significance of brotherhood in different ways with practical examples. He said inter alia :- Love for each other in the rank and file of the Muslim Ummah is indispensable to become a Mumin in the real sense of the term : 'La-Tumenuna hatta tahabbu. `Holy Prophet said : Seven categories of people will enjoy divine shade on the day of Judgment when there

shall be no other shade. One of those categories is : Two persons who love each other for the sake of Allah. To encourage a genuine brotherhood it has been emphasised that one can not be a Mumin unless he likes that for the brother which he likes for himself. The integrity of the Ummah has been compared with a human body : the entire Muslim society is considered as one body and if any one part becomes diseased the other parts shall feel the agony. The Muslim Ummah was also compared by the Prophet with a building. Each member of the Ummah is closely connected with other members as a source of a strength as each brick is the source of strength for other bricks. The Prophet having put the fingers of his one hand into the fingers of his other hand demonstrated the strength of unity. The history of love and sacrifice for the sake of Islamic brotherhood among the Muslims is an unparallel one. The Mujahedeen in the field of Jihad were extremely in need of drinking water, but every one was anxious to sacrifice for giving preference to other brother. The water carrier approached them one after another but each one refused to drink in preference to other brothers. Eventually each of the Mujahedeen expired without any water. Love and sacrifice of the Ansars of Medina for the Muhajeeen from Mekka are the proverbial instances of brotherhood (Ukhuwwa) in human history.

The purpose of the Unity and Brotherhood in Islam is not for the personnel aggrandisement of individual member of the Ummah, nor for any immoral venture, rather the philosophy behind the unity and brotherhood of the Ummah is implementation of divine scheme of Allah as envisaged in Al-Quran-A Complete Code of Life. Mankind has been created as His Vicegerent on this planet for this purpose. The Muslim Ummah has been specially commissioned by Him to prevail upon entire mankind to enjoin to do what is good and to stop what is forbidden. A Muslim, as per Islamic injunction makes friends for Allah's sake and also enemies for His sake.

On the teachings of Al-Quran and the guidance of the Prophet (s) the spirit of Islamic brotherhood developed, during the early days of

Islam, to such an extent that it accelerated the unique success of Islamic movement and consequently the establishment of an Islamic state at Medina based on the principles of Al-Quran. Due to the integrated brotherhood of the Ummah the conquests of two mighty empires : Paersia and the Byzantine (the Wastern Roman Empire) were made possible. The Muslim Ummah within a century of the Prophet's death conquered half of the known world covering important regions of three continents : Asia, Africa and Europe.

Unfortunately with the slackening of the tie of brotherhood, and dislodgement of he Muslim Ummah from the teachings of Al-Quran, decadence set in Islamic Ummah which resulted factional conflict and fratricidal frictions.

Consequently a secterian and regional patriotism came to prominence which ultimately took the shape of Geographical Nationalism. Taking the advantage of departure from the teachings of Islam and disunity of Muslim Ummah, the imperialistic powers from the European countries penetrated into the heart of the Muslim World. Philip K. Hitti mentions that the invasion of Egypt by Napoleon (1791-1801) and the occupation of Algeria (1910) and Tunisia (1881) by France made it clear that the European powers were superior to the Muslims in military affairs. In 1882 the British occupied Egypt, the largest and most important Arab Land.[18] European powers since the 18th Century (AD) occupied other countries of the globe including Indian subcontinent where Muslims were in power.

BINDING FORCE OF SHARIAH IN ITS ENTIRETY

Since Islam is a complete, an indivisible and integrated code of life, so its acceptance must be in its entirety.,.........[19]. Acceptance of Islam in part, rejection in part and adoption a course midway are considered as acts of unbelievers (Kafir) and humiliating punishment is prescribed for them.[20] A partial acceptance of Islamic code and its implementation, instead of yielding any good result, leads the

Muslims to disgrace in this life and to grevious penalty on the Day of Judgement[21]. History bears testimony to the fact that the Muslim World, so long was clinging to the teachings of Al-Quran in the complete sense of the term, it attained the most distinguished position in all fields of life of which there was no parallel, world over.

Islam was born at Mecca and developed at Medina. Cause of debacle of Muslim world was divorcement from the teachings of Al-Quran and its spirit. Despite the immense material progress, decadense started at Damascus. Baghdad succumbed to the first stroke of Halagu Khan's invasion. Though Damascus, Baghdad, Cordova, Delhi and Istanbul fell down but it was not the fall of Islam.

Due to the sad plight the Muslim Ummah lost even the consciousness that they had a glorious past and a great heritage.

RENAISSANCE

The divine basis of Islam is Al-Quran. Allah certifies that Al-Quran is a revelation from Him and He ensurs its preservation. Because of the extraordinary merit of Islam as a complete code of life, it is indispensable for all time to come for the benefit of mankind. However, Islam with the passage of time survived the Crusades and Mongol invasions from outside and the anti-Islamic effect of sufism (Islamic mysticism) from within.

A galaxy of distinguished intellectuals: Al-Ghazzali (1058-1111 AD), Mohammad Jalal-Ud-Din Rumi (1207-1273 AD), Imam Ibn-I-Taimiyya (1263-1328 AD), Ibn-I-Khaldun (1332-1406 AD), Shaykh Ahmad Sirhindi (Mujaddid-I-Alf-I-Thani) (1564-1624 AD), Shah Waliullah of Delhi (1702-1762 AD), and his son Shah Abdul Aziz, Mohammad Ibn Abdul Wahhab (1703-1787AD), Jamal Al-Din Al-Afgani (1839-1897 AD), Sir Syed Ahmed Khan (1817-1898 AD), Mohammad Abduh (1849-1905 AD), Quaid-E-Azam Mohammad Ali Jinnah (1876-1948 AD), Sir Mohammad Iqbal (1877-1938 AD), Abdul Aziz Bin Abdur Rahman Al-Saud (1880-1933 AD), Faisal Ibn Abdul Aziz-(1975 AD),

Imam Khomeini (1901-1989 AD), Sayyid Abul Ala Mawdudi (1903-1979 AD), Hasan Al-Banna (1906-1949 AD) and many other scholars, Statesmen, and Mujahedeen made substantial contributions and sacrifices to make the renaissance movement a success. With the success of Renaissance movement the Muslim World, today, is conscious of its glorious past and the great heritage. Islam, on its own merit is the greatest living force as a system of life which is by far superior to man-made systems to regulate and guide mankind to solve their problems and to develop them as the vicegerent of God on this planet, particularly after the fall of communism and the failure of secular concepts under man made isms.

MODERN WORLD

Term 'modernism' literally means time at present as distinguished from the past and future. From chronological point of view future comes as present which passes into the past. The term has been understood in the Christian World as a relative one. According to Encyclopaedia Britannica, the term is used in Christian World in three different senses: in the Roman Catholic Church it is opposed to papalism, in American protestanism it is opposed to Fundamentalism and in the English Church it is opposed to Traditionalism. The concept of modern period is also marked in the West as the start of the process of Secularization and free thinking on the divorcement of Christian values of medieval period, through renaissance movement (15th century).

Islam, for obvious reasons, does not admit of any dichotomy between the medieval and modern periods, in other words, modern and non-modern times. Allah has created the Universe as a composite whole. Different species therein are inseparably connected with and dependent upon one another. The Creator fassioned man, His vicegerent on this planet, (in due proportion) and breathed into him His spirit.[23] The creator knows man's basic nature (fitrat) and his genuine requirements, Islam is a complete and an integrated code

covering all spheres of life: Social Political, Economic, National and Interantional. Perfectness of Islam as an exhaustive system of life (Din) has been properly prescribed and ensured by divine Wisdom through Muhammad (PH) the last of the Prophets.24

Since Islam covers the gamut of life as a whole, since it can meet the challenge of time and solve squarely all human problems, despite the change of time and circumstances, and in case of new situation through the process of Ijtihad, Islam, as such, does not admit of any dichotomy nor any fragmentation of time between modern or non-modern. Be that as it may, let us take the term 'modern' in the literal sense of the term: the time we are passing or recent time.

Man having shun the latest, divine and perfected code of life Islam which is congenial and skin to his nature, took recourse to man-made isms one after another, though each one had to be either abandoned after short experiment or the isms died sure death due to inherent defects in them.

The most remarkable event of modern history is the fall of communism. The tug of cold war between Capitalism and Communism is terminated to a great extent by now. The western world has taken recourse to a slogan : 'New World Order'.

New World Order

President Bush came forward with this rhetoric expression 'New World Order' at a time when Iraq seized Kuwait in August, 1990, with a purpose to draw the attention of other countries for co-operation to face and undo the aggression by Saddam Hussein. But according to Alan K. Henrikson Director, The Fletcher Round Table on a New World Order, in an Essay ' How can the Vision of a New World order be realised? says: Bush had contemplated as back as in 1989 the proposed New Order on the occasion of his thanks giving to the American people before he met Soviet president Mikhail Gorbachev off the coast of Malta (the salt water summit) when he said "We can

now dare to imagine a New World.[25] On September 11, 1990 while Military Coalition was being formed under the U S leadership and the Security Council Auspices, Bush went to the Congress and outlined a larger Vision, apart from the programme of withdrawal of Iraqi force from Kuwait, restoring the legitimate Kuwait Government securing and stabilizing the Gulf area and protecting the lives of American citizens, he went to espouse a further, broader, and a higher goal when he said: a new world order can emerge a new era-freer from threat of terror, stronger in pursuit of justice, and more secure in the quest for peace, an era in which the nations of the world, East and West, North and South can prosper and live in harmony.[26] United States, as a victorious power after collapse of Soviet Russia and in Gulf Crisis, projceted its global vision for international politics. New World Order is the slogan for this vision. What are the values that may be represented by this vision? Lawrence Freedman, Professor of War Studies, King College London, in his Essay 'Order and Disorder in the New World' says that this slogan is supposed to mean the triumph of liberalism and free markets, the rule of international law and era of peace and prosperity.[27] The values contemplated by president Bush and the West boil down mainly to Human Rights, secular democracy and free market economy.

The western world experimented Human Rughts (secular) democracy and free market economy. Let us examine and compare these issues as they functioned as distinguished from Islamic concept of these issues and their functioning within the framework of Islam.

CONCEPTS OF HUMAN RIGHTS : SECULAR AND ISLAMIC

The Universal Declaration of Human Rights was made by the General Assembly of the UNO in 1948. Islam had declared human rights about 1400 years ago with a wider dimension and deeper significance. Specific provisions in Al-Quran, the Famous Fare Well Address of the Prophet (SM) and his practices (Sunnah) define and guarantee human rights: (a) Human dignity (b) Right to liberty (c) Equality of men

(d) Right to life and Right to property (e) Economic Democracy for equitable distribution of wealth (f) political Democracy under the sovereignty of Allah (g) Status of women including many other rights even beyond the list of 30 articles, declared by the General Assembly of the UNO. Islam not only prescribed human rights but also practically implemented them in letter and spirit. Islam ensured the rights against any violation, within the framework and scheme of Islam itself.

Human rights are considered sacred within the scheme of the divine code Al-Quran, so the rights, as religious obligations, are to be compulsorily safe-guarded as good deeds. Al-Quran casts a duty upon the Muslims to enjoin good deeds and to forbid evil ones. So any infringement against human rights warrants the interference and oppositions by the entire society. Islam, on the concept of sovereignty of God, fundamentally differs from other religions and man-made isms. Since human rights have been prescribed by Him, no human authority, be he a dictator or even a democratically elected representative of the people, has any locustandi to violate those rights. Islam not only prescribes punishments for violation of human rights in this world but also makes it accountable to God in the life hereafter and as such the protection of human rights in Islam is doubly ensured.

The idea that the West is the innovator of human rights is the results of ignorance of history and absence of knowledge about Islam. Human rights declared by the UNO are aimed entirely at the material needs of man where as Human rights within the framework of Islam, apart from material aspect, cover moral and spiritual spheres of life. Human rights declared by the UNO have been very often violated throughout the world. No mandatory provision has been made to guarantee them against violation. Virtually the member countries are free to deal in a way they like with regard to human rights. Veto power vested in the big powers has virtually taken away the right of impartial and undisturbed functioning of the Security Council. This power also

has set at naught the principle of equality of all as provided in the declared list of human rights. The maintenance of world peace depends on solution of international problems. Experience shows that 'Veto' has thwarted the solution of world problems, particularly when the interests of the big powers are involved. Lot of burning problems are bypassed, Kashmir issue, though cognizance was taken long four decades ago, has been put into a cold storage, over and above, human rights are being violated there in an inhuman magnitude. Palestine issue also stands undecided. The ruthless killings of the Muslims and indiscriminate raping on woman of Bosnia-Herzegovina do not attract the immediate attention of the World powers and the UNO authorities are rather reluctant to move in these highly momentous and urgent issues to stop the carnage. But in case of issues of lesser importance with minimum merit, the world bodies feel anxious for instantaneous cognizance and quick action particularly when their own interest is involved. Is it not sufficient a warning for the Muslim countries to sink their differences and to think and act unitedly?

Despite amazing success of science and techonology moral crisis is the basic cause of debacle for mankind today. Ethical values alone in individual, social, national and international spheres can salvage the chaotic world. Activities bereft of moral foundation cannot establish justice and fair play which alone can ensure world peace. It is a fact of history that under Islam alone, human rights and dignity of man were squarely preserved and the concept of a free man in a free society was materialized. Iqbal in The Reconstruction of Religious shought in Islm points out............."Humanity needs, three things today' spiritual interpretation of the universe, spiritual emancipation of the individual, and basic principles of a universal import directing the evolution of human society on a spiritual basis". The slogans: (a) Human Rights (b) Human Dignity (c) New World Order (d) World peace etc. are bound to be frustrated if moral values are not ensured. A radical amendment of the UNO Charter and the list of Human Rights, on the experience of the last four decaes, should be made to make the

slogans more meaningful and to ensure impartial and quick implementation of its programmes A vigorous and a detailed Moral Uplift programme is urgently required to be inserted by the UNO to bring about an ethical change in human conduct. Each member country should be put under obligations to pursue the programme. A separate wing such as Moral Uplift Programme (MUP) should be opened with a working scheme to encourage and boost up the ethical standard of mankind.

HUMAN RIGHTS IN SAUDI ARABIA

Since 1932, constitution of Saudi Arabia is Al-Quran, which is the first innovator and guarantor of Human Rights in the real sense of the term. Let us, therefore, most relevantly examine and assess the success of Human Rights in Saudi Arabia.

This question agitated the mind of the western lurists during the seventh decade of the current century as to how far Human Rights were available in Islam and how far these were protected by rule of law in Saudi Arabia, Where Al-Quran is the constitution and Islamic values with regards to human rights are said to be followed and practised.

Through the channel of the Saudi Embassy in Paris, eminent jurists and intellectuals of Europe had expressed their desire to meet Muslim scholars in the Saudi Kingdom, in order to seek a thorough understanding of the concepts of human rights in Islam and its implementation in Saudi Arabia. In response to this desire, the Ministry of Justice, under the presidency of the then minister, His Eminence Sheik Muhammad Al-Harkan organised a three session conference, which was convened in Riyad beginning on March 23, 1972 Safar 1392 A. H. The Saudi delegates to the conference were led by His Eminence the Minister of Justice, Sheikh Muhammad Al-Harkan. The European Commission of Jurists was composed of:

ক) His Excellency Mr. Sean Mac Bride, Professor at the University of Dublin, Former foreign Minister of the Irish Republic, former president

of the Council of Europe, and former General Secretary of the International Commission of Jurists. (Leader).

(b) Mr. Karel Vasak, Professor of Public Law at the University of Besancon, Director of the Section of Human Rights in the Council of Europe, Director of the Revue Internationale des Droit de L'Home.

c) Mr. Henri Laoust, Professor of Islamics and Muslim Civilization at the College de France.

d) Maitre Jean-Louis Aujol, General Secretary of the association of Franco-Saudi Friendship in France, one of the prominent attorneys at the Court of Appeal of Paris, who first suggested the organization of the conference. Conferences weres held at Riyad, Paris, Vatican City, Geneva, and Strasbourg. The European Commission of Jurists during the deliberations proceeded through questions to be answered by the Saudi Delegates. Having examined the issues relating to Human Rights envisaged by Islam and having been satisfied on personal experience on the spot, His Excellency Mac Bride declared that they have been deeply impressed by all that they had heard, concerning Muslim Doctrine and Human Rights in Islam. He observed : "It is here, in this Moslem country, that Human Rights should be proclaimed, no where else. To Moslem canonists belongs the task to enlighten the world on these things, as it is sheer ignorance which has led the enemies of Islam and Moslems to attack and blemish the name of Islam. Moslems, and Islamic government."

The president of the European Commission urgently demanded that these important answers be written down and handed to the members of the European Commission, so as to constitute a document which they, in turn, would use to defend Islam and explain its realities.

One of his collegues congratulated this young state, on the admirable manner in which Human Rights were, through Islam, upheld and protected in the Kingdom. In the end, he said;" As a Christian, I declare that here, in this Moslem country, God is revered in

all truth." He professed his agreement with Moslem canonists in asserting that, after what he had heard, and actually seen, he held; Koranic prescriptions on human rights are undoubtedly more meaningful than the Charter of Human Rights.[28]

DEMOCRACY : SECULAR AND ISLAMIC

SECULAR DEMOCRACY

The basic concept of secular democracy is that the sovereignty lies with people and the decision, irrespective of right or wrong, is made by the majority. In effect dictatorship of different forms in political sphere and exploitation and capitalism in economic sphere grew up under the umbrella of western democracy which led to competition for possession of colonies to procure raw-materials and markets for sale of finished goods, which consequently encouraged, imperialism leading to confrontations including to two great wars. Both Mussolini and Hitler entered their respective legislatures with majority of the elected members under the umbrella of democracy and turned to be the worst dictators. Fascism and Nazism led by Mussolini and Hitler respectively prove the justification of this contention.

Now, let us consider western democracy on its own merit. Harold J. Laski and others termed western democracy as capitalistic democracy. British statesman Sir Stafford Cripps in 'Democracy-Up-To-Date' is of the opinion that infact democracy does not exist in any country to make an apprcach to achieve Government of the people, by the people, and for the people, and he further holds the view that the western European countries survive as democracies only in name.[29] Sir Stafford Cripps having analysed modern democracy as a system of Government, says: "To all intents and purposes the British democracy is today accepting the dictatorship of the Prime Minister as a substitute for its own actions. It is not necessary to review the very similar symptoms of democratic Government, which have made themselves apparent all over the world, in some places to a greater and in others to a lesser degree.[30] Professor Laski, in his 'Democracy

in Crisis' refers to Rousseau and observes that there is a vital truth in Rousseau's taunt that electorate is free only at election and that freedom is but the prelude to a new domination. It cannot choose the representative it wants. It can only strike blindly against those at whom it feels a passing indignation. Every political conflict is the battle of two active minorities for the possession of the inert multitude. [31]

England is considered to be the cradle of modern democracy. Prof. Laski observes that one cannot understand the parliamentary system in Great Britain unless one recognizes that, beneath the appearance of democracy, this is the economic and social system it is intended to uphold. It was made by the owners of the instruments of production in the interest of their property; and the safeguarding of their conception of their rights is inherent in all the rulers by which it moves. It has been compelled to confer the franchise upon the masses : it has been careful to maintain for property the substance of effective authority.[32] Prof. Laski further observes that these are not characteristics of Great Britain only; They are universal in capitalist democracies. Same forces are compelling the consolidation of Republican and Democrat in the United States as a part of property seeking to resist the invasion of its hitherto uncontrolled empire. [33]

John Dewey in his article 'Democracy' observes that democracy is now challenged as they never have been before. In some nations they are more than challenged. It is ruthlessly and systematically destroyed. Everywhere there are waves of criticism and doubt as to wether democracy can meet pressing problems of order and security. The main cause of failure of Secular Democracy, according to John Dewey, is that Democracy had not become a part of the bone and blood of the people in daily conduct of life. Democratic forms were limited to parliament elections and combats between the parties and that unless democratic habits of thought and action are part of the fiber of a people, political democracy is insecure. It cannot stand in isolation. It must be buttressed by the presence of democratic methods in all social relations.[34]

Having realised the failure of democracy in the United States of America, Walt Whitman in his Article 'Democratic Vistas' prescribes that to meet the situation in future whole mass of American mentality, taste and belief, should be changed and a new breath of life is to be introduced into national life affecting politics for more than the popular superficial suffrage, accomplishing a religious and moral character beneath the political productive and intellectual bases of the state.[35]

Edward Benes in 'Democracy Today and Tomorrow' says, "Success of Democracy requires integrated society based on equality but he finds European society otherwise.[36] Professor Laski in his article 'The Internal Conditions of Democracy' observed that democracy might endure so long as men felt that they had great ends of life in common and the values they sought to realise were the same values.[37] But instead of pursuit of comon values, secular world suffers from contradictions and conflicts in their ideas, values and ends. Their pursuit is confined to and aimed at achievement of political power and economic interest for personal aggrandizement. So democracy cannot acclimatize in the western society except in Islam where on the foundation of equality and brotherhood of man Muslims are committed to, on the basis of a complete code of life, to strive and go ahead for achievement of the common values and the common ideology prescribed by Al-Quran for the benefit of mankind as a whole.

Allama Iqbal, the philosopher poet having critically examined the concept of modern secular democracy and its practice observed that the sole function of western democracy is to exploit the poor in the interest of the rich.[38] He said in Zarb-E-Kalim : Democracy counts the heads and does not weigh the brain. Iqbal could not reconcile himself to western democracy on the main ground that popularity is its yard stick, though without ability and wisdom a man can be popular. Iqbal gave this message to the west through his 'Gulshan-E-Raz' that satan was let loose through western democracy which is a naked

sword in the hand of the political factions. Iqbal, heard the voice of imperialism in the flute of western democracy in his Khijir-E-Rah. According to him, institutions built upon secular democracy can never be sound, Iqbal pointed out the defects of the narrow concept of dialectical materialism and capitalistic western democracy, and accordingto him class war is the result of western democracy, where as Justice and Unanimity are results of Islamic democracy.[39] He further observed that democracy wås a coat which several European countries discarded after trial and which a number of Asiatic countries have picked up to wear however ill fittings it may be.

Absence of a sound, wise and impartial sovereign, absence of a complete code of life based on moral foundation as a specific guideline, inequality in rank and file of the western socity, absence of any ethical standard and absence of faith in accountability to the Supreme Power are the main reasons for failure of western Democracy.

The Western political Philosophers wanted to graft democracy with the western secular society divided by racism, colourprejudice, difference of Nobles and Commoners, exploiters and exploited, dictators and dictated with the unvoidable results that the values of democracy proved to be totally foreign bodies to the society. The artificial graft had to die a sure death.

It is a fact that the western democracy and communism are incapable of solving together both political and economic problems. The former unsuccessfully tried to emphasise political freedom and the latter only economic interest. A system that cannot squarely solve political and economic problems, creates more problems in both the fields than solving either. According to Bertrand Russell solution of both the problems political and economic, together is indispensable.[40] Ibn Khaldun (1332-1400 AD) father of sociology and the historical Philosopher was the first man to pointedly tell that the importance of economics for the success of politics is a condition Precedent, in his Muquddima (Prolegomena) to his famous Kitab-at Iber.[41]

ISLAM AND POLITICAL DEMOCRACY

Islam is the only alternative to solve both the political and economic problems, perticularly because Islam is a complete and a divine system of life which got perfection through Muhammad (PH) the last of the Prophets and Islam gives solution for all human problems: Political, Social, Economic, National and International. Now let us examine Islamic democracy vis-a-vis secular western democracy. Islamic system of life made a silent revolution and established a real democracy with a surprising impact upon human experience. The credit of this success was the merit of Islam, a complete code of life with sovereignty vested in'Allah.

SOVEREIGNTY OF ALLAH THE CREATOR

Allah is the only absolute and exclusive sovereign, according to the philosophy of Touhid, Who is the Creator and Rabb, who sustains, charishes and develops the universe as well as human species, the best of His creation.[42] Allah is All powerful, All-knowing, Wisest, Gracious and Most Merciful. To Him belongeth the dominion of the Heavens and the Earth and He hath power over all things.[43] In His Hand is the dominion and He hath power over all things Who created death and life so that He may try who is best indeeds and He is the Most Exalted in Might oft Forgiving. [44] The command rests with none but Allah.[45] For Him is the command (it is within His exclusive jurisdiction to pass orders.[46] All affairs are referred back to Him.[47] If there is a difference over any issue, the matter must be referred to Allah and His Apostle.[48] Which means that none can take recourse to any arbitrary and autocratic methods against the directions of Al-Quran and the Sunnah. People as His Vicegerents on this earth are to manage affairs and execute His plan according to His code and there is no scope for any arbitrary role by the ruler. Consultation in affairs is enjoned.[49] For the purpose of consultation from the time of the Prophet (PH) himself, seatings of Majlis-e- Shura were convened

and this practice was followed even during the time of Khulafa-e-Rashedeen, Umar had two Shuras and he was of the opinion that administration without consultation was an impossibility. Al-Shura is an elective body which would be constituted with people having both Taqwa and knowledge. The decision by Al-Shura was considered as Ijma. The juridsdiction of Al-Shura was confined to the areas not covered by shariah since sovereignty lies with Allah. Sharia provided by Him cannot be challenged, though with the change of time and circumstances it can be interpreted through Ijtihad.

Islam not only makes provision for democracy but within the framework of Islam itself, democracy is inherently ingrained and ensured. Islam introduced the democratic system of government, under the sovereignty of Allah in the first quarter of the seventh century A. D. Till then the comcept of democracy in its modern sense was not known to the West.

It may not be out of context here to note even the concept of 'Sovereignty' was unknown to the secular west till before the 16th century and that too was vested in the kings and emperors, According to Harold J.Laski in his 'A Grammar of Politics': French political Philosopher Jean Bodin (1529-1556) was the first thinker who used the term and gave the idea of 'Sovereignty'.[50] But Islam 1000 years prior to the western world had advanced a clear concept of 'Sovereignty' through Al-Quran and under Allah's 'Sovereignty' established a unique human society of which there is no parallel.

If the Sovereignty of the Creator and His divine code of life in the complete sense of the term are accepted, there remains no scope for any one to be either a dictator or an autocrat in Islam, nor any one can take recourse to a free style exercise of power, since the ruler is bound to have an ideological mooring and he has to be guided by the divine code of life, Unlike the secular West, Islam instead of taking democracy as an isolated and a casual venture during election at long intervals, establishes a society which by itself is based on liberty, equality and fraternity : the sheet anchors of democracy. So success

of democracy under Islam is the necessary corollary to Islamic social system itself. The religion revealed to Prophet Muhammad (PH) not only taught the loftiest principles of Liberty, Equality and Fraternity, but also ensured the principles of cultural, political and economic democracies. It was almost twelve centuries before the idea became known in Europe that democracy had been preached and practised by Islam with a unique success. Charis waddy expressed her surprise that though Islam had preached and practised liberty, fraternity and equality, the principles of democracy, long one thousand years before the French Revolution (1789 A.D) but the historians of the west date liberty, fraternity and equality, from the French Revolution without uttering a word about Islam.[51]

Sarojoni Naidu the great poetess of India and once president of All India Congress in one of her speeches in London, referring to Prophet Muhammad (PH), drew the attention of the West: What west dream today was not merely a dream but fulfilled fourteen hundred years ago when the lonely dreamer of the desert was the only true begetter of human democracy. She was quoted by Professor Rama Krishna Rao in his Biography of the prophet (PH), Islam is the first Religion that preached and practised democracy for, in the mosque, when the minerate is sounded, and the worshippers are gathered together, the democracy of Islam is embodied 5 times a day, then the peasant and the king kneel side by side and proclaim God alone is Great,' she continues 'I have been struck over and over again by this invisible unity of Islam that makes a man instinctively a brother'. Professor Rao quoting Professor Hurgonje says : "The League of Nations founded by the Propet of Islam put the principle of International Unity and human brotherhood on such universal foundations as to show candle to other nations. The fact is that no nation of the world can show a parallel to what Islam has done towards the realisation of the idea of League of Nations. The Prophet of Islam brought the reign of democracy in its best form.[52]

The basic reasons behind the success of democracy in Islam are that the concept of sovereignty is vested in God as distinguished from

any particular individual or a party or even mass of people as in the West. Islamic State is a homogeneous organization of Islamic brotherhood, based on a common ideological, social, cultural, political and economic code backed by Supremacy of divine law and independence of Judiciary. Ruler and the ruled are to co-operate in executing the common programme, as prescribed by Al-Quran and Sunnah with a sense of direction. There is as such, no scope for any free style exercise of power, dictatorship, unbridled party politics for usurpation of power and economic exploitation in Islam. Secular democracy, though may be under circumstances more acceptable than autocracy but Islamic democracy on merit and practice is by far preferable to secular democracy.

ISLAM AND ECONOMIC DEMOCRACY

Unlike other religions Islam is a science of life. The economic system of Islam is an integral part of Islam within its own framework. It has its own distinctive values, modus operandi, development and ultimate goals. Abul Ala Mawdudi says "the economic system of Islam has a deep relationship with the political, judicial, legal, cultural and social, system of Islam. And all these branches are fundamentally based on the moral system of Islam. If you do not accept the creed (of Islam), this moral system and the whole of this code of life completely as it is, the economic system of Islam, divorced from its source, cannot be maintained or administered in its purity even for a single day nor will any appreciable advantage accrue from it if you take it out of its wider context and then seek to apply it to your life".[53]

Islam, through the concept of ownership of God and specific economic scheme, not only forbids capitalism and exploitation but also ensures equitable distribution of wealth. Ownership of property, according to Islam, lies with God as political and legal sovereignty lies with Him : to Him belongs what is in the heavens and on earth and all between them and all beneath the soil.[54] The Islamic economic system is based on the concepts of ownership of God and khilafat,

Fraternity and Trusteeship of men. Every thing on this earth is created for mankind.[55] Every thing in the Universe is put under the control of men for their use.[56] According to the scheme of Islam man is the centre of the universe. Islam encourages mankind to explore and exploit the natural resources gifted to them by God to utilise those resources for their purpose. It is enjoined that after prayer is finished men should disperse through the land and seek the Bounty of God.[57]

In a world, around the first quarter of the 7th century A. D. the declaration of rights of the poor in the wealth of the rich was beyond imagination in the context of the then world. But Islam recognized and declared the right of the needy in the wealth and possessions of the rich.[58] Al-Quran declared that men shall be questioned by God as to how far they discharged their duties with regard to their possession and personal selves.[59] Payment of zakat has been enjoined as a duty next to Salat (prayer). Reward has been declared for spending in charity by day and night in secret and in public.[60] It has been made incumbent to spend out of love for Him, for kin, orphans for the needy, the way farer, for those who ask and for ransom to free the slaves.[61]

USURY AND MONOPOLY

The Islamic Economic system prohibits both usury and monopoly which breed capitalism. Usury is the vehicle of exploitation so Islam forbids it and encourages trade.[62] A war is declared from God and the Apostle against usury. The prophet declared : he that monopolises is a wrong doer (Al-Hadith), Under capitalistic system of the West, wealth is circulated among the few rich people. Islam encourages circulation of wealth in society and in consequence, hoarding is also prohibited as a great sin.[64] To ensure circulation of wealth its rotation between the wealthy people alone is forbidden.[65] Islam discourages both niggardliness and extravagance and it strikes a balance between the two.[66] Islam takes another revolutionary stand when Al-Quran

enjoins that assets beyond the need of the rich one is to be distributed among the poor.[67] Islam enjoins men to seek the Home of the Hereafter with the wealth which God has given, but not to forget men's portion in this world and man is enjoined to do good as God has been good to him and not to seek occasion for mischief in the land for God loves not those who do mischief.[68] The needy, who from a sense of prestige and modesty do not openly beg, must be helped.[69] The prophet (PH) of Islam implemented the economic principles of Islam while he headed the Islamic state at Medina. Historian Khuda Bakhsh, with reference to Von Kremer's view says, "In the Quran the Command to pay the poor tax (Zakat) directly follows the command to pray:"perform the prayers and pay the poor tax." This tax had a strong communistic complexion which is evidenced by the following tradition: "The prophet sent Muadh to Yemen and told him: summon the people to accept the offer of faith, namely, there is no God but Allah and that I am His prophet; if they listen to it, teach them further that God has ordained five daily prayers; If they are also agreeable to this, teach them further that God has enjoined the poor tax (zakat) payable by the wealthy upon their property for distribution among the poor.[70] Khulafa-e-Rashedeen similarly established economic democracy envisaged by Islam, Umar, the second Caliph declared that he would have to answer the question from God even if a kid died of starvation in the furthest corner of Forat, that is within Islamic State. None can be considered as a Mumin if he eats and goes to sleep while his neighbour remains hungry (Al-Hadith).

The success of the economic system of Islam advanced, during the khilafat of Umar Ibn Abdul Aziz, to such an extent that there were no poor available to receive Zakat and charity. The unique success achieved by Islam fourteen hundred years ago could not be even conceived of by the modern world. The Universal Declaration of Human Rights, particularly Article 17 only provides a right to own property and not to be arbitrarily depreived of it. No concept of the restriction of Capitalistic exploitation nor provision for distribution of wealth to the needy is provided there.

Maryam Jameelah commenting on Westerm Democracy: says that political democracy means the decision by the majority, regardless of its soundness and wisdom. She further observes that in the economic democracy of the West, exploitation of the weaker by the richer is the system, Economic imperialism continues unabated.[71]

Man-made system can never yield an ideal result, Sir Winston Churchill, on being questioned, during an election campaign, as to his opinion on comparative study of Capitalism and Communism, said : in Capitalism there is an unequal disribution of assets and in Communism there is equal distribution of poverty and miseries. In the background of a long experiment and failure of secular democracy in the West, the question of repetition of western democracy under the slogan of New World Order does not arise, however lucrative the theoretical definition of democracy might sound : Government of the people, for the people and by the people. It would amount to : Old wine in a new bottle.

FREE MARKETS ECONOMY

This slogan carries no novel idea, it is, rather, a repetition of economic system which has been followed by the Western European countries and the U.S.A. since more than two centuries. The champions of free markets economy know that this system breeds capitalism and encourages exploitation for the interest of a few which entailes miseries to many. As a re-action to it, Soviet Russia sponsored another fantastic system in the name of socialist economy which in the meantime has been abandoned. The West has been suffering from a phobia against Islamic economy and democratic systems, though the west failed to evolve any other system to contest the Islamic system of life.

The cause of failure of economic democracy in the west is the same as that of the failure of the political democracy since both the concepts were tried to be grafted in an is olated manner, with the

uncongenial background and a hostile social context. Wheras the success of both political and economic democracy under the Islamic concept of Sovereignty (that it lies with God) is based on the facts that Islam within its own frame work inherently builds up a cultural, political, economic, legal and ethical system of life through which men are trained up morally and ideologically to be ideal citizens of an Islamic State to qualify them for the solution of all human problems.

Communism got a chance to be tried in Russia and in the Eastern European countries, the members of the WARSAW pact, as a reaction of Capitalism, a child of Western Democracy. For above 70 years through a totalitarian system entailing inhuman oppression and killing of it's citizens in terms of lacs, with denial of civil liberty and human rights, it continued. Ultimately due to inherent defect of Marxism its offspring Communism died a sure death.

NEW WORLD ORDER

On a critical examination of the issues involved: Human rights, Democracy and Free market economy, it is found that each one failed in the secular world. New World Order as a stunt came into circulation, either on the threshold of fall of communism in Russia or on the eve of American invasion against Iraq, during the Gulf Crises whatever it is Joseph S. Nye Jr. (Director of the Harvard Centre for International Affairs) in an article 'What New World Order?' Compared and predicted about president Bush's slogan: New World Order in a passimistic way: "Like Woodrow Wilson's Fourteen Points or Franklin Roosevelt's Four Freedoms, Bush's grand rhetoric expressed the larger goals important for public support when a liberal democratic state goes to war. But after the war, when reality intruded, grand schemes turned into a liability" (Foreign Affairs, Spring, 1992 Vol 71, No.2. P. 83) But in the case of the slogan 'New World Order' it will continue as a face-saving slogan or end as a stunt.

INDIVIDUALISM VERSUS COLLECTIVISM

INDIVIDUAL VERSUS SOCIETY:

A man by nature is a social being. He is to organize and live in a political community termed as state out of his own necessity. A man is also selfish and his self interest is inherent in his nature. Tug of war between the interest of an individual vis-a-vis the interest of other individuals and between the individuals on the one side and the interest of the collective society or the state on the other has been a continuous problem under the secular concept of sovereignty. Conflicting interest of an individual against the collective society and vice versa, under the secular concept of sovereignty, offers an acute problem which could not be solved uptill today by any man-made ism (or any religion) except by Islam

INDIVIDUALISM is a term which places high value on the freedom of individual. The individualistic theory holds that the interest of a man is best served by allowing him maximum freedom and responsibility for choosing his objectives and the means of obtaining them. It emphasizes priority of the individual and his rights. Locke, Kant, John Stuart Mill, Fichte and Humboldt advanced the augment in defence of individualism. An excess of Government, according to John Stuart Mill, starves the development of some questions of the bodily or mental faculties, when it deprives one from doing what one is inclined to do or from acting to one's judgment of what is desirable.[72] Humboldt opines that the aim of the state should be the development of the powers of all its single citizens in their perfect individuality, that it must, therefore, pursue no other object than that which they can not pursue of themselves that is security.

According to J. W. Garner, "Nature submits to him who most energetically and resolutely assails her. She grants her rewards to the fittest without regard to other considerations of any kind." Free competition develops in the individual the highest possibilities, sharpens and strengthens his powers of initiative, and increases his

sense of self-reliance. Civilization and national progress depend on individuals' faculties of self-help and self-reliance. The highest civilization has been developed under individualism, a system which has produced more material and educational progress than could ever have been produced under paternalism.[73] But as the consequences of the policy of laissez-faire which means the free play of the forces of competition, capitalism, exploitation and imperialistic designs have been encouraged in the west.

COLLECTIVISM as a political theory emerged first in point of time,in the eighteenth century as a reaction of individualism. It emphasises the priority of community and its rights. Collectivism found its expression in 'Social Contract' (1762) by Rousseau and in the writings of German Philosopher Hegel. According to Rousseau it is through submission to the general will (Volonte Generale) of the society and individual finds his true being and freedom, under the slogan of national interest.

Charis Waddy on a comparative study of the present day economic systems observes, "In the present day world both the Capitalist and Communist camps suffer from a conflict between the rights of the individuals and the rights of the community. Whereas Capitalist Societies protect the individual and his rights, often pushing so far as to trespass on the community welfare, Communist countries disregard the individuality for the sake of society, as a whole. The result of both are far from satisfactory. Whereas under the Islamic concept of sovereignty an equilibrium between individualism and collectivism has been established. Islam not only declared a complete code of life in which provision is made to refer all questions of dispute to God that is Al-Quran. She further observes the so called free world boasts of political freedom, freedom of thought and expression. Yet under the banner of private enterprise such perversions as greed and selfishness have become acceptable. Freedom of thought has often been converted into freedom to pollute thought. As people become more and more material minded, they become less and less

God guided. The result is an unhappy society. When we turn to Communist Society, of course it has already collapsed by now, the scene is even worse. Individuals are but bricks used for a building. Society looks like a bee hive or an ant colony very active, very disciplined. In this atmosphere, a sign of individuality is looked upon as political opposition. Since the conception of God is not existent it is difficult to imagine any source from which values such as conscience, love, self-restraint and charity can derive. The inevitable result is also an unhappy society."[74]

Charis Waddy, in the context of the failure of the West turns to Islam and observes: "it may be asked how Islam views this question. It is interesting to note that the views here given are not derived from the theories of communism and capitalism. Because the religion of Islam as conveyed by the prophet Muhammad is nearly fourteen hundred years old."

The communal and individual view points have been so blended in Islam that it is difficult to separate them. Fraternity and love are the cementing factors which bind various individuals to form a homogeneous society congenial to democracy. In the prophet's words: "The faithful are to one another like (parts of) a building each part is strengthening the others" and: "The faithful in their mutual compassion. sympathy and love are, exemplified by the whole body. If one of its organs falls ill, the reminder will suffer" (Al-Hadith).

Charis Waddy appreciates Islamic ideas of life and says:"These ideas are not merely of moral value. They are legally implemented, for Islam brought with it a legal system. A legal principle introduced by the 2nd Caliph Umar decrees that if a person dies of starvation then penalty for wrongful death should be imposed on all the citizens of the town, as though they had killed him."[75] She further observes: In Islam, for the first time, an economic theory of equal opportunities and fair distribution were outlined. Islam teaches that God is concerned not only with moral and ethical reforms, but also with social emancipation and economic condition.[76]

She observed on the impact of teachings of the prophet of Islam: The whole of existence had become different. The status of the poor and of the slaves, the rights of woman, the protection of minors had been put on a totally new basis, Politics and economy were reorganized, democracy brought in the public life, all in a manner incredibly audacious for those days.[77]

She on a comparative study of Islam and Marxism opines: The Quran projects a basis for a moral interpretation of history, an interpretation which is deeper and broader than that of Karl Marx, because it covers both moral and material aspects, while that of Karl Marx, concentrates entirely on material aspects being greatly influenced by the materialistic evolutionary philosophies of his time. Marx completely ignored the principles of Islam which as a religion aimed at a society where equality, justice and prosperity would prevail.[78]

Because of a balanced economic system of Islam Prof. H.A. R. Gibb observes that within the western world, Islam maintains the balance between the exaggerated oppositions. It is opposed equally to the anarchy of European nationalism and the regimentation of Russian communism. It has not yet succumbed to the obsession with the economic side of life which is a characteristic of present day Europe and Russia alike. Having quoted Professor Massignon, Gibb further observes: Islam has the merit of standing for a very equilitarian conception of the contribution of each citizen by the tithe to the resources of the community. It is hostile to unrestricted exchange, to banking capital, to state loan, to indirect taxes on objects of prime necessity. Here again it occupies an intermediate position between the doctrines of bourgeois capitalism and Balahevist communism.[79]

Islam introduced an exploitation-free society more than one thousand years prior to the Industrial Revolution of the eighteenth century. The Western economic system produced capitalism and, consequently encouraged exploitation.

The economic system under Communistic dictatorship establishes state managed capitalism in place of capitalism and exploitation by individuals under Western democracy. Both the systems as of necessity encourage imperialism under different slogans. Islam, through its balanced political and economic systems prohibits all forms of exploitation, and regimentation.

SUPERIORITY OF ISLAM

The Creator has his own design for the benefit of mankind. For this great purpose He has prescribed a complete Code Al-Quran. It is categorically declared by him with regard to Al-Quran and its purpose : The Book which He revealed unto prophet Muhammad would lead mankind out of the depths of darkness into light to the Way of God, the Exalted in power, Worthy of all praises.[80] Allah specifies the object for the Muslim Ummah in the following terms:That if they are established by Him in any land they would establish Regular Prayer and give regular Charity (Zakat) enjoin the right and forbid wrong. The Muslims are to accept the responsibility of administration on this onerous but noble philosophy as a state policy. Muslims are directed in Al-Quran to co-operate among themselves and to help one another in righteousness and piety but not to help in sin and rankour and to fear God who is strict in punishment. [81] The Muslim Ummah is further directed to strive together in a competitive spirit (as in a race) towards all that is good. [82] Unlike the Christian concept that men carry the original sin of Adam and they are sinners. Islam declares, on the other hand that men are born sinless, they are, rather the Vicegerents of the Creator on this earth.[83] Mankind is considered as helper of God in implementation of the principles of the divine scheme of Al-Quran on this planet.

Islam significantly looks at the substance, objectives and the spirit as against the mere form of the Goverment. Emphasis of Islam is on the inward essence and not the outward form of the Government. It puts the highest importance on the quality and Taqwa of the Head of the state and its functionaries rather than on the form of the Government. The ruler and the ruled are answerable to Allah apart from being liable to the people in this worldly life. Both the Ruler and Ruled act on a common ideological platform with common goals: satisfaction of Allah, mandate for good deeds and forbidding the evil deeds, establishment of justice and fair play, to ensure the happiness of the people and their development as khalifat Ullan on this planet.

The outstanding success of Islam as a way of life is based on the material, moral and spiritual development of its followers. Islamic movement, as distinguished from other secular movements, stands on an ideological footing. To join the Islamic Ummah, one has to be specially trained up according to the teachings of Al-Quran and Sunnah of the Prophet (PH). There is no scope for a self-seeker in Islam, nor there is any chance of Opportunism and political adventurism. As a product of Islamic movement, under the leadership of the prophet mankind can have a steel-framed character like Abu Bakr who could stand uncompromisingly for truth and principle. Islam produced Umar the Great. Zafar Ali Khan the translator of "Umar the Great" written by " Allama Shibli Nu'mani appreciates Umar in the following terms "To no person, ever since the dawn of history, has the appellation 'great' been more deservedly conceded by posterity than to this Second Caliph of Islam. He was great in the true sense of the term, Alexander, Julius Casear and Napoleon are called great because they were mighty governors and administrators, Peter and Frededrick are called great because they evolved order out of chaos and made their respective nations great; Solomon and Justinian may be called great because one of them was the wisest and the most magnificent potentate that ever lived and the other a great law-giver, but Umar was great because he was all that Alexander, Julius Caesar, Napoleon, Peter, Frederick, Justinian and Solomon put together

exemplified. He was a conqueror, a statesman, a reformer, a law-giver and a spiritual head but all at once"[84] Gibbon in his immortal work 'The Decline and Fall of the Roman Empire (1890 edition), says of Umar 'Yet the abstinence and humility of Omar were not inferior to the virtues of Abu Bakr: his food consisted of barley-bread or dates: his drink was water; he preached in a gown that was torn and tattered in twelve places; and a Persian satrap, who paid his homage to the conqueror, found him a sleep among the beggars on the steps of the mosque of Medina.[85] It was possible only for Umar, a product of Islamic movement to declare that even if a dog dies of starvation on the farthest bank of the Euphrates he has to answer to Allah. It is possible only under the Quranic system of Government that Umar, the head of the state could carry, with great pleasure, a bag of wheat himself on his shoulder to reach to the cottage of the hungry under thick cover of darkness of the night. It is Islam alone that casts a duty upon a citizen to protest any wrong action of the ruler on his face which is considered as an Ebadah. It is possible only under an Islamic brand of democracy for and ordinary man to rise up before the Amirul Muminin Umar and ask him with a challenging tone to stop the Khutba and to reply as to where from he got the cloth for his longer garment when others got smaller quantity of cloth. His son stood to defend the father Umar, a tall man: his share of the cloth was given to his father for a longer garment.

The special ground for the success of Islam in all spheres of life and on all issues, is that Islam is a divine, scientific and a complete code of life. No other religion or man-made ism can stand on merit before the superiority of Islam. In fact Al-Quran repeatedly declared that Allah sent his Apostle with Guidance and the Religion of Truth to proclaim it victorious over all religions.[86] The truth of this assertion was established during the early period of Islam when Muslim world was at the pinnacle of its glory since the Muslim world was then clinging to the teachings of Al-Quran.

Wilfred Cantwell Smith remarks that Islam had superiority over Christianity glaringly as a religion. According to him, during the Middle

Ages, religion flourished in both communities: the Christian and Muslims, yet that was when Islamic civilization flourished, while Christendom showed no vitality. As long as the Christian religion reigned supreme , Europe was culturally backward; it is only as Europe has gradually shed her religion,or relegated it to less and less decisive aspects of life, that she has forged ahead so spectacularly. The Islamic world, on the other hand, has retrogressed since gradually forsaking the true tenets of Islam.[87]

H. G. Wells (1866-1946), English Novelist, Sociologist and Historian, discussing the phenomenal and marvellous vigour of Islam as a complete code of life says: "And if the reader entertains any delusion about a fine civilization, either Persian, Roman, Hellenic or Egyptian being submerged by this flood, the sooner he dismisses such ideas the better. Islam prevailed because it was the best social and political order the times could offer. It prevailed because everywhere it found politically apathetic peoples, robbed, oppressed, bullied, uneducated and unorganized and it found selfish and unsound government out of touch with any people at all, it was the broadest, freshest and cleanest political ideas that had yet come into actual activity in the world and it offered better terms than any other to the mass of mandkind.[88]

ISLAM AND THE CHRISTIAN WORLD

Despite the most outstanding merit of Islam as a code of life, the West took an oblique, rather, a hostile view about it which took inordinately a long time for them to appreciate Islam, its political and economic systems. The reasons for hostility were obvious: The Muslim World, during the early days of Islam, annexed significant portions of the Byzantine Empire (Eastern Roman Empire) when the people due to superiority of Islamic values voluntarily embraced Islam and peferred Muslim Rule to that of the Byzantine. The conquest of Spain by the Umayyids and their rule for more than seven hundred years (756-

1492 A D), and the Crusades (1095-1258 A D) initiated by the Christian powers by the end of the eleventh century which continued upto the thirteenth century yielded victory to Islam. The conquest of Constantinople, the Capital of the Bizantine Empire in 1453 AD. by the Muslims added insult to injury for the West.

The Christian World, out of defeats and frustrations, become bitterly hostile against Islam and the Muslim World. The ignorance and misinformation about Islam made the Christian World still more virulent. They left no stone unturned to malign Islam and the prophet (SM). They concocted total lies and invented offensive slanders against Islam. This malicious propaganda campaign continued for centuries till, through the process of time, truth started to prevail to vanish falsehood. Al Quran though was translated into Latin in about 1143 but it was not published till 1543 AD. The delay of publication for a long period of 400 years was caused by prohibitory order of Christian authorities. However it was translated into Italian, German and Dutch by the 17th century. French translation by D. U Ryer was published at Paris in 1647. The first English translation by A Ross appeared from London in 1649 which was the translation of the one by DU Ryer. By the 19th century, translation in other languages came out to dispel all doubts and baseless blemishes attributed, by false propaganda, to Islam.

Thomas Carlyle (1795-1881 AD) published his work on Heroes and Hero-Worship, and the Heroic in History in 1841 in which he selected Muhammad (PH) to be the hero as a Prophet. By the 19th century, research works on Islam and the Prophet (PH) convinced the modern world about the veracity of both Islam and its prophet. Consequently the hostile tone of the Christian writers has not only come down but also a keen competition has been going on among the orientalists and Scholars of the West to know more about Islam, a complete code of life. They are now convinced that it is Islam alone that can salvage the ideologically bewildered, politically and economically derailed and philosophically misguided humanity. In the meantime a considerable

number of scholars and Intellectuals among the great sons of the West have embraced Islam, on proper and comparative study, and they on their own, have been propagating, with missionary zeal, Islam for the salvation of the suffering humanity. Large number of Christian intellectuals, during the current century authenticated the superiority and the divine basis of Islam.

Maurice Bucaille a Christian and a French doctor examined the Holy Scriptures in the light of modern knowledge and concludes: "The comparison of several Biblical and Quranic narrations of the same subjects shows the existence of fundamental differences between statements in the former which are scientifically unacceptable, and declarations in the latter which are in perfect agreement with modern data. In view of the level of knowledge in Muhammad's day, it is inconceivable that many of the statements in the Quran which are connected with Science could have been work of a man. It is, moreover, perfectly legitimate, not only to regard the Quran as the expression of a Revelation, but also to award it a very special place on account of the guarantee of authenticity it provides and the presence in it of scientific statements which, when studied today, appear as a challenge to explanation in human terms."[89] Of course the Christian world, particularly its political circle, as a matter of policy has been dealing maliciously with Islam and Muslim World to safeguard their vested interest and on the apprehension that Christianity may be eclipsed by Islam in due course. William Ewart Gladstone (1809-1898 AD) the greatest British statements of the 19th century and four times prime minister while debating on British Colonial Policies in the Parliament held the Holy Quran in his hand and shouted that so long the Egyptians have this Book with them, the British cannot have quiet or peace in that land. The British Govt. having superseded the Company's Government assumed power in Indian sub-continent directly and formulated education policy through Macaulay. Alia Madrasha, though was established in Calcutta, the capital of India in September 1780 at Baithak Khana area. Approval was given in 1781 (AD) during Warren Hasting's time, the principals were consecutively

selected from the Christians to the exclusion of any Muslim till 1927. The Christian principals were very particular to screen out the real teachings of Al-Quran from the syllabi.

Islam due to its highly distinguished culture and an incomparable system of life made the highest contribution to World Civilization. It showed candle not only to Asia and Africa but also to Europe and gave leadership to mankind at a time when they were groping in the darkness of barbarism.

An intellectual of international stature. M.N. Roy, having appreciated the superiority of Islam, observes in 'Historical Role of Islam' that an ardent admirer of ancient Hindu culture like Havell, who cannot be suspected of any sympathy or even fairness to the Muslims, gives the following highly interesting testimony with regard to spread of Islam in India: "Those who did so (embraced Islam) acquired all the rights of a Musalman citizen in the law courts where the Quran and not Aryan law and custom decided dispute in all cases. This method of Proselytism was very effective among the lower castes of Hindus, specially among those who suffered from the severity of Brahmanical law with regard to the 'impure' classes (Aryan Rule in India). He continues: " In any case it is clear that in the time of Mohammadan conquest, there lived in India muititudes of people who had little reason to be faithful to Hindu laws and the traditions of Brahman orthodoxy, and were ready to forsake that heritage for the more equitable laws of Islam which offered them protection against the tyranny of triumphant Hindu reaction,

If the sociological programme of Islam found support of the Indian masses, it was because the philosophy behind that programme was better than the Hindu philosophy which had been responsible for the social chaos from which Islam showed a way out for the masses of the Indian people." By the above statement Havell admits that even in the thirteenth and fourteenth centuries, when Islam was winning adherence, in India, it had not altogether played out its social revolutionary role, and that it was by virtue of its social-revolutionary

character that it struck so deep a root in India. That is to say even in its days of degeneration and decay, Islam represented spiritual ideological and social progress in relation to Hindu conservatism.[90]

M. N. Roy was pained at heart, due to malicious and hostile attitude of Hindu India with regard to Islam, its culture and the Muslims. In view of this realistic reading of history, Roy castigated Hindu India in the strongest terms and cautioned them, referring to the future of India: "Hindu superciliousness towards the religion and culture of the Muslims is absurd. It insults history and injures the political future of our country. Learning from the Muslims, Europe became the leader of modern civilisation. Even today, her best sons are not ashamed of the past indebtedness.[91]

Where does the western world stand today? In the absence of a complete and an exhaustive system of life like Islam, which covers material, moral, and spiritual aspects of life, blended into one code with a sense of direction to establish a balanced and an ideal society for the benefit of mankin: both in this worldly life and the life hereafter, the west today has been floating like a ship, without any mooring and radar. The secular world has been adopting unsuccessfully political and economic systems one after the other to fall from prying pan to fire

Force is the standard of international justice. Self interest predominates over justice and fair play. Double standard is followed in International Affairs to suit the purpose of big powers. The U N O itself, as such is influenced accordingly.

A sense of frustration has been prevailing throughout the world due to discriminatory role of the World body over Palestine, Kashmir, Bosnia Herzegovina and other burning issues.

The social fabric of the west is torn asunder, in the absence of any ethical guideline. No moral values are followed in political, ecomomic and other spheres of life. Free sex is encouraged. Abortion is legalized. There is a public demand for legalizing Homo-sexuality

even from political platforms. The slogan of Human Rights, Human Dignity, peace and happiness is a far cry. The west is heading towards barbarism again, from out of which Islam salvaged them six centuries back.

Modern world today, due to failure of man made isms, has been suffering from the paucity of correct social, political and economic systems. Over and above, acute problems like: racism, inequality, vacuum in spiritual sphere, absence of tolerance and peace throw a challenge to the existence of mankind. Unless proper and timely step is taken to meet the situation mankind is going to face a grave consequence which may lead them to annihilation.

Now the pertinent question is as to who and what way of life can come to the rescue of mankind. It is Islam alone that can accept the challenge to squarely solve all human problems: material, moral and spiritual. Islam has got its own tradition and a great heritage. In appreciation of the distinguished merit of Islam in this regard. Arnold J. Toyanbee finds no alternative except Islam to take up the leadership and to play its brilliant role again to save the world. He says in 'Civilization on Trial'

"The extinction of race consciousness as between Muslims is one of the outstanding moral achievements of Islam and in the contemporary world there is, as it happens, a crying need for the propagation of this Islamic virtue. He further on a critical examination of the western concepts vis-a-vis Islam, says that though in certain other respects the triumph of the English speaking peoples may be judged,in retrospect,to have been a blessing to mankind, in this perilous matter of race feeling it can hardly be denied that it has been a misfortune. As things, he further says, are now, the exponents of racial intolerance are in the ascendent, and if their attitude towards the race question prevails, it may eventually provoke a general catastrophe. Yet the forces of racial toleration, which at present seem to be fighting a losing battle in a spiritual struggle of immense importance to mankind, might still regain the upper hand if any strong influence

militating against race consciousness that has hitherto been held in reserve were now be thrown into the scales. It is conceivable that the spirit of Islam might be the timely reinforcement which would decide this issue in favour of tolerance and peace. In these recently and rapidly 'opened up' tropical territories, the western civilization has produced an economic and political plenum and, in the same breath, a social and spiritual void. He alerted the west: the proposition that 'Nature abhors a vacuum' is as true in the spiritual world as in the material; and the western civilization, which has failed to fill this spiritual vacuum itself, has placed at the disposal of any other spiritual forces which may choose to take the field an incomparable system of material means of communication.[92] Having considered the merit of Islam he,for solution of world problems, invoked Islam in the following terms "if the present situation of mankin were to precipitate a race war, Islam might be moved to play her historic role once again" Toyenbee on study of Islam was amazed with regard to Brotherhood of Islam and observed: that when the Ideology of the Brotherhood of man was fired from the canon mouth of Islam, it set the whole world ablaze. And he was highly convinced that Islam is the only framework within which the hopes and aspirations of mankind can be fulfilled.

Michael H. Hart, Lamartine, George Bernard Shaw and many other Christian intellectuals agree with Toyenbee in this regard.

Michael H. Hart on the comparative study of the contributions of all great men that the world produced, put the name of Prophet Muhammad at the top, (as number one) in his book, "The 100 A Ranking of the Most Influential persons in History' for his supreme success on both religious and secular levels.[94] He put the name of Newton as number two, his own prophet Jesus as number three, Buddha as number four, Moses number sixteen.

Lamartine says that as regards all standards by which human greatness may be measured it may be well asked: Is there any man greater than Muhammad?

He with a challenging tone poses a question: Who could dare compare any great man in modern history with Muhammad? George Bernard Shaw, the most critical observer of human affairs with deep insight, was said to be the voice of conscience of modern Europe. He says, " I have always held the religion of Mohammad (SM) in high estimation, because of its wonderful vitality. It is the only religion, which appears to me to possess that assimilating capacity to the changing phase of existence which can make its appeal to every age. I have studied him, the wonderful man and in my opinion far from being an anti Christ he must be called the saviour of humanity, I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the world, he would succeed in solving its problems in a way that would bring it the much needed-peace and happiness. I have prophesied about the faith of Mohammad (SM) that it would be acceptable to the Europe of tomorrow as it is beginning to be acceptable to the Europe of today.[96]

Professor Ramakrishna Rao in the biography of the prophet having quoted Geothe the greatest of German Poets says that he (Geothe) had declared about Al-Quran "This book will go on exercising through all ages a most potent influence"[97]

Professor Rao having quoted George Bernard Shaw says," If any religion has a chance of ruling over England, nay Europe, within the next 100 years, it is Islam".[98]

REFERENCES

1.	Bible	Matt.	XXII. 21
2.	Bible	John	XVIII. 36
3.	Al-Quran		Hadid : 27
4.	"		Maida : 4
5.	"		An'am : 38
6.	H. Lammens S.J. Professor of Arabic at St. Joseph's University of Beirut.		Islam-Belief and Institution P. 82

7.	Philip K. Hitti	Islam A Way of Life P. 42
8.	J. Schacht.	Theology and Law in Islam (Wiesbaden) P. 10
9.	"	Ibid P. 10
10.	Keith Callard	Pakistan A Political Study PP. 194 & 196.
11.	Al-Quran	Anbiyaa : 92
12.	"	Hujurat : 13
13.	"	Nisaa : 1
14.	"	Hujurat : 10
15.	Al-Quran	Al-I-Imran : 103
16.	"	Kahf : 110
17.	K. Jamal Ahmed	Heritage of Islam
18.	Philip K. Hitti	Islam A Way of Life P-42
19	Al-Quran	Baqara : 208
20.	"	Nisaa : 150-151
21.	"	Baqara : 85
22.	Encyclopaedia Britannica	Vol-15 P. 644
23.	Al-Quran	Al-Hijr : 29
24.	"	Maida :4
25.	Alank K. Henrikson	Essay on how on the Vision of A "New World Order" be Realized Reprinted from The Fletcher Forum of World Affairs, 1992 P. 65.
26.	Alank K. Henrikson	Ibid P.-do-
27.	Lawrence Freedman	Order And Disorder In The New World, Foreign. Affairs, 1991/92 Vol. 71 No. 1 P. 21.
28.	Conference On Moslem Doctrine And Human Rights in Islam (Between Saudi-Christian Jurists) Published by Ministry of Justice Riyadh PP. 15-16.	
29.	Sir Stafford Cripps.	Democracy Up-to Date George Allen & Unwin Ltd. Museum Street London P. 20.
30.	Sir Stafford Cripps	Ibid P. 15
31.	Harold J. Laski	Democracy In Crisis George Allen & Unwin Ltd. P. 75.
32.	Harold J. Laski	Ibid P. 75
33.	Harold J. Laski	Parliamentary Democracy in Englanld George Allen & Unwin Ltd. P. 43.
34.	John Dewey	Democracy in Readings in Philosophy Edited by John Harman Randal Jr. P. 35.

35.	Walt Whitman	Article 'Democratic Vistas' in Mass Culture The Popular Arts, Edited by Bennard Revenberg And David Manning White. The Newyork. Mac Millan Ltd. London. P. 35
36.	Edward Benes	Democracy Today and Tomorrow. Mac Millan & Co. Ltd. St. Martin Street London. P. 218.
37.	Harol J. Laski	Article 'The Internal Conditions of Democracy. Reflection on the Revolution of our time. Allahabad Central Book Depot. P. 189.
38.	Sir Muhammad Iqbal	The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Published by Javid Iqbal son of Sir Iqbal (can be had of Sheikh Muhammad Ashraf Kashmiri Bazar, Lahore) P. 179.
39.	Thoughts and Reflections of Iqbal. Edited by Syed Wahid. Muhammad Ashraf Publications, Kashmiri Bazar, Lahore. P. 37.	
40.	Bertrand Russell.	Readings for Thought and Expression Article -Taming of Power. P. 180.
41.	Ibn-I-Khaldum	Muqaddima (Prolegomena) to his famous Kitab Al-Iber.
42.	Al-Quran	Fatiha : 2
43.	"	(a) Al-I-Imran : 189 (b) Maida : 43
44.	"	Mulk : 1-2
45.	"	An'am : 57
46.	"	(a) Yusuf : 40 (b) Qasas : 88
47.	"	Hadid : 5
48.	"	Nisaa : 59
49.	"	(a) Al-Shura : 38 (b) Al-I-Imran : 150.
50.	Harodd J. Laski	A Grammar of Politics. PP. 45 & 17.
51.	Charis Waddy	The Muslim Mind. Longman London and New York. P. 40
52.	Professor K.S. Rama Krishna Rao Reader and Head, Department of Philosophy, Maharani,	Muhammad the prophet of Islam. Reviewed by Dr. Muhammad Abdu Yamani. MWL Journal 1990 Nos. 7 & 8

	Arts College Mysore	P. 62 at 64.
53.	Sayyid Abul Ala Mawdudi	The Economic Problem of Man and Its Islamic Solution. Islamic Publications Ltd. Lahore Pakistan 1975. P. 40.
54.	Al-Quran	(a) Ta-Ha :6 (b) Maryam : 65
55.	Al-Quran	: Baqara : 29
56.	"	(a) Jathiya : 13 (b) Luqman : 20 (c) Hajj : 65 (d) Nahl 18-16 (e) Ra'd : 2-4
57.	"	Jumua : 10
58.	"	(a) Zariyat : 19 (b) Maarij : 24-25
59.	"	Al-I-Imran : 186
60.	"	Baqara : 274 & 277
61.	"	Baqara : 177
62.	"	Baqara : 275
63.	"	Baqara : 277
64.	"	Tauba : 34-35
65.	"	Hashr : 7
66.	"	(a) Bani Isra-il : 26-27 (b) Furqan : 67
67.	"	Baqara : 219
68.	"	Qasas : 77
69.	"	Baqara : 273
70.	Khuda Baksh	Essay : Indian and Islamic PP. 16-17
71.	Maryam Jameekah	How we can achieve Islamic Society. An article in Islamic Review January - March 1963 Woking England. P. 30.
72.	J.S. Mill	Political Economy. Vol. II. P. 561.
73.	J.W. Garner	Political Science and Government P. 461.
74.	Charis Waddy	The Muslim Mind. P. 38
75.	"	- do - P. 39.
76.	"	- do - P. 44
77.	"	- do - PP. 35-36
78.	"	- do - P. 47.
79.	H.A.R. Gibb	Whither Islam 1932. P. 379
80.	Al-Quran	Ibrahim : 1

81. " Maida : 3
82. " Baqara : 148.
83. " Baqara : 30

84. Allama Shibli Nomani Omar The Great Vol. 1. Translation in English by Zafar Ali Khan. PP. VIII.
85. Allama Shibli Nomani Ibid XII Quoted Gibbon : The Decline and
Fall of Roman Empire. Vol. V P. 400.
86. Al-Quran (a) Fat-h : 28
(b) Saff : 9
(c) Tauba : 33
87. Wilfred Cantwell Smith Modern Islam In India.
SH. Ashraf Publication. Kashmiri Bazar
Lahore, Pakistan,. P. 62
88. H.G. Wells Outline of History, P. 425.
89. Maurice Bucaille The Bible The Quran And Science Translated from French by Alaspair D Pannel and the Author.
PP. 251-252.
90. M.N. Roy The Historical Role of Islam
(An Eassy On Islamic Culture)
(Vora & Co. Publishers Ltd. 8 Round Building Bombay-2. PP. 97-99.
91. M.N. Roy Ibid. PP. 105-106.
92. Arnold J. Toynbee Civilization On Trial Oxford University Press. PP. 205-208.
93. Arnold J. Toynbee Ibid. P. 212.
94. Michael H. Hart. The 100
A Ranking of the Most Influential Persons In History. Citadel Press Secaucus, New Jersey.
P. 33. at P. 40
95. Professor Rama Krishna Rao Ibid. P. 62
96. George Bernard Shaw The Genuine Islam
Singapore. Vol. 1, 1936.
97. Professor Rama Krishna Rao Ibid. P. 62. at 64.
98. Do Ibid. P. 64.

স্পেনের কর্ডোভায় আন্তর্জাতিক ইকবাল মহাসম্মেলন

আনোয়ারুল হক

সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন নগরী করডোভায় ইকবাল দিবস '৯১ পালন উপলক্ষে এক আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আবার ইসলামের আওয়াজ সমস্বরে উচ্চারিত হয়। ২১ হতে ২৪ নভেম্বর '৯১ পর্যন্ত চারদিনব্যাপী উক্ত সম্মেলন 'ইসলাম এ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট' নামক ফ্রান্সের প্যারিসভিত্তিক একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডঃ ফ্রান্সিস লামাঁ একজন মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টান জগতের সাথে ইসলামের পরিচয় করাবার ও যতদূর সম্ভব সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে বিগত দশ বছর থেকে অবিরাম কাজ করে আসছেন। আল্লামা ইকবালের উপর উক্ত মহাসম্মেলন ঐ প্রচেষ্টারই একটি অবিস্মরণীয় প্রয়াস।

উক্ত মহাসম্মেলনে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতসহ বিশ্বের ৩৪টি দেশ থেকে আল্লামা ইকবালের জীবন, শিক্ষা ও দর্শনের ওপর মূল্যবান অবদান রেখেছেন এমন ৫২ জন খ্যাতিমান পন্ডিতকে আমন্ত্রণ করা হয়। সুদূর চীন ও জাপান থেকে আরম্ভ করে সোভিয়েত রাশিয়া, জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, কানাডা, স্পেন ও ফিনল্যাণ্ডসহ আরো বেশ কিছু দেশ থেকে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উক্ত মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণ করে গবেষণামূলক ও তথ্যবহুল প্রবন্ধাদি উপস্থাপন করেন। যে সব দেশ থেকে এবং যারা সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েছিল তাদের নাম ও পরিচয় নিম্নরূপঃ

বাংলাদেশ	ঃ	ডঃ আবু সাঈদ নূর উদ্দীন, আল্লামা ইকবাল সংসদ, ঢাকা।
বেলজিয়াম	ঃ	জাঁ মিশো, ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি, লুভ্যা।
কানাডা	ঃ	শীলা ম্যাক ডানা, কনেকর্ডিয়া ইউনিভার্সিটি, মনট্রিয়াল।
চীন	ঃ	(১) লিউ শুখিয়ং, পিকিং ইউনিভার্সিটি, বেইজিং। (২) শান য়ুন, পিকিং ইউনিভার্সিটি, বেইজিং।
চেকোশ্লোভাকিয়া	ঃ	ইয়্যান মারেক, চার্লস ইউনিভার্সিটি, প্রাগ।
মিসর	ঃ	(১) আহমদ মোয়াদ আহমদ, আল-আযহার ইউনিভার্সিটি, কায়রো। (২) হুসাইন মুজীব আল-মিসরী, আল-আযহার ইউনিভার্সিটি, কায়রো।
ফিনল্যাণ্ড	ঃ	হেনরী ব্রম্‌স, বাসা ইউনিভার্সিটি, ফিনল্যাণ্ড।
ফ্রান্স	ঃ	(১) আর্লেঁ দেজুলিয়ার, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ অরিয়েন্টাল ল্যাঙ্গুইজেজ, প্যারিস। (২) আনী কৃজা-কৃনিকি, প্যারিস ইউনিভার্সিটি, প্যারিস। (৩) ফ্রাসিস লামাঁ, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সংস্থার সভাপতি, প্যারিস।

(৪) এ রহমতুল্লাহ , ডিরেকটর, সেন্টার ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, প্যারিস।

(৫) মুহাম্মদ আলাল সিনাস্যর, ইউনেস্কো, প্যারিস।

(৬) এবা দ্য বিতরে– ম্যারোবিচ, ন্যাশনাল সেন্টার ফর সাইন্টিফিক রিসার্চ,প্যারিস।

জার্মানী : আনে–মারী শীমেল, বন ইউনিভার্সিটি এবং পরিচালক, সেন্টার ফর ওয়ার্ল্ড রিলেজিয়াস, হার্বাড (আমেরিকা)।

ভারত : (১) জগন্নাথ আজাদ, প্রফেসর ইমেরিটাস, জম্মু ইউনিভার্সিটি, ভারত।

(২) এস.এম.এইচ. বানি, প্রেসিডেন্ট, ইকবাল একাডেমী, নয়াদিল্লী।

(৩) এ. এ. সুরূর, আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি।

ইন্দোনেশিয়া : আবদুল হাদী, বিজি মুতারি, ইন্সটিটিউট ফর দ্য স্টাডিজ অফ রিলিজিয়ন এন্ড ফিলোসফি, জাকার্তা।

ইরান : গোলাম রেজা আওয়ানী, একাডেমী অফ ফিলোসফী, তেহরান।

ইটালী : ভিটো সালিয়েৰ্নো, ভিটোরিনি সাইন্স কলেজ, মীলান।

জাপান : হিরোশি কান কাগায়া, ওসাকা ইউনিভার্সিটি অব ফরেন স্ট্যাডিস।

মালয়েশিয়া : ওসমান বকর, মালয় ইউনিভার্সিটি, কুয়ালালামপুর।

মৌরিতানিয়া : বাহ আবদুল্লাহি সাইয়্যেদ, নোয়াকসট ইউনিভার্সিটি।

ম্যাক্সিকো : গ্রাসিয়েলা দ্য লা লামা, মিনিস্ট্রি অফ ফরেন এফেয়ার্স, ম্যাক্সিকো সিটি।

মরক্কো : মোস্তফা আল–কাতিরী, ন্যাশনাল স্কুল অফ পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন, রাবাত।

নেদ্যারল্যান্ডস(হল্যান্ড): ইয়ুহানেস বালযন, লেইডেন ইউনিভার্সিটি।

নরওয়ে : মোহাম্মদ আনোয়ার সূফী, পাকিস্তান নরওয়ে ওয়েলফেয়ার অরগানাইজেশন, অসলো।

পাকিস্তান : (১) তাওহীদ আহমদ, মিনিস্ট্রি অফ ফরেন এফেয়ার্স, ইসলামাবাদ।

(২) রফী উদ্দিন হাশেমী, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, লাহোর।

(৩) ডঃ জাভিদ ইকবাল, ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইকবাল একাডেমী, লাহোর।

(৪) প্রফেসর মুহাম্মদ মুনাওয়ার, ডিরেক্টর, ইকবাল একাডেমী, লাহোর।

(৫) মুহাম্মদ সুহাইল ওমর, ডিরেক্টর, ইন্সটিটিউট ফর ইসলামিক কালচার, লাহোর।

রুমানিয়া	ঃ	ইয়ন লারিয়ান, পোস্টালাশ, বুখারেস্ট।
সৌদী আরব	ঃ	আবদুল্লাহ মুবাশ্শার আততিরাজী, কিং আবদুল আজীজ ইউনিভার্সিটি, জেদ্দা।
সেনেগাল	ঃ	শেখ আবদুলাই দিয়ে, দাকার।
স্পেন	ঃ	মিগিউয়েল ক্রুজ হের্নান্দেস, অটোনোমাস ইউনিভার্সিটি, মাদ্রিদ।
সুইডেন	ঃ	কার্ল হায়েলকিস্ট, নর্ডিক ইন্সটিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিজ, লুন্ড।
সুইজারল্যান্ড	ঃ	জে. মি. বুর্গেল, বার্ন ইউনিভার্সিটি।
সিরিয়া	ঃ	এহসান হাক্কি, দামেস্ক।
তিউনিসিয়া	ঃ	আবদুল মজীদ বেন হামদা, রেকটা আজজিতুনা ইউনিভার্সিটি, তিউনিস।
তুরস্ক	ঃ	(১) খায়রানী আল-তিনতাস, আংকারা ইউনিভার্সিটি। (২) খলীল জিন, রেকটা সেলজুক ইউনিভার্সিটি, কেনিয়া। (৩) এরকান তুর্কম্যান, সেলজুক ইউনিভার্সিটি, কেনিয়া।
সোভিয়েত রাশিয়া	ঃ	(১) নাটালী প্রিগাডিমা, রাশিয়ান একাডেমী অফ সাইন্সেস, মস্কো। (২) আকবার তুরসুনফ, ডিরেক্টর, তাজিক একাডেমী অফ সাইন্সেস, দুশাম্বে। (৩) লুডমিলা ফাসিয়েফা, রাশিয়ান একাডেমী অফ সাইন্সেস, মস্কো।
যুক্তরাজ্য	ঃ	সাঈদ দুররানী, চেয়ারম্যান, ইকবাল একাডেমী, বার্মিংহাম।
যুক্তরাষ্ট্র	ঃ	টমাস ব্যালেন্টাইন আর্ভিং, ইউনিভার্সিটি অফ টেনেসি, নক্সভিল।
যুগোশ্লাভিয়া	ঃ	রুসমীর মাহমুদ চেহালিচ, ওসিয়েক ও লুবনিয়ানা ইউনিভার্সিটি।

সম্মেলনের বিস্তারিত প্রোগ্রাম ছিলো নিম্নরূপ

২২ নভেম্বর ঃ ১৯৯১

বিষয় ঃ মুহাম্মদ ইকবালের বাণীর বিশ্বজনীনতা। সভাপতিত্ব করেন ডঃ ফ্রান্সিস লামাঁ।

(১) ইকবাল, ইসলাম ও পাশ্চাত্য জগৎ, চেয়ারম্যান–সাঈদ আখতার দুররানী।

(২) ইকবালের মানবতাবাদ, চেয়ারম্যানদ্বয়– প্রফেসর মুহাম্মদ মুনাওয়ার–পাকিস্তান ও আবদুল্লাহ মুবাশশির আততিরাজী–সৌদী আরব।

(২) মানবজাতি ও বিশ্বজনীনতাবোধ, সভাপতিদ্বয়–এভা দ্য ভিবরে মিয়ারো ভিচ ও নীলজিন।

২৩ নভেম্বর ঃ ১৯৯১

বিষয় ঃ ইকবালের রচনায় আধ্যাত্মিকতা– সভাপতি আনমারি শিমেল।

(১) ইকবালের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি, চেয়ারম্যান–জগন্নাথ আজাদ।

(২) মোহাম্মদ ইকবালের নৈতিকতাবোধ, চেয়ারম্যান–এ রহমতুল্লাহ।

(৩) ইকবালের কবিতা ও কাব্যালঙ্কার, চেয়ারম্যান–এ এ সুরুর।

২৪ নভেম্বর : ১৯৯১

বিষয় : ইকবালের ধর্মীয় চিন্তার গতিশীলতা, সভাপতি– ডঃ জাভিদ ইকবাল।

(১) ইসলাম ও সামাজিক বিবর্তন, চেয়ারম্যান–লিউমু খিয়ং।

(২) আইন ও রাজনীতি সম্বন্ধে ইকবালের চিন্তা, চেয়ারম্যান–জান মারেফ।

(৩) ইসলামের ভবিষ্যত, চেয়ারম্যান–মিগিউয়েল ক্রুজ ফার্নান্দেস।

উল্লেখ্য, প্রথম দিন ২১ নভেম্বর তারিখে স্পেন সরকারের বিশেষ অনুমতিক্রমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি মুসলিম শাসকদের অমরকীর্তি করডোভা মসজিদের অভ্যন্তরে মেহরাবের সম্মুখে ডঃ ফ্রান্সিস লামাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আল্লামা ইকবালের সুযোগ্য পুত্র বিচারপতি (অবঃ) ডঃ জাভিদ ইকবাল বালে জিবরীলে সংকলিত 'মসজিদে করতবা' নামক প্রসিদ্ধ উর্দু কবিতাটি, যা ভাষা ও ভাবের দিক দিয়ে অত্যন্ত উঁচুস্তরের ও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত, বিশেষ ভাবগম্ভীর পরিবেশে পাঠ করে শোনান। অতঃপর কবিতাটির ইংরেজী ও আরবী অনুবাদ যথাক্রমে বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ এস. এ. দুররানী ও আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস হুসেন মুজিব আল–মিসরী পড়ে শোনান। এটা ছিল এক অপূর্ব দৃশ্য। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বোধ হয় এভাবেই ঘটে।

২২, ২৩ ও ২৪ নভেম্বর অন্যান্য সেশনসমূহ মসজিদের ডান দিকে অবস্থিত একটি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন ডঃ ফ্রান্সিস লামাঁ সভাপতিত্ব করেন। সকালে চা চক্রের আগে ও পরে এবং বিকালে অনুরূপভাবে দু'বার করে প্রতিদিন মোট চারটি উপ–সেশন হয়। প্রবন্ধকারগণ পূর্ব নির্ধারিত অনুষ্ঠানসূচী অনুসারে তাদের বক্তব্য পেশ করেন। দ্বিতীয় দিন জার্মানীর প্রখ্যাত মহিলা ও বিশ্বনন্দিত ইকবাল বিশারদ প্রফেসর আন মেরী শিমেল সভাপতিত্ব করেন। তৃতীয় দিন সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি (অবঃ) ডঃ জাভিদ ইকবাল।

এভাবে তিন দিনে ত্রিশটির বেশী প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পেশকৃত বক্তব্যের উপর আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়। প্রবন্ধসমূহ অধিকাংশ ইংরেজী, কয়েকটি স্পেনিস, একটি করে আরবী ও ফারসী ভাষায় লিখিত ছিল। তবে, সবাই পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ না করে ১০–১৫ মিনিটের সীমিত সময়ের মধ্যে শুধু সারাংশটুকু পাঠ করেন।

পূর্ণ প্রবন্ধগুলো পরে প্যারিস থেকে কয়েক খন্ডে সংকলিত ও প্রকাশিত হবে বলেও সম্মেলনে ঘোষণা দেয়া হয়। সব প্রবন্ধেরই অনুবাদ সঙ্গে সঙ্গে স্পেনিস, ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজী ভাষায় মাইক্রোফোনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়।

বাংলাদেশ থেকে 'আল্লামা ইকবাল সংসদ'কেও সম্মেলনে অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। অতি ক্ষুদ্রাকারে, স্বল্প পরিসরে ও নগণ্য আর্থিক সঙ্গতি সহকারে পরিচালিত ঢাকাস্থ আল্লামা ইকবাল সংসদ যে ইউরোপের একটি দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেসে আমন্ত্রিত হয়েছে তা দেশের জন্য অবশ্যই গর্বের বিষয়।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ডঃ ফ্রান্সিস লামী আল্লামা ইকবাল সংসদ সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আবদুল ওয়াহিদকে মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ পত্র পাঠান। কিন্তু তিনি এম. এ. ফাইনাল পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন বিধায় ইকবাল সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার পরিপ্রেক্ষিতে সংসদ উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য, দেশের একমাত্র ইকবাল স্কলার ডঃ আবু সাঈদ নূরুদ্দীনকে সংসদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মনোনয়ন করা হয়। তিনি অতি সাফল্য সহকারে কংগ্রেসে অংশ গ্রহণ করেন।

সম্মেলনের তিনটি মূল বিষয়বস্তুর মধ্য থেকে 'ম্যাটাফিজিক্যাল ভিসন অব আল্লামা ইকবাল' অর্থাৎ অধিবিদ্যা সম্পর্কে আল্লামা ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গির আওতায় 'আল্লামা ইকবাল ও সূফী মতবাদ' শিরোনামে ডঃ আবু সাঈদ নূরুদ্দীন তাঁর প্রবন্ধ পেশ করেন, যা মূলত আল্লামা ইকবালের বিশ্ববিখ্যাত ও ক্রমাগত জনপ্রিয়তা অর্জনকারী খূদী দর্শনেরই নামান্তর। রচনা পাঠ শেষে তিনি উপস্থিত ইকবাল ভক্তদের অনেকের কাছ থেকেই প্রশংসা লাভ করেছেন বলে জানিয়েছেন। বিচারপতি (অবঃ) ডঃ জাভিদ ইকবাল বলেছেনঃ 'আপনার রচনাতে আল্লামা ইকবালের দার্শনিক ভাবধারাসমূহ খুবই সঠিক ও সাফল্যজনকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।'

ডঃ আবু সাঈদ নূরুদ্দীন পরিচিতি

জন্মঃ ডঃ আবু সাঈদ নূরউদ্দীন ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারীর ১ তারিখে ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগ থেকে তিনি বিএ (অনার্স)–এ ডিগ্রী লাভ করেন। একই প্রতিষ্ঠান থেকে উর্দুতে তিনি ১৯৫২ সালে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি বাবায়ে উর্দু ডঃ আবদুল হকের অধীনে ১৯৬৬ সালে উর্দুতে 'আল্লামা ইকবাল ও সূফী মতবাদ' বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। তিনি সমাজ কল্যাণমূলক অনেক কাজের সাথে জড়িত। তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। বর্তমানে ইকবাল জীবনী বাংলায় লিখছেন।

এ রিপোর্ট তৈরি করার সময় সংসদ সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মাওলানা আবদুল ওয়াহিদকে সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য ডঃ ফ্রান্সিলামীর লেখা , পত্রসমূহ ও ডঃ আবু সাঈদ নূরুদ্দীন পরিবেশিত তথ্যের উপরই নির্ভর করতে হয়েছে।

'রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আদর্শ ও কল্যাণ রাষ্ট্র' শীর্ষক সেমিনার

মোজ্জাম্মেলুল হক

১৯৯১ সালে ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৪১২ হিজরী, ১৯ রবিউল আউয়াল, রোববার বিকেল ৫টায় ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আল্লামা ইকবাল সংসদ এক সেমিনারের আয়োজন করে। সংসদ সভাপতি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে 'রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আদর্শ ও কল্যাণ রাষ্ট্র' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহীউদ্দিন খান।

ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চান্সেলর ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন সেমিনারেরউদ্বোধনকরেন।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সাবেক তথ্যমন্ত্রী, ইবনে সীনা ট্রাষ্ট চেয়ারম্যান, রাবেতা আলম ইসলামী বাংলাদেশস্থ উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সৌদী আরব ভ্রাতৃ সমিতির প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট আইনজীবী এডভোকেট মুজীবুর রহমান, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রিন্সিপাল কে. রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ডঃ এ. বি. এম হাবীবুর রহমান চৌধুরী, দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক কবি মাওলানা রূহুল আমীন খান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় সহকারী ও সাপ্তাহিক রোববারের সিনিয়র কলামিস্ট নির্ভীক সাংবাদিক সৈয়দ তোসারফ আলী।

সেমিনারে অভ্যাগত অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংসদ সহ-সভাপতি মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অর্থনীতির প্রফেসর এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ।

বক্তাগণ এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র মানুষের কল্যাণ সাধনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কেবলমাত্র রাসূল (সঃ)-এর আদর্শ এবং তাঁর কল্যাণ রাষ্ট্রের অনুসরণে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই মানুষের সব সমস্যার সমাধান সম্ভব।

উদ্বোধনী ভাষণে ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন বলেন ঃ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার তুলনা বিশ্ব ইতিহাসে

বিরল। বর্তমান সমস্যা সংকুল বিশ্ব পরিস্থিতিতে অনুরূপ রাষ্ট্রই পারে মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে।

এডভোকেট মুজীবুর রহমান বলেন ঃ আল্লাহর বিধান পরিপূর্ণভাবে না মানার কারণেই আজ সমাজে এত অশান্তি। ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণের মাধ্যমেই রাসূল (সঃ)–এর আদর্শ ও কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম বলেন ঃ রাসূল (সঃ)–এর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে সমাজকে যদি আমরা ঢেলে সাজাতে পারি, তাহলেই কেবলমাত্র মানুষের মুক্তি সম্ভব। মানুষ আজ আর পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের কথা শুনছে না, আজ সময় এসেছে রাসূল (সঃ)–এর আদর্শ বাস্তবায়নের।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সভাপতির ভাষণে বলেন ঃ রাষ্ট্র আল্লাহর আর এ রাষ্ট্র যদি আল্লাহর বিধান মোতাবেক পরিচালিত হয় তবেই কেবল সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আর আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিলো আসরারে খুদীতে সন্নিবেশিত রাসূল (সঃ)–কে নিবেদিত ইকবালের কবিতা আবৃত্তি। কবিতাটি অনুবাদ করেন সৈয়দ আবদুল মান্নান এবং অপূর্ব সুন্দর আবৃত্তি উপহার দেন গীতিকার ও সুরকার মাসিক কলমের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কবি মতিউর রহমান মল্লিক। তিনি আশির দশকে ইকবালের একজন সার্থক অনুবাদকও।

সেমিনারের সার্বিক উপস্থাপনায় ছিলেন জনাব ছালেহ আহমাদ।

সেমিনার উদ্বোধন করেন ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন

মঞ্চে উপবিষ্ট মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ও কে. এ. রহমান

'ইকবালের শিক্ষা দর্শন' শীর্ষক সেমিনার

হাসান মাহমুদ

ইসলামী রেনেসাঁস আন্দোলনের অগ্রসেনানী ডঃ আল্লামা স্যার মুহাম্মদ ইকবালের ১১৪তম জন্মবার্ষিকী ছিলো নভেম্বরের ৯ তারিখ। ইকবাল দিবস '৯১ উদযাপন উপলক্ষে "আল্লামা ইকবাল সংসদ" গেলো ২৮ নভেম্বর বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টায় হোটেল সুন্দরবন-এ এক সেমিনারের আয়োজন করে। সংসদ সভাপতি দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে 'ইকবালের শিক্ষা-দর্শন' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ।

মূল প্রবন্ধের ইংরেজী সার সংক্ষেপ উপস্থাপন করেন ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চান্সেলর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন।

সেমিনারের উদ্বোধন করেন সাবেক তথ্যমন্ত্রী এডভোকেট মুজীবুর রহমান।

সেমিনারে বাংলাদেশস্থ পাকিস্তানের হাই কমিশনার জনাব আনোয়ার কামাল প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন।

আলোচনায় অন্যান্যের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ এম এ বারী, বাংলাদেশ-পাকিস্তান মৈত্রী সমিতির সভাপতি বিশিষ্ট কথাশিল্পী প্রফেসর শাহেদ আলী, সংসদ সহ-সভাপতি প্রফেসর এ এফ এম হোসাইন আহমদ, বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম।

আলোচকবৃন্দ মত ব্যক্ত করেন যে, আল্লামা ইকবাল আল-কুরআনের আলোকে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুসরণে সমাজের সার্বিক পরিবর্তন চেয়েছিলেন। এই লক্ষ্যে তিনি জাতিকে দায়িত্ব সচেতন করার জন্য তার লেখনী ব্যবহার করেছেন।

ডঃ এম এ বারী বলেনঃ আল্লামা ইকবাল সম্পর্কে আলোকপাত করতে গেলে তাঁর দর্শন, কাব্য ও সাহিত্য ভালভাবে পাঠ করেই তা করতে হবে। কারণ ইকবাল এক বিশাল ব্যক্তিত্ব ও মনীষীই ছিলেন।

অধ্যাপক শাহেদ আলী বলেন ঃ রাজনৈতিক কারণে আজ ইকবালের সাহিত্যের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। এককালে যে ভাষা আন্দোলন করেছিলাম তা-ই পরবর্তীতে উর্দু, ফার্সী বর্জনের প্রবণতায় পরিণত হওয়াই এর কারণ। তিনি বলেন, আল্লামা ইকবালের শিক্ষা-দর্শন ছিলো কল্যাণমুখী। বৃটিশ আমলে শিক্ষার যে ত্রুটি ছিলো। তিঁনি তা-ই চিহ্নিত করেছিলেন। সেই আমল থেকে আজ শিক্ষার ত্রুটি আরো ব্যাপকতর হয়ে পড়েছে। এর থেকে মুক্তির জন্যে ইকবালের শিক্ষা-দর্শন গ্রহণ করা প্রয়োজন।

গিয়াস কামাল চৌধুরী বলেন ঃ আমাদের এখন স্বীয় ঐহিত্য উৎস সন্ধান করতে হবে। হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলতে হবে। ঠোকর খেতে খেতে আমাদের পীঠ এখন দেয়ালে ঠেকে গেছে। মনে হচ্ছে পীঠও বোধ হয় এখন আর নেই। ইকবালের সাহসী ও বলিষ্ঠ বাণীর উপর অবিচল আস্থা রেখে এগিয়ে যেতে পারলে আমাদের এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

প্রফেসর এ এফ এম হোসাইন আহমদ বলেন ঃ ইকবাল ইসলামী দর্শনের মাধ্যমে কাব্য-সাহিত্য চর্চা করেছেন। আর আল্লাহ-রাসূলের দ্বীনকে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠার আমৃত্যু সংগ্রামে অবিরত ছিলেন।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম বলেন ঃ ইকবাল সমাজ বিচ্ছিন্ন চিন্তাকে প্রশ্রয় দেননি। আমাদের তরুণদের বেশী বেশী ইকবাল দর্শন পড়া উচিত।

উদ্বোধনী ভাষণে এডভোকেট মুজীবুর রহমান বলেন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত ইকবাল ছিলেন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে পারদর্শী। ইকবাল ছিলেন ইসলামের দার্শনিক ও কবি। তিনি ইকবালের কাব্য ও দর্শনের গবেষণার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, এই মহান কবি বিশ্বাস করতেন, মানুষ নিছক জৈবিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রাণী নয়। পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠায় ইকবাল ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ পুরুষ।

মূল প্রবন্ধে ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বলেনঃ ইকবাল মনে করতেন যে, খ্রীষ্টানদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশের ধর্ম ও চরিত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বৈ কিছু নয়। তাই আমাদের এমন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেধা ও মৌলিকত্ব সৃষ্টি হয়।

জনাব আবদুল্লাহ বলেন, বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে যথেষ্ট ভাবতে হবে, আর সেই সাথে তার শিক্ষা-দর্শন প্রয়োগ করতে হবে বিভিন্ন ধর্মের নিরিখে-যা আমাদের জন্যে ফলপ্রসূ ও তাৎপর্যবহ।

প্রধান অতিথির ভাষণে পাকিস্তানের ঢাকাস্থ হাই কমিশনার জনাব আনোয়ার কামাল বলেনঃ আল্লামা ইকবাল জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর সেবায় নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিন্তা-চেতনা ও আদর্শ যথাযথভাবে অনুসরণ করে মুসলিম উম্মাহ তার বর্তমান বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারে। তিনি বলেন, ইকবালের চিন্তা-চেতনা বিশেষ কোন দেশ বা জাতিকে নিয়ে অবশ্যই ছিলো না।

দেশ-বিদেশের লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী নারী-পুরুষের অনন্যসাধারণ এ সমাবেশে সংসদ প্রতিষ্ঠাতা আহবায়ক জনাব সৈয়দ তোসারফ আলী এইমর্মে ঘোষণা দেন যে, স্পেনের কর্ডোভায় ডিসেম্বরের ২১-২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইকবাল কংগ্রেসে বাংলাদেশের একমাত্র ইকবাল স্কলার ডঃ আবু সাঈদ নুরুদ্দীন আল্লামা ইকবাল সংসদের পক্ষ থেকে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

সভাপতির ভাষণে দেওয়ান আজরফ বলেনঃ আল্লামা ইকবাল প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ ও কোরআনের কথাই বলেছেন। আল্লাহর আইন ও কোরআনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তিনি কর্মসাধন অব্যাহত রেখেছিলেন। ইকবাল সমাজতন্ত্র তথা বিভ্রান্তির যুগেও ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিশ্বাসে ছিলেন অটল। তিনি ইউরোপীয় শিক্ষার ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা বর্জিত চরিত্রের কঠোর সমালোচনা করতেন। ধর্ম মানব জীবনের সকল বিপ্লবের উৎস-যা সমাজে বিবর্তন আনতে পারে; ইকবাল এ বিশ্বাসে জাগরুক ছিলেন।

সেমিনারে কালামে ইকবাল উপস্থাপন করেন প্রিন্সিপাল নূরুল করীম।

স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন নবী রহমান। সংসদ উপদেষ্টা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রিন্সিপাল কে, এ, রহমানের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর চা-চক্রের মধ্য দিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে।

সেমিনারের সার্বিক উপস্থাপনায় ছিলেন জনাব আনোয়ারুল হক।

ইকবালের শিক্ষা দর্শন শীর্ষক সেমিনার

সেমিনার উদ্বোধন করছেন সাবেক তথ্যমন্ত্রী এডভোকেট মুজিবুর রহমান

প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার জনাব আনোয়ার কামাল

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন

ডঃ এম. এ. বারী

ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

সৈয়দ তোসারফ আলী

আনোয়ারুল হক

সেমিনারে উপস্থিত মেহমানদের একাংশ

'সমকালীন বিশ্ব ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ব' শীর্ষক সেমিনার

কামরুল ইসলাম হুমায়ুন

ইসলামী পুনর্জাগরণের অগ্রদূত দার্শনিক কবি ডঃ আল্লামা স্যার মুহাম্মদ ইকবালের ১১৫তম জন্মবার্ষিকী ছিল ৯ নভেম্বর '৯২। এ উপলক্ষে 'আল্লামা ইকবাল সংসদ' একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের আয়োজন করে ঢাকার হোটেল 'সুন্দরবন'–এর সেমিনার কক্ষে।

সংসদ সভাপতি, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও বর্ষীয়ান দার্শনিক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন।

সংসদের প্রতিষ্ঠাতা আহবায়ক জনাব সৈয়দ তোসারফ আলীর স্বাগত বক্তব্যের পর সেমিনার উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভাইস চান্সেলর প্রফেসর এমাজ উদ্দীন আহমদ।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাবেক তথ্যমন্ত্রী বিশিষ্ট চিন্তাবিদ এডভোকেট মুজিবুর রহমান।

আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট ইসলামী ইসলামী চিন্তাবিদ আ. ফ. ম. ইয়াহহিয়া, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর প্রফেসর শমশের আলী, বাংলাদেশস্থ পাকিস্তানের হাইকমিশনার জনাব আনোয়ার কামাল, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত জনাব মাহমুদ বায়্যাত।

স্বাগত বক্তব্য–সৈয়দ তোসারফ আলীঃ আল্লামা ইকবাল সংসদের প্রতিষ্ঠাতা আহবায়ক নির্ভীক সাংবাদিক সৈয়দ তোসারফ আলী বলেন, শুভ্র শরতের এই বিকেলে আমরা সমবেত হয়েছি। সম্মানিত সুধী মহলের উপস্থিতিতে আমরা অনুপ্রাণিত। মহাকবি ইকবালকে আমরা কেন স্মরণ করছি, কেন পালন করছি তাঁর জন্মবার্ষিকী! কাব্য–চর্চায়, দর্শন–চর্চায়, ধর্ম–চর্চায় স্বাতন্ত্র্য শুধু নয়, অনন্য হবার বৈশিষ্ট্য রয়েছে আল্লামা ইকবালের মধ্যে। তিনি শুধু সরস কথার যোগানদার ছিলেন না, নিজের কল্পনা শক্তির বাহাদুরী দেখাতে তিনি সত্যকে উপেক্ষা করেননি। অনুভব ও অভিজ্ঞানকে মেলে ধরেছেন স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্কের ঐকান্তিক উন্নতি সাধনে। মানব ব্যক্তিত্বকে চেয়েছেন প্রস্ফুটিত করতে ইকবাল চেয়েছেন ইস্পাতের মত শক্ত মানুষ– পরিশ্রমী মানুষ। তিনি ইসলামের মর্মবাণী তাওহীদকে মর্মস্পর্শী করে উপস্থাপন করেছেন মানুষের সামনে। তাঁর রচনার মাধ্যমে কবিতা ও ইসলাম যেন একাকার হয়ে গেছে। এই আলোচনা অনুষ্ঠান আমাদের চেতনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করতে সক্ষম হবে।

উদ্বোধন–ডঃ এমাজ উদ্দীন আহমদঃ সেমিনার উদ্বোধনী বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভাইস চান্সেলর প্রফেসর ডঃ এমাজ উদ্দীন আহমদ বলেন, বিশ্বব্যাপী যখন অগ্রগতির বন্যা বইছে, ঠিক তখন মুসলিম বিশ্ব তাদের সাথে তাল মেলাতে পারছে না। ১৭৯টি স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে ২৭টিতে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আমরা স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারছি না। ২৭টির মধ্যে ৫টিতে মাত্র গণতান্ত্রিক জীবনধারা বয়ে চলেছে, আর ২২টি পুরোনো অবস্থায় বিদ্যমান। কিছু কিছু মুসলিম রাষ্ট্রের যে প্রাচুর্য– তার সুযোগ মুসলিম

উম্মাহ'র কতটুকু কাজে লাগছে! সুষ্ঠু-সুন্দর জীবন যা আমাদের জীবনদর্শনে প্রতিবিম্বিত, তার কাছাকাছিও আমরা যেতে পারছি না। এ সম্পর্কে অনেক মনীষীই চিৎকার করেছেন। আল্লামা ইকবাল এ সম্পর্কে গভীরভাবে বলেছেন।

মুসলিম মনীষীরা মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে বিশাল দিগন্তের দিকে যাত্রা করেছিলেন তার ধারে-কাছেও আজ আমরা যেতে পারছি না। মানুষকে একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব সার্বভৌমত্বের ভেতর যতদিন না আনা যাবে ততদিন স্থায়ী অগ্রগতি আনা সম্ভব হবে না।

জাতিসংঘকে দিয়ে আজকে কিছুই করার নেই। বিশ্বের দিকে দিকে যারা চরম নির্যাতিত হচ্ছে কাশ্মীরে, বসনিয়ায় যারা লড়ছে, যারা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য আন্দোলন করছে OIC বা অন্য কোন সংগঠন যদি তাদের জন্য সোচ্চার হতে পারতো, তবে হয়তো সংগ্রামীরা কিছু সহানুভূতির প্রলেপ পেতো। আজ পাশ্চাত্যের সমালোচনা নয়- আত্মসমালোচনা প্রয়োজন। আত্মচেতনা-নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তির দিকে তাকানোর সময় এটা। নিজেদের দিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। শক্তির হাজারো বাতায়ন উন্মুক্ত হোক, তবেই মুসলিম উম্মাহ'র দুর্দিন কেটে অগ্রগতির ধারা সূচিত হবে।

মূল প্রবন্ধ-এডভোকেট মুজিবুর রহমানঃ 'Islamic Brotherhood and the Present Day World' শীর্ষক পঠিত প্রবন্ধে এডভোকেট মুজিবুর রহমান বলেনঃ 'তাওহীদ' যেমন আল্লাহ তা'য়ালার একত্ব নির্দেশক, তেমনি মানুষে মানুষে একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ ইসলামের একটি উৎসারিত চেতনা। আল্লাহ মানব সমাজকে আহবান করেন 'আমার রশ্মিকে তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ করো, বিচ্ছিন্ন হয়ো না।'

মদীনার মুসলিম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কে মমত্ব, একে অপরের জন্য আত্মত্যাগ ভ্রাতৃত্বের (Brotherhood) উৎকৃষ্ট নমুনা। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (সঃ) তামাম সৃষ্টির কল্যাণের জন্য পাঠিয়েছেন। সেই অনাবীল কল্যাণ ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তিনি। ইসলাম প্রকৃতই পূর্ণাঙ্গ। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামগ্রিক দিক-নির্দেশনাকে ধারণা করেই ইসলাম।

প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়- পাশ্চাত্য গণতন্ত্র কোন উত্তম নৈতিক আদর্শ ধারণ করে না। সার্বভৌমত্বের ধারণা ত্রুটিপূর্ণ। জাতীয়তাবাদ অন্ধভাবে দেশীয় স্বার্থপূজায় ব্যস্ত। ভ্রাতৃত্বের পথে এসবই বাধা।

ইসলামী চিন্তানায়ক ইমাম তাইমিয়া ইসলামী চিন্তার জগতে নতুন বিপ্লব আনেন, শাহ ওয়ালি উল্লাহ এই উপমহাদেশে ইসলামী চিন্তার প্রকাশ ঘটান। জামালুদ্দীন আফগানী প্যান ইসলামিক আন্দোলনের মহান পথিকৃত। তাঁরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী চেতনা ও ভ্রাতৃত্বের বিকাশে সচেষ্ট ছিলেন। আল্লামা ইকবাল মানুষকে আহবান করেছেন ভ্রাতৃত্বের বাণী বহন করার জন্য 'সারা জাহাঁ হামারা' বলে। ইকবাল বলেছেন, মদীনা আমাদের সকলের মিলন কেন্দ্র।

New World Order' 'নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা' দ্বারা পাশ্চাত্য যা বোঝাতে চাচ্ছে তা হলো উদার গণতন্ত্র ও মুক্ত অর্থনীতি। এটাও অপূর্ণাঙ্গ ধারণা এবং মানুষের তা থেকে পাবার কিছু

নেই। তাই, সকল বিরাজিত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যবস্থা, ভ্রাতৃত্ববোধ সঞ্জাত মানবিক সমাজ কাঠামো নির্মাণ করার মাধ্যমেই মানবতার সম্পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ আনয়ন সম্ভব।

আ. ফ. ম. ইয়াহহিয়াঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সাবেক ডিজি জনাব আ· ফ· ম· ইয়াহহিয়া বলেনঃ কবি ইকবাল দার্শনিক কবি জালালুদ্দিন রুমী ও ইমাম গাযযালীর আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় উজ্জীবিত হয়েছিলেন। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী ও জামালুদ্দীন আফগানীর চিন্তাধারা দ্বারা রাজনৈতিক দিকদর্শন লাভ করেছিলেন, পরিশীলিত হয়েছিলেন। তাঁর দর্শন, তাঁর সাহিত্য, তাঁর বুদ্ধিমত্তা ছিল সত্য ও সুন্দরের। তাওহীদ ও আখিরাত নিয়ে তিনি গভীর অনুধ্যান ও গবেষণা করেছেন।

খূদী বা মানুষের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে আল্লামা ইকবাল যা বলে গেছেন তা উম্মাহ'র অলংকার। সালাতের মধ্যে তিনি দেখেছেন মানুষের সামাজিক ভূমিকা সাম্য-ঐক্যের উদাহরণ। আমরা কোরআন-সুন্নাহ'র শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছি। যার কারণে আমাদের এই অনৈক্য। ইমাম সাহেবগণ মুনাজাত শেষে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে থাকেন-কিন্তু তা অন্তরের গভীরের প্রতিধ্বনি নয়। যদি হতো তাহলে অবশ্যই তা মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে চেতনা জাগাতো।

ইকবাল ছিলেন মুসলিম হিসেবে গোটা বিশ্বের মানবতার সাথে একীভূত হবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। এক সময় আল্লামা ইকবাল রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে এবং চিন্তার জগতে সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদীকে মিল্লাতের বৃহত্তর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আহবান করেছিলেন। তাঁরা সেভাবে এগিয়েও এসেছিলেন। মুসলিম ঐক্য ও বিজয়ের অভিযাত্রায় পাকিস্তান সফল না হলেও মধ্য এশিয়া হতে পারে, মিসর কিংবা অন্য কোন দেশ হতে পারে, যেভাবেই হোক আমাদের বিজয় হবেই ইনশাল্লাহ।

ডঃ শমশের আলীঃ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর প্রফেসর ডঃ শমশের আলী বলেন, ইসলাম হচ্ছে সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ইসলাম থেকে শিক্ষা নিয়েছে। বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় মুসলিমরা বড়ই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। তাদের জন্য উম্মাহ'র কি করণীয়- সেই উপলব্ধি ও পদক্ষেপই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

'শিক্ষা সুযোগ নয় অধিকার', 'কেউ খাবে তো কেউ খাবে না তা হবে না তা হবে না' এসব শ্লোগান কোন ইসলামী সংগঠনের লোকেরা লিখে না, অন্য পার্টির লোকেরা লিখে দেয়াল ভরছে। অথচ এগুলো ইসলামের মৌলনীতির অন্তর্ভুক্ত। যুব সমাজকে, জনগণকে আমাদের বোঝাতে হবে- আমাদের কি সম্পদ আছে, আমাদের স্বাতন্ত্র্য কি? কি নিয়ে আমাদের চলতে হবে।

ইসলামী সমাজ সম্পর্কে কথাবার্তা হয়ে থাকে, কিন্তু আমাদের গৃহে কাজ-কর্মে কোথায় ইসলাম? আল্লামা ইকবালের শ্লোক শুনে আমরা আমোদিত হয়ে 'আহ্' উচ্চারণ করে চলে যাই, কিন্তু সে সব বাস্তবায়নের জন্য আমাদের প্র্যাকটিসের দিকে নজর নেই। কোরআন ও সুন্নায়

পূর্ণাঙ্গ জীবনের কথা লিপিবদ্ধ আছে। আমরা আমাদের পরিবর্তনের জন্য সে আলোকে চেষ্টা চালাবো, নচেৎ কোন সুফলই আমাদের দিকে এগিয়ে আসবে না। আল্লামা ইকবাল একথা দৃঢ়ভাবেই বুঝে ছিলেন।

আনোয়ার কামাল–বিশেষ অতিথি ঃ বাংলাদেশে নিযুক্ত ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের হাই কমিশনার জনাব আনোয়ার কামাল বিশেষ অতিথির ভাষণে বলেন, যা হয়ে গেছে, সেতো হয়েই গেছে–বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হোক–এটাই আমাদের কামনা। মুসলিম বিশ্বের একটি শক্তিমত্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আবির্ভূত হোক– আমরা এটাই চাই। আফগানিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ জিহাদকে আমরা খুবই সম্মান করি। মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক সমস্যাসহ নানাবিধ সমস্যা আছে তা সত্ত্বেও আমাদের লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাবার চেষ্টা জোরদার করতে হবে।

মাহমুদ বায়্যাত–প্রধান অতিথি ঃ বাংলাদেশে নিযুক্ত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত জনাব মাহমুদ বায়্যাত তাঁর প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, আল্লামা ইকবাল লাহোরীর কবিতা পংক্তিতে পংক্তিতে জটিল বিশ্বের সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে–রয়েছে যুবসমাজের জাগরণের বাণী।

আজকের মুসলিম যুবকরা পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করছে। পাশ্চাত্যকে সভ্যতা–সংস্কৃতির পাদপীঠ মনে করছে। আত্মভোলা হয়ে গেছে তারা। 'তুমি তো মুসলমান তুমি অন্যের ওপর নির্ভর করো না'–এই ছিল ইকবালের মর্মবাণী। পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন নতুন নয়। এ এক জটিল অবস্থা যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে এর প্রতিরোধ করতে হবে। গণতন্ত্রের জন্য নয়, জাতীয়তাবাদের জন্য – তাঁর ব্যথা, তাঁর আবেদন ছিলো সমগ্র মিল্লাতের জন্য। জনাব মাহমুদ বায়্যাত আল্লামার বেশ কিছু ফারসী কবিতা আবৃত্তি করে বলেন, ইরানের যুবসমাজ ইকবালের কবিতা শুনেছে এবং তারা এর জবাব দিয়েছে। ইকবালের স্বপ্ন ও আকাঙক্ষার আলোকে তারা ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং পাশ্চাত্যের শয়তানী আগ্রাসনকে প্রতিহত করেছে।

সভাপতি অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফঃ আল্লামা ইকবাল সংসদের সভাপতি বিশিষ্ট দার্শনিক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোঁহাম্মদ আজরফ বলেনঃ কুরআন ও সুন্নাহ সত্যিকার ভ্রাতৃত্ব বোধের শিক্ষা দেয়। সমগ্র বিশ্বের মানুষের ভ্রাতৃত্ব কায়েমের জন্যই ইকবাল আহবান জানিয়ে ছিলেন। আল্লামা ইকবাল শুধু দেশপ্রেমেই উদ্বুদ্ধ ছিলেন না, তিনি মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে তাঁর সাহিত্যকর্ম রচনা করেছেন। ইকবালের চিন্তা ছিল উচ্চ মানবিকতাসম্পন্ন।

তিনি মনীষী আল্লামা ইকবালের জীবনকীর্তি, ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা রেডিও, টেলিভিশনসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচারের উদাত্ত আহবান জানান।

অনুষ্ঠান শেষে অভ্যাগত অতিথিদের সংসদের পক্ষ থেকে চা–চক্রের আমন্ত্রণ জানান কবি মুকুল চৌধুরী। চা–চক্রের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠানের সার্বিক উপস্থাপনায় ছিলেন সৈয়দ তোসারফ আলী ও কবি মুকুল চৌধুরী।

সমকালীন বিশ্ব ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ব শীর্ষক সেমিনার

সেমিনার উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর প্রফেসর এমাজ উদ্দীন আহমদ

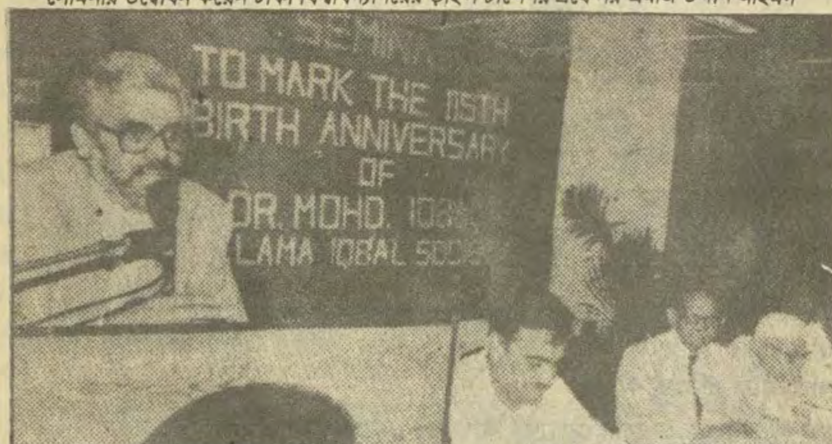

প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত জনাব মাহমুদ বায়্যাত

মূল প্রবন্ধ পাঠ করছেন সাবেক তথ্যমন্ত্রী এডভোকেট মুজিবুর রহমান

মঞ্চে উপবিষ্ট পাকিস্তানী হাইকমিশনার জনাব আনোয়ার কামাল, ইরানী এম্বেসেডর জনাব মাহমুদ বায়্যাত, অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, প্রফেসর ডঃ শমশের আলী ও জনাব এ. এফ. এম. ইয়াহইয়া

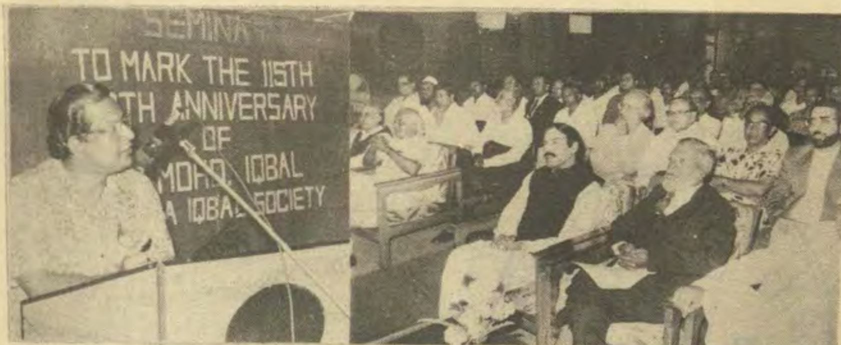

স্বাগত ভাষণ দিচ্ছেন সৈয়দ তোসারফ আলী

সেমিনারে উপস্থিত মেহমানদের একাংশ

IQBAL ACADEMY PAKISTAN
Library
30988
LAHORE.

00030988